চরিত্রে
রামায়ণ মহাভারত

। প্রথম পর্ব ।

॥ শিপ্রা দত্ত ॥

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্বপ্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনকজননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই :—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

মুখপত্র

বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত—ভারতের দুই অমর মহাকাব্য। আপন সৌরভে এই দুই মহাকাব্য বিশ্বকে বিমুগ্ধ করছে। খৃষ্টানদের কাছে যেমন বাইবেল, মুসলীমদের কাছে কোরাণ তেমনি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের অন্যতম এই দুই মহাকাব্য। যদিও ইদানীংকালে এই দুই মহাকাব্য সম্বন্ধে ভারতীয়দের বিশ্বাসের উপর কঠিন কুঠারাঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু কোন অপচেষ্টাই এই দুই অমর মহাকাব্যের উপর মানুষের অটল বিশ্বাস, অনুরাগ ও শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ করতে সমর্থ হবে না। এই মহাকাব্যদ্বয় শাশ্বতের দাবী নিয়ে সবার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করছে।

ভারতে নানা আঞ্চলিক ভাষায় এই দুই মহাকাব্য গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও—বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় এই দুই অমর মহাকাব্য অনূদিত হয়ে ওথাকার পাঠকদের মনোরঞ্জন করছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সহস্র সহস্র বছর অতীত হলেও এই মহাকাব্যদ্বয়ের মন্ত্রশক্তি বিন্দুমাত্র শ্লথ হয়নি। বরং ধর্মনির্বিশেষে এই কাব্যদ্বয়ের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে।

বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই অমর মহাকাব্যদ্বয়ের জাত নির্ণয় (অর্থাৎ কারো মতে গার্হস্থ্য ধর্ম, কারো মতে পৌরাণিক কাহিনী, কারো মতে ঐতিহাসিক, কেউ বা ধর্মগ্রন্থ) করবার জন্য নানারূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আজ অবধি কেউ তাঁদের বিচার সঠিক বলে গৌরব অর্জন করতে পারেননি। আমার বই এর লক্ষ্য এ প্রকারের নয়। যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষরা এই দুই মহাকাব্যকে শুচিতা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছেন, ভক্তি ভরে পাঠ করছেন এদের অমৃত সম্ভার। আমিও তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করছি। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, তর্কে সমাধান হয় না। তৈলের আধার পাত্র, না পাত্রের আধার

তৈল, বা তাল পড়ে কি ঢিপ করে, না ঢিপ করে তাল পড়ে—এ সব জটিল ব্যাপারের সমাধান কখনই হবে না। আমার দিশারী অন্ধ-বিশ্বাস।

পূর্বেই বলেছি এই মহাকাব্যদ্বয় ভারতের তথা বিশ্বের নানা আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে ও হচ্ছে। তেমনি বাংলা ভাষাতেও এই দুই মহাগ্রন্থের অনেক সুললিত পদ্য ও গদ্য অনুবাদ আছে। তা সত্ত্বেও আমার এই বইএর প্রয়োজনীয়তা কি? আমার পূর্ব পথিকৃৎরা যে উদ্দেশ্য সাধন করেননি এমন কোন উদ্দেশ্য কি সাধন করবে?

আমার এই বই—মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদ নয়। আমি এক অভিনব আইডিয়া নিয়ে এই বই লিখবার প্রেরণা পেয়েছি। আমার উদ্দেশ্য এই দুই সর্বজনপ্রিয় মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে তাঁদের পাশাপাশি চিত্রিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার বাহুল্য রামায়ণ কাব্যের তুলনায় অনেক বেশী। চরিত্র অঙ্কনে ঘটনার প্রাধান্য ও বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সমন্বয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচনা করেছি। মহাভারতের অনেক চরিত্রের সাদৃশ্য বা কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্যও রামায়ণের চরিত্রে পাওয়া যায় না, তথাপি যতটা সম্ভব আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি।

আমার বই এর আর একটি অভিনবত্ব—পাঠকবর্গ এই দুই মহাকাব্য সমগ্র ভাবে পাশাপাশি পড়তে পারবেন। এই দুই মহাকাব্যের তুলনার ও সমালোচনার 'প্রিটেনশানে' আমি মহাকাব্য-দ্বয়কে এক সঙ্গে পাঠককে উপহার দিয়েছি। 'প্রিটেনশান' শব্দটি ব্যবহার করেছি এ জন্য যে এই দুই মহাকাব্যের চরিত্রগুলি কি পরস্পর তুলনার বস্তু? যেমন রাম ও যুধিষ্ঠির দুই মহাকাব্যের দুই নায়ক। তাঁদের চরিত্রে এমন কোন-বৈশিষ্ট্য আছে যা দ্বারা এই দুই নায়ককে সমপর্য্যায়ে ফেলা যায়? সেরূপ দুই নায়িকা সীতা ও

দ্রৌপদী। এই দুই মহাকাব্যের কোন দুটি চরিত্র জ্যামিতির ফিগারের মত সর্বতোভাবে মিলে গেছে বলা সম্ভব না হলেও, আমি তুলনার চেষ্টা করেছি। চরিত্রে চরিত্রে সাদৃশ্য অল্প, বৈসাদৃশ্য অনেক। বৈসাদৃশ্যও সমালোচনার অন্য মানদণ্ড।

আমার এই বই এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ভারতীয় এপিকদ্বয়ের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যেটুকু সাদৃশ্য আমার নজরে পড়েছে, আমি তারও উল্লেখ করেছি গ্রন্থটিকে সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য।

আমার আর একটি উদ্দেশ্য অকৃপণভাবে ঘটনা ও বৈচিত্র্য পরিবেশন করা। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ, কৃত্তিবাস কবির কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারত ও কবি কাশীদাসের কাশীদাসী মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে ঘটনার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন ঘটনা বা কাহিনী মূলগ্রন্থের প্রক্ষেপণ হলেও আমি তা ব্যবহার করেছি পাঠকদের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে। উপযুক্ত স্থানে বাংলা ভাবার্থ সহ সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা শ্লোক উদ্ধৃত করে আমার বিবৃতিকে অধিকতর সবল ও চিত্তাকর্ষক করতে চেষ্টা করেছি। আমার এই অভিনবত্বগুলি যদি পাঠকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ভারতের এই দুই বিরাট মহাকাব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে কয়েকটি পর্বে লিপিবদ্ধ করছি। এই দুর্মূল্যের বাজারে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যায় প্রকাশকরাও সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী। পুনরাবৃত্তি দোষমুক্ত করবার জন্য একটি চরিত্রের অনেক ঘটনাই সেই চরিত্রে পরিবেশিত হয়নি। কিন্তু অন্য চরিত্র বিশ্লেষণের সময় সেই সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম পর্বেই সমগ্র রামায়ণ মহাভারত কাহিনী অঙ্কিত করা সম্ভবপর হয়নি। কোন কোন চরিত্রাঙ্কনে ঘটনার বাহুল্য ঘটেছে এবং চরিত্রটি দীর্ঘ হয়েছে। আশা করি এতে কোন চরিত্রের উৎকর্ষতার ব্যাঘাত ঘটেনি।

রাম অবতার ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদিও দেবতার অংশ বিশেষ। তাঁদের সমালোচনায় হয়ত কোন কোন পাঠক ক্ষুব্ধ হবেন। কারো সেন্টিমেণ্টে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই দুই মহাকাব্যের দোষ ত্রুটি বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। অবতার পুরুষ রাম বা কৃষ্ণর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা বা তাঁদের কোনরূপে হেয় করা এ বইএর উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিষ্ণু রাম বা স্বয়ং কৃষ্ণ যখন মানব দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে—মানব সমাজের কষ্টি পাথরে তাঁদের যে সব দোষ ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। পাঠকবর্গ তা মার্জনা করবেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্কৃত সংকলন ও বাংলা অনুবাদ বহু। মুল রচনার সঙ্গে এইসব অনুবাদের যথার্থই কতটা সামঞ্জস্য আছে তা নির্ণয় কবা কঠিন। প্রতি লেখকই কম বেশী কিছু কিছু প্রক্ষেপণ করে—মুল গ্রন্থর ভাব ভাষার সঙ্গে একই ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন আপন মনের মাধুরী দিয়ে। যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিধ্বনি কবে বলা যেতে পারে যে—যেমন শ্রুতি সমূহ বিভিন্ন বা পরস্পর বিরোধী, তেমনি এমন কোন ঋষি নেই যাঁর মত অকাট্য বলে পরিগণিত হয়, সেরূপ এই দুই মহাকাব্যের বর্ত্তমানে প্রচলিত কোন অনুবাদই মুল গ্রন্থ দ্বয়ের যথার্থ অনুবাদ বলে গৃহীত হয়নি। আমি শ্রীশ্রীসীতাবাম ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত 'আর্য শাস্ত্র' মাসিক পত্রিকার উভয় গ্রন্থের সংস্কৃত সংকলন অনুসরণ করেছি।

এই দুর্মূল্যেব বাজারে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনের দিক্‌পাল ডি, এম, লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ই এই বিবাট গ্রন্থ প্রকাশনে সাহসী হয়েছেন। তাঁর এই উদার সহযোগিতা না পেলে হয়ত আমার এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের সাধনা কখনই সফল হোত না। ডি, এম, লাইব্রেরীর অন্যতম অংশীদার শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার

মহাশয় কেবল এই গ্রন্থ প্রকাশনেই আমাকে সহায়তা করেন নি, তিনি তাঁর অসুস্থ শরীরে দিনের পর দিন রোদ বৃষ্টি মাথায় করে বইটি যাতে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হয় সেজন্য আমার কাছে প্রুফ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তার জন্য তিনি আমাকে অনেক গ্রন্থও জোগাড় করে আমার উপকার করেছেন। আমার পিসতুত দাদা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীনীরোদ বরণ সেন ও স্নেহভাজন শ্রীমিহির কুমার দাস এই গ্রন্থ মুদ্রণে আমাকে সাহায্য করেছে। এঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রী ডি, মেহেরা যিনি আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নের আইডিয়া দিয়েছিলেন তাঁকেও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এঁদের সমবেত সহযোগিতা ব্যতীত এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হোত না।

পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে প্রকাশক প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণ না করেই প্রকাশ করেছেন। যদিও যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ চরিত্র প্রথম পর্বে পরিবেশন করাই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখতে গিয়েও যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ চরিত্রটি প্রথম পর্বে প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। কারণ যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ চরিত্র ও তারপর রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের তুলনা মূলক সমালোচনা করতে বইটি কলেবরে বড় হয়ে যাচ্ছে,—যার মূল্য সাধারণ পাঠকদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এই জন্য একমাত্র পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করেই প্রকাশক মহাশয় প্রথম পর্বে উদ্যোগ পর্ব পর্যন্ত যুধিষ্ঠির চরিত্র লিপিবদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠির সংক্রান্ত পরবর্ত্তী কাহিনী দ্বিতীয় পর্বে সমাপ্ত হবে। কেবলমাত্র তুলনা মূলক চরিত্র নয়—উভয় মহাকাব্যের যেসব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে—সেইসব চরিত্র মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যদ্বয়ের কাহিনী কয়েক পর্বে প্রকাশ অপেক্ষায় আছে।

দীর্ঘ ৩।৪ বছরের পরিশ্রমে এই গ্রন্থটি পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য লোড শেডিং, প্রেসের নানা গোলমাল না ঘটলে হয়ত আরও বহু পুর্বেই প্রথম পর্বটি প্রকাশ করা সম্ভব হোত। এই গ্রন্থটি যদি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় তবেই আমার প্রয়াস সার্থক হবে। আমি বিদুষী নই, তবু আমার সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির পরিধিতে এই গ্রন্থটি যতটা সম্ভব সর্বজন আদৃত করবার চেষ্টা করেছি।

সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এই বইতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ জনিত ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে, সেজন্য প্রিয় পাঠকবর্গের কাছে নিজেকে অপরাধী বোধ করছি। আশাকরি পাঠকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন। পরবর্তী মুদ্রণে সেগুলি শুদ্ধ করবার ইচ্ছে রইল।

পয়লা বৈশাখ, তেরশো তিরাশি — শিপ্রা দত্ত।

কলিকাতা।

সীতা ও দ্রৌপদী

Beauty and anguish walking hand in hand—Tennysonর এই উক্তি ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের নায়িকা সীতা ও দ্রৌপদীর জীবন আলেখ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই দুই মহাকাব্যে উপরোক্ত চরিত্র দুটি অপূর্ব। প্রবাদ আছে 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'। সীতা ও দ্রৌপদীর চরিত্র তাই এত বিষাদঘন। উভয়েই রাজকন্যা, রাজরাণী। উভয়েই সতী, সাধ্বী, কর্তব্যপরায়ণা, ধর্মনিষ্ঠ ও গুরুজন অনুগতা। সকল গুণের আকর হয়ে, রাজবধূ হয়েও উভয়েরই নির্বাসনের ঘটনাবহুল জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী।

There is a woman at the beginning of all great things—Lamartine. সত্যিই, রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের বিচিত্র ঘটনাবলীর মূলে আছেন—দুই মহীয়সী নারী সীতা ও দ্রৌপদী।

হেলেনের সৌন্দর্য্যের আগুনে যেমন ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল, তেমনি সীতার রূপের আগুনে ছারখার হলো সোনার লঙ্কা ও দ্রৌপদীর রূপের বহ্নি শিখায় বিরাট রাজার শ্যালক সেনাপতি কীচক সহ একশত পাঁচ জন উপকীচকও নিহত হয়েছিল। কুরু বংশ ধ্বংসের অন্যতম কারণও দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর রূপ বহ্নিতে গান্ধারীর পুত্ররা যে ভস্মীভূত হবেন, গান্ধারী পূর্বেই তা আশঙ্কা করেছিলেন।

এই দুই কন্যাদ্বয়ের জন্ম রহস্যও সমান বিস্ময়কর। উভয়েই জন্মান্তরের শত্রু নিধনের জন্য এবং দেবকুলের শত্রু বিলোপের জন্য অযোনিজা কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে বৃহস্পতিপুত্র মহর্ষি কুশধ্বজের বেদভ্যাসকালে বাঙ্ময়ী মূর্তিতে জন্ম গ্রহণ করেন রূপবতী কন্যা বেদবতী। দেব,

গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষসাদি তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কুশধ্বজ সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর ইচ্ছা বিষ্ণুকেই তিনি জামাতা রূপে বরণ করবেন। এজন্য দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। বেদবতীর জননী সহমৃতা হন। বেদবতী বিষ্ণুকে পতি রূপে লাভ কববার জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন।

রাবণ হিমালয় পর্বতে ভ্রমণ করবার সময় একদিন সুন্দরী বেদবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পত্নী রূপে কামনা করলেন। বেদবতী তাঁব সঙ্কল্পের কথা জানিযে রাবণকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন রাবণ বেদবতীব কেশ স্পর্শ করলে বেদবতীর হস্ত সহসা অসিতে পরিণত হলো, তা দিয়ে তিনি কেশপাশ ছিন্ন করে আপনাকে রাবণের কবল হতে মুক্ত কবেন, এবং বললেন বাবণের হস্তে ধর্ষিতা হযে তিনি জীবিত থাকতে চান না। রাবণ বধের নিমিত্ত তিনি কোন ধার্মিক ব্যক্তির অযোনিজা কন্যা রূপে পুনরায জন্ম গ্রহণ করবেন এই বলে তিনি জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেন।

পবজন্মে তিনি এক পদ্মপুষ্প হতে উদ্ভূত হয়েছিলেন। পুনরায রাবণ সেই সুন্দবী কন্যাকে দেখে রাজপ্রাসাদে নিযে যান্। রাবণেব মন্ত্রী সেই অপরূপ সুন্দরীর লক্ষণাদি দেখে বলেন যে এই সুন্দরীকে গৃহে রাখলে সে রাবণেব মৃত্যুর কারণ হবে। মন্ত্রীর পরামর্শে রাবণ সেই কন্যাকে সাগর জলে নিক্ষেপ করেন।

সেই কন্যা বাজর্ষি জনক বাজার যজ্ঞ ভূমির হলকর্ষণের সময় বসুমতীর বুক হতে হলাগ্রভাগে উঠেন। লাঙ্গলেব মুখে পাওয়া গিয়েছিল বলে তাঁর নাম বাখা হযেছিল সীতা। জনক রাজার কন্যা বলে তাঁর অপর নাম জানকী। বিদেহ দেশের রাজকন্যা বলে বৈদেহী তাঁর অন্য নাম। সীতাই রাবণের মৃত্যুব কাবণ হয়ে এভাবে পুনর্জন্ম লাভ কবেন।

কথিত আছে, পুবাকালে দেবতাবা নৈমিষারণ্যে শামিত্র নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। যম সেই যজ্ঞেব পৌরহিত্য কবেন।

যম যজ্ঞ কার্য্যে ব্যাপৃত, অতএব মরজগৎ অমর হয়ে মানুষ জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে দেবতারা প্রমাদ গুণে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে, তিনি দেবতাদের আশ্বাস দিলেন যে যজ্ঞ শেষে যমরাজ আবার নিজ কাজে ফিরে যাবেন। তখন মানুষ আবার মরণশীল হবে।

একদিন দেবগণ ভাগীরথী তীরে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, ভাগীরথীর জলে একটা সুবর্ণ পদ্ম ভেসে যাচ্ছে। সকলে সুবর্ণ পদ্ম দেখে বিস্মিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পদ্মের মূল কোথায় দেখতে গিয়ে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্তময়ী রোরুদ্যমানা এক রমনী গঙ্গায় অবগাহন করছেন। তাঁর এক একটি অশ্রুবিন্দু এক একটি স্বর্ণ পদ্মের রূপ নিচ্ছে।

তিনি কে এবং তাঁর ক্রন্দনের হেতু কি,—ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে রমণী তাঁকে তাঁর অনুগমন করতে বলেন। কিছুদূর যাবার পর ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয় শিখরে সিদ্ধাসনে বসে এক সুদর্শন যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলায় রত। ইন্দ্রের উপস্থিতি তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

এটা দেখে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—সমস্ত ভুবন তাঁর বশীভূত। তিনি তার প্রভু। তখন ঐ যুবা ইন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র ইন্দ্র নিশ্চল হয়ে পড়লেন। যুবারূপী মহাদেব ইন্দ্রকে অহঙ্কার করতে নিষেধ করে বললেন—তোমার মধ্যে অতুলনীয় বল ও বীর্য্য আছে। তুমি এই পর্বতরাজকে হটিয়ে তার গুহার মধ্যে প্রবেশ কর।

তাঁর আজ্ঞা মত ইন্দ্র গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁর মত তেজস্বী আরও চারজন পুরুষকে সেখানে দেখলেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে, ব্রহ্মা বললেন, অহঙ্কারের ফলে এদের স্থান এখানে হয়েছে। তুমিও এই গুহার মধ্যে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে শত্রুবধ করে ইন্দ্রলোকে পুনরাগমন করবে।

ব্রহ্মার কৃপায় এবং নারদের অনুমোদন পেয়ে তাঁরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয়েয ঔরসে মানুষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং সেই রূপসী রমণী মনুষ্যলোকে তাঁদের ভার্য্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই পঞ্চ ইন্দ্রই পঞ্চ পাণ্ডব ও সেই সুন্দরীই দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী সম্বন্ধে আরও নানা কিংবদন্তী আছে। এক তপোবনে কোন এক ঋষির সতী সাধ্বী রূপবতী কন্যার উপযুক্ত পতি পাওয়া গেল না। তখন সে কন্যা কঠোর তপস্যার দ্বারা শঙ্করকে তুষ্ট করলে শঙ্কব দর্শন দিয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন।

সেই কন্যা 'পতিং দেহি' বলে পাঁচবার পতি প্রার্থনা করেন। শঙ্কর বর দিলেন—তোমার পাঁচ পতিই হবে। তবে এ জন্মে নয়—জন্মান্তরে। সেই মুনি কন্যা দ্রৌপদী রূপে যাজ্ঞসেন রাজার মহাযজ্ঞ বহ্নি হতে উদ্ভূতা হযেছিলেন।

দ্রৌপদী হোমাগ্নিব ন্যায় দীপ্ত, কিন্তু স্নিগ্ধা শুদ্ধা। তিনি পাণ্ডব সংসারে অনন্ত ববাভয় বিকীর্ণ কবেছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মারই সৃষ্ট এই দেবী।

রাম স্বয়ং নাবায়ণ, সীতাও লক্ষ্মী। কিন্তু তাঁবা যখন মানবদেহ ধারণ করে মর জগতে আসলেন, তখন তাঁরাও নিয়তির অধীন হয়ে পড়লেন। সাধারণ মানুষের মত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে মর জীবন অতিবাহিত কবে তাঁদের পূর্ব জীবনে প্রত্যাগমন করেন। সীতার জীবন কাহিনী এই শাশ্বত সত্যেব এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

যুধিষ্ঠিরকে ধর্মেব পুত্র বলা হয়। অথচ যুধিষ্ঠির জায়া দ্রৌপদীকে বারংবাব লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ভাগ্যের লিখন অখণ্ডনীয়। এই কারণেই স্বয়ং নারায়ণ স্বামী বা স্বয়ং ধর্মপুত্র স্বামীব সাহচর্য্য পেযেও এই দুই নারীব জীবনে দুঃখ লাঞ্ছনা মর্ত্যের সাধারণ মানুষেব সুখ দুঃখেবই মত।

এই দুই মহাকাব্যের দুই নায়িকাকে ব্রহ্মা মর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন পাপতাপ ক্লিষ্ট সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্যে। এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য

সাধনে প্রযোজন শক্তি, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, সাহস ও ধৈর্য্য। মন জগতকে এই শিক্ষা দানের জন্য স্রষ্টা আত্মজদের কত না দুঃখ কষ্ট ত্যাগের মধ্য দিযে তাঁর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যোদ্ধার করেছেন।

সীতা চরিত্র মধুর। একটি আদর্শ নারী চরিত্র। নারী জাতির নম্র, কোমল গুণাবলী পূর্ণরূপে পরিস্ফুট তাঁর চরিত্রে। তাঁর চরিত্রে এক বিনম্র কুলবধূর ছাপ সর্বত্র বিদ্যমান। দ্রৌপদী চরিত্রে অম্ল মধুরের বিচিত্র সংমিশ্রণ। দ্রৌপদী চরিত্রে কোমলতা ও কাঠিন্যের এক অপূর্ব সমাবেশ। সীতা যেন লতার মতই নম্র, পরনির্ভরশীল। কিন্তু দ্রৌপদী ভীমের যোগ্য বীরাঙ্গনা পত্নী। প্রয়োজনে কঠোর উক্তি বা ধিক্কার দিতে বা কোন পার্থক্য না রেখে সকল অপরাধীর সমালোচনা করতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেননি।

সীতাকে বিবাহ করবার জন্য অনেক নৃপতি প্রার্থী ছিলেন। মিথিলাপতি জনক রাজা তাঁদের হরধনু দেখিযেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ তা ধরতে বা তুলতে না পারায় সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হন্। তাঁরা সবলে কন্যাকে হরণ করবার উদ্দেশ্যে মিথিলা অবরোধ করেন। অবশেষে জনক রাজা তপস্যা করে চতুরঙ্গ শক্তি লাভ করেন, তখন নৃপতিগণ পরাজিত হযে পলাযন করেন।

বিশ্বামিত্র মুনি তাঁর যজ্ঞ রক্ষার্থে রামকে রাজা দশরথের নিকট হতে চেয়ে এনেছিলেন। ঐ সময তিনি রামকে রাজর্ষি জনকের রাজ্যে নিযে আসেন। সীতার বয়স তখন ছয বৎসর।

সীতা সবার অগোচরে শিব পূজা করে শিবের কাছে রামকে পতিরূপে প্রার্থনা করেন—

শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ॥ (আদি)

প্রথম দর্শনেই যেন সীতা রামের প্রতি আকৃষ্ট হযেছিলেন। তাই রামকেই পতি রূপে কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

জনক রাজার প্রতিজ্ঞায় সীতা শঙ্কিত। কারণ ঐ হরধনু কোন বীরই এমন কি সুরাসুর রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতি কেউ ভঙ্গ করতে পারেনি।

রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে যে বিরিঞ্চি কর বঞ্চিত ঐ ধনে॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে॥ (আদি)

কিন্তু স্বয়ংবর সভায় কোন অনভিপ্রেত প্রার্থীর আগমন ঘটলে, তাকে প্রত্যাখান করার সাহস সীতার ছিল না। এখানে সীতা ও দ্রৌপদী চরিত্রের এক বিশিষ্ট বৈষম্য।

দ্রুপদ রাজার পণ ছিল যে দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিঁধতে পারবে, সেই দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণের একমাত্র অধিকারী। স্বয়ংবর সভায় অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধতে উদ্যোগী হলে, দ্রৌপদী সেই রাজসভায় পিতা দ্রুপদরাজ বা ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নর অপেক্ষা না করে নিজেই বললেন—

নাহং বরয়ামি সূতম্। (আদি) ১৮৭।২৩

—সূতপুত্রকে আমি বরণ করব না।

এই কথা শুনে কর্ণ শরাসন ত্যাগ করলেন।

এইরূপ নির্ভীক ও স্পষ্ট উক্তি সীতার মুখে কখনই প্রকাশ পায়নি। প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর তেজস্বিতা প্রকাশ পেলেও, পিতা ও অগ্রজের সম্মান বা মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রতি তাঁর এই ঔদাসীন্য পীড়া দেয়।

রাম অনায়াসে সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করে আকর্ষণ করলেন। বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দে ধনু ভেঙ্গে পড়ল।

মহারাজ দশরথের অনুমতি ক্রমে তাঁর সামনে বশিষ্ঠ, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ যথাবিধি হোম আরম্ভ করেন।

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ (আঃ) ৭৩।২৬-২৭

—(রামকে উদ্দেশ্য করে রাজা জনক বললেন) এই আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মচারিণী, তুমি একে নাও, তোমার পাণির দ্বারা তার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগা পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবে।

সতীনের প্রতি নারীর সহজাত আতঙ্ক তথা সহজাত বিদ্বেষ সীতা ও দ্রৌপদীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করে, রাম যখন পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরাম রামকে তাঁর ধনুকে গুণ দিতে আহ্বান করেন। এ আহ্বানে সীতা চিন্তিত হয়ে

জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমণি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥ (আঃ)

সভামধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীমের পত্নী হিড়িম্বা কুন্তীকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে, যখন সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর সঙ্গে একাসনে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করল, তখন দ্রৌপদী তার উদ্দেশ্যে বলেন :—

সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ বৈস্ তুমি গিয়া॥ (সভা)

এইখানে দ্রৌপদীর মধ্যে নারী সুলভ ঈর্ষার ছবি লক্ষ্য করবার মত। অর্জুন যখন সুভদ্রাকে বিয়ে করে এনেছিলেন, তখন তাঁকে দেখেও দ্রৌপদীর মধ্যে ঈর্ষ্যার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেছে। তাই দ্রৌপদী অর্জুনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—অর্জুন, এখানে কেন?

যেখানে যাদব কন্যা আছে, সেখানেই যাও।

সীতার জীবনে স্বামী প্রেমের ভাগীদার কখনো আসেনি। তিনি একাই স্বামীর সোহাগের অধিকারিণী। কিন্তু দ্রৌপদীর জীবনে অনেক সপত্নীই এসেছিল তাঁর পঞ্চ স্বামীর হাত ধরে। যদিও তিনিই ছিলেন প্রধানা। মহাভারতে অন্যরা নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রভ তাঁর দীপ্ত তেজের পাশে।

রাম ও সীতা উভয়েই যে সুখী দম্পতি ছিলেন, তা নীচের উদ্ধৃতি হতে প্রতীয়মান হয়।

প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি ॥
গুণাদ্রূপগুণাচ্চাপি প্রীতি র্ভূয়োঽভিবর্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্ত্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে ॥ (আঃ) ৭৭।২৬-২৭

—সীতা তাঁব পিতৃ প্রদত্ত বলেই রামেব সমধিক প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁর রূপ গুণের জন্য রামের অনুবাগ আরও বর্ধিত হল। সীতার হৃদয়েও স্বামীর প্রতি দ্বিগুণ প্রীতিব সঞ্চার হল।

শ্বশুরালয়ে সীতা সকলেব স্নেহ আদবে পবম সুখে বাস করেছেন। কালক্রমে তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া পবিপূর্ণা যুবতী।

রামের বাজ্যাভিষেকেব সংবাদ শুনে সীতা প্রীত ও হৃষ্ট হলেন। স্বামীর বাজ্য প্রাপ্তিব সংবাদে কোন্ স্ত্রী না হৃষ্ট হয়?

রামের অভিষেকের দিন বিমাতা কৈকেয়ী পূর্ব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বব রাজা দশরথ হতে যাচ্ঞা কবে এক বরে রামকে চৌদ্দ বৎসবেব জন্য বনে ও দ্বিতীয় বরে ভরতকে বাজসিংহাসন দিতে প্রার্থনা করেন। ফলে পিতৃসত্য পালনে বামকে চৌদ্দ বৎসরেব জন্য বনে যেতে হলো। বনবাসেব খবর পেয়ে বাম যখন বিষণ্ণ বদনে সীতা সমীপে আসলেন, তখন সীতা রামকে প্রশ্ন কবলেন:—

অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্যুক্তঃ পুষ্যেণ বাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ ॥ (অযো)

—আজ বৃহস্পতি দ্বাবা অধিষ্ঠিত পুষ্যার সঙ্গে চন্দ্রেব মিলন হয়েছে,

পণ্ডিতগণ এই মুহূর্ত্তকে শুভ বলেছেন, তবে তুমি কেন বিমর্ষ বা দ্বিধাগ্রস্ত ?

এই উক্তি হতে সীতা জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তা প্রমাণিত হয়।

রামের বনগমন যখন স্থির হলো, সীতাও বনে রামের অনুগমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গভীর অরণ্যে নানা রকম বিপদ ও অসুবিধার কথা রাম সীতার কাছে উল্লেখ করলে, উত্তরে সীতা রামকে বলেছিলেন :—

ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥ (অযো) ২৭।৫

—হে নরশ্রেষ্ঠ, নারী একমাত্র নিজের পতিরই ভাগ্য পেয়ে থাকে। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ পেয়েছি। অতএব আমাকেও বনে যেতে হবে।

রাম নানা ভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে, সীতা বলেন, পিতৃগৃহে থাকতে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদের মুখে তিনি শুনেছিলেন, তাঁর অদৃষ্টে অরণ্যবাস আছে। সেই সময় হতে তাঁর মনে অরণ্য-বাসের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে।

রামের বনগমনের সংবাদেও সীতাকে কোন রূপ বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং রাম, চৌদ্দ বৎসর সীতা অযোধ্যায় কিভাবে ব্রত, উপবাস, পূজার্চা, গুরুজনদের সেবা করবেন, এমন কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতের সামনে রামের প্রশংসা যেন কখনও না করেন—এইরূপ নানা উপদেশ দিলে, সীতা দশরথ বা কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে কোন রকম উষ্মা প্রকাশ না করে বলেছিলেন :—

বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্য ত্বয়েরিতম্ ॥ (অযো) ২৭।৩

এমন কথা তুমি বললে যা শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজপুত্রের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য এবং যা তোমার মুখ থেকে শোনাও উচিত নয়।

এই উক্তি হতে সীতার কেবল মাত্র শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না, নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তাঁর প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাই। তাই তিনি বলেছেন :—

সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্॥
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু॥ (অযো) ২৭।১২-১৩

... ...

এবং বর্ষ সহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ॥
স্বর্গেহপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে॥ (অযো) ২৭।২০-২১

—ত্রিলোকের সব ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে ও পাতিব্রত্য ধর্মের কথা ভেবে অতি সুখে বনে বাস করব, যেমন সুখে পিতৃগৃহে। সংযত ব্রহ্মচারিণী হযে নিত্য তোমার সেবা করব, মধুগন্ধ সুবাসিত বনে তোমার সঙ্গে বিহার করব। আমি এইরূপে তোমার সঙ্গে শত বা সহস্র বৎসর যাবৎ বনবাস করলেও সামান্য কষ্টবোধও করব না। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গে বাসও আমার কাম্য নয়।

এখানে সীতা নিজেকে রামের যথার্থ সহধর্মিণী রূপে পরিচয় দিয়েছেন। সীতা আরও বলেছেন :—

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥ (অযো) ৩০।৬

—দ্যুমৎসেন রাজার বীর পুত্র সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মত তুমি আমাকে তোমার বশবর্ত্তিনী জেনো।

সীতার এই উক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। যথার্থ রাজনন্দিনী রাজবধূ সাবিত্রীর মতই রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতাও স্বামীর সঙ্গে বনগমন করে যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। কিন্তু এজন্য কখনও তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন ফরিযাদ জানাননি বা কাউকে অভিসম্পাত

দেননি। তাঁর চরিত্রে ধীর, স্থির, সংযমী এসব বিশেষ গুণ ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে রামায়ণ কাব্যেব পাতায় পাতায় শোভা পাচ্ছে।

রাম পুনরায় সীতাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে, সীতা শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ—

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রামং জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষ বিগ্রহম্॥ (অযো) ২৭।৩

—পুরুষের আকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক জেনেই কি আমার পিতা মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হবার যোগ্য মনে করেছিলেন।

নিজ নারী রাখিতে যে কবে ভয় মনে।
দেখ তায় বীর বলে কোন ধীর জনে॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা॥

... ...

তৎসহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল॥ (অযো)

দীপ্ত কণ্ঠে তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানালেন ঃ—

তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥ (অযো)

এই উক্তি কেবলমাত্র স্বামীর কর্ত্তব্যের প্রতি স্ত্রীর ইঙ্গিত নয়। এই অনমনীয় মনোভাবে জ্বালা নেই। বরং স্নিগ্ধ ভাবে কর্ত্তব্য হীনের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া দেয়।

অপরপক্ষে দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পুনঃ পরাজিত হলে, দুর্যোধনের নির্দ্দেশে প্রতিকামী তাঁকে নিতে আসলে, দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন—

কিংনু পূর্ব্বং পরাজৈষীবাত্মানমথবা নু মাম্॥ (সভা) ৬৭।৭

—রাজা কি প্রথমে নিজেকে পণ রেখে হেরে আমাকে হেরেছেন,

অথবা পূর্বে আমাকে পণ রেখে নিজেকে হারিয়েছেন।

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির কিভাবে পরাজিত হয়েছেন তা জেনে, দ্রৌপদী দাসত্ব স্বীকার করবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানে দ্রৌপদীর বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।

বনগমনের পূর্বে রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতা সহ কৈকেয়ী ও দশরথ সমীপে বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন, কৈকেয়ী রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে চীর দিয়ে তা পরিধান করতে বললেন। তিনি সীতার হাতেও চীর দিলে, সীতা সজল নয়নে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন বনবাসী মুনিরা কেমন করে চীর পরিধান করেন? রাম তাঁর পট্টবস্ত্রের উপরই বল্কলখানি পরিয়ে দিলেন।

সীতার নির্মল সরলতা এখানে প্রভাতে প্রস্ফুটিত স্নিগ্ধ পুষ্পের ন্যায় যেন প্রকাশ পেয়েছে। নিজের অজ্ঞতার জন্য তিনি সঙ্কুচিত নন। শিশুর সারল্য নিয়ে তিনি সর্বসমক্ষে স্বামীর নিকট নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বশিষ্ঠ মুনি রামকে অনুরোধ করেন তিনি যেন সীতাকে বনবাসে সঙ্গিনী না করেন। কিন্তু সীতা আপন কর্তব্য সম্বন্ধে ধীর, স্থির, অটল। তাঁর এই দৃঢ় সঙ্কল্প হতে কেউ-ই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করে বনে এই যে দুঃখ বরণ, তার জন্য তিনি কখনও রামের কাছে কোন অনুযোগ করেননি। কিন্তু দ্রৌপদী বনবাস কালে কৃষ্ণের নিকট অনুযোগ করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরকেও মাঝে মাঝে বাক্য বাণে জর্জরিত করেছেন। এই দুই নারী চরিত্রে এখানে বিরাট বৈষম্য লক্ষিত হয়।

বনগমনের পূর্বে কৌশল্যা সীতাকে স্বামীর প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর দিলেন, আমি আপনার সব আদেশ পালন করব।

স্বামী সেবা করিতে যে আমি ভাল জানি॥

স্বামী সেবা করি মাত্র এই আমি চাই।
তে-কারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি পিতৃঘরে।
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে॥
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা॥ (অযো)

তিনি কৌশল্যাকে আরও বলেছিলেন, চাঁদের প্রভা যেমন চাঁদ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, আমিও তেমনি ধর্ম হতে স্খলিত হব না।

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ (অযো) ৩৯।৩০

—পিতা ও পুত্র যা দেন তা পরিমিত, কিন্তু ভর্ত্তার (স্বামীর) দান অপরিমিত। তাঁকে কে না পূজা করবে ?

শাশুড়ীকে এই ভাবে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। শোকাতুরা জননী বধূব কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে পুত্র সম্বন্ধে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এখানেও সীতাব শুভ্র প্রজ্ঞা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার প্রমাণ পাই।

সীতা প্রফুল্ল চিত্তে স্বামীর অনুগমন করেছিলেন কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি বা দশরথের নিকট স্বামীর জন্য কোন প্রকার অনুগ্রহও যাচ্ঞা করেননি। বার বার তিনি ভবিতব্যই মেনে নিয়েছেন বিনা ক্ষোভে।

সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—রামের অনুগতা সীতা নির্জন অরণ্যে নির্ভয়ে বাস করছেন। তাঁর কোন রকম দুঃখ দেখিনি। সীতার সৌন্দর্য পথশ্রমে কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। সালঙ্কৃতা জানকী রামের বাহুদ্বয় আশ্রয় করায় হিংস্র জন্তু দেখেও ভয় পান না।

বিপদ সঙ্কুল বনবাসে সীতার সাবলীল জীবন যাপনের একটা সুন্দর চিত্র যেন সুমন্ত্র তুলে ধবেছেন। সাধ্বী স্ত্রী গহন অরণ্যে

স্বামীর অনুগমনের আনন্দে সমস্ত বাধা বিপত্তি, দুঃখ কষ্টকে হৃষ্ট মনে গ্রহণ করেছেন।

বনগমনেব পথে গুহব আশ্রম হতে যাবার সময়, সীতা ভাগীরথীব মধ্য দিয়ে গমন কববার সময়, গঙ্গাব বন্দনা করেন এবং অযোধ্যায প্রত্যাবর্ত্তনের পব গঙ্গার তীরস্থ সমস্ত দেবতাদেব পূজা দেবাব সঙ্কল্প করলেন।

পুনরায যমুনার মধ্য ভাগে এসে সীতা দেবীর বন্দনা করে বলেন, তাঁব স্বামী যেন নির্বিঘ্নে ব্রত পালন করতে পারেন। তিনি অযোধ্যায প্রত্যাবর্ত্তন কবে সহস্রধেনু ও একশত সুরাপূর্ণ কলস দ্বাবা তাঁব অর্চনা করবেন—মানত করলেন।

দক্ষিণতীরে উপস্থিত হয়ে বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে অভিবাদন করে বলেন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কবে যেন তাঁবা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে দেখতে পান।

অত্রিমুনির পত্নী অনুসূয়া পাতিব্রত্য ধর্ম সম্বন্ধে সীতাকে উপদেশ দিলে তিনি তাঁর আদেশ পালন কববেন বলেন। তিনি আরও বলেন, কুমারী জীবনেই তিনি স্ত্রী জীবনের আচাব-আচবণ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। বিবাহকালে জননী অগ্নির সম্মুখে যা বলেছিলেন এবং বনে আগমনের সময় শ্বশ্রূব উপদেশাবলীও তিনি সর্বদা স্মবণ রাখেন।

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্বাদল শ্যাম॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা কবি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্বাদ কব যেন রামে থাকে মতি॥ (অবণ্য)

অনুসূয়ার প্রশ্নোত্তরে সীতা তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত ও বিবাহ প্রসঙ্গ তাকে জানালেন, মুনিপত্নী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বস্ত্র আভরণ ইত্যাদি দান করলেন।

মুনি পত্নীর নিকট সীতার আত্মকাহিনী এমন সরলভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে তাঁর অন্তরের মাধুর্য্য প্রকাশ পেয়েছে। কোন রকম অহমিকা বা দাম্ভিকতার লেশ তারমধ্যে দেখা যায় না। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে তৈরী করার মনোভাব নিয়েই যেমন তিনি বনবাস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালনও করেছেন।

অত্রিমুনির স্ত্রী অনুসূয়া তাঁর তপস্যাব শক্তির প্রভাব সীতাকে দান করতে ইচ্ছা করলে সীতা বলেছিলেন :—

কৃতমিত্য ব্রবীৎ সীতা তপো বনসমন্বিতায়। অযো) ১১৮।১৬

—আপনার অনুগ্রহে আমার বাসনা পূর্ণ হযেছে।

দ্রৌপদীও সীতার মত নির্লোভ ছিলেন! কুরুসভায় দুঃশাসনাদির দ্বারা নিগৃহীতা অপমানিতা দ্রৌপদীব ক্রন্দনে যখন অমঙ্গল চিহ্ন সূচিত হয, তখন ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—তুমি আমার বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তুমি ধর্মপরায়ণা সতী কুললক্ষ্মী। বৎসে, তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কব।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মোচন, তাঁর পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে যেন কেউ দাসপুত্র না বলে,—এই বর প্রার্থনা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করতে বললে, দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেবকে দাসত্ব হতে মুক্ত ও স্বাধীন করতে বলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে তৃতীয় বর প্রার্থনা করতে বললে, উত্তরে দ্রৌপদী বলেছিলেন :

দুই বর পাই, আর নাহি চাই
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী জন স্থানে, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে॥

বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক।
ক্ষত্র লৈবে তুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর॥ (সভা)

কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে—বৈশ্য একবর, ক্ষত্রিয় নারী দুই বর, রাজা তিনবর এবং দ্বিজ শতবর যাচ্ঞা করতে পারে।

লোভো ধর্মস্য নাশায় ভগবনং নাহমুৎসহে।
অনর্হা বরমাদাতুং তৃতীয়ং রাজসত্তম॥ (সভা) ৭১।৩৪

—হে ভগবান, লোভ ধর্ম নাশের কারণ। সুতরাং আমি তৃতীয় বর চাইতে উৎসাহ বোধ করছি না। আমি তৃতীয় বরের অযোগ্য।

অনুরুদ্ধ হয়েও এরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা দ্রৌপদীর আত্ম-সংযমের পরিচায়ক।

মুনিদের অনুরোধে রাম অরণ্যের রাক্ষসদের বিনাশ করবার প্রতিশ্রুতি দিলে সীতা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এখন তিনি ক্ষত্র ধর্মপরায়ণ শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রূপে বনে বিচরণ করছেন না, যার জন্য আর্ত্তব্যক্তিদের রক্ষার জন্য রাক্ষস বধ করবেন। বরং তিনি এখন জটা বল্কলধারী। তপস্যাই তাঁর ব্রত। তাঁর ধর্ম শাস্ত্র, শস্ত্র নয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শত্রুতা ব্যতিরেকে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের বধ করতে যাওয়া উচিত নয়। কারণ কোথায় ক্ষত্রধর্ম, আর কোথায় তপশ্চর্য্যা!!

সীতা একটি উদাহরণ দিয়ে রামকে বলেন, পুরাকালে এক ঋষি বনে তপস্যা করতেন। ইন্দ্র তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি খড়্গ গচ্ছিত রাখেন। ঐ খড়্গটি যদি অপহৃত হয়, সেই ঋষি তাই গচ্ছিত খড়্গটি সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। খড়্গের সংস্পর্শে ক্রমশঃ তাঁর স্বভাব হিংস্র হয়ে উঠল, অবশেষে তিনি নরকে গেলেন।

ক্ব চ শাস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ॥ (অরণ্য) ৯।২৬

—কোথায় অস্ত্র আর ক্ষত্রধর্ম, আর কোথায় বন আর তপস্যা!

কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥

... ...

নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।
সর্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যমপি তত্ত্বতঃ॥ (অরণ্য) ৯।২৮।৩২

—অস্ত্র শস্ত্রের সেবা দ্বারা বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। তুমি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে ক্ষত্রধর্মের চর্চা করো। সৌম্য, তুমি এই তপোবনে শুদ্ধস্বভাব হয়ে নিত্য তপোবনে ধর্মাচরণ কর, ত্রিলোকের সমস্ত কর্ত্তব্যই তো তুমি জ্ঞাত আছ।

স্থানকালোপোযোগী এই যুক্তি সীতার প্রখর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রমাণ। অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে তিনি সীতার প্রশংসা করে বলেছিলেন :—

এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণাম আসৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ॥

... ...

ইয়ং তু ভবতো ভার্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী॥ (অরণ্য) ১৩।৫-৭

—রঘুনন্দন, সৃষ্টির আদি কাল থেকে স্ত্রী জাতির ইহাই স্বভাব যে তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত হয় এবং বিপন্নকে ত্যাগ করে। কিন্তু তোমার ভার্যা এই সব দোষবিবর্জিতা। দেবতাগণের মধ্যে যেমন অরুন্ধতী, ইনিও তেমন শ্লাঘনীয়া ও অগ্রগণ্যা।

সীতার সম্বন্ধে এই প্রশংসাবাণী কেবল মাত্র রামের সন্তুষ্টির জন্য নয়। এই উক্তি অগস্ত্য মুনির সীতা চরিত্রের যথার্থই নিরপেক্ষ মূল্যায়ন।

সীতা চরিত্রে সামান্য একটা ভুলই তাঁর জীবনে অশেষ দুঃখের অভিশাপ ডেকে এনেছিল। একদিন পুষ্প চয়ন কালে সীতা এক

রত্নময় মৃগ দেখেন। স্বর্ণমৃগ অবাস্তব জেনেও, সীতা মায়াবী মারীচকে রত্নমৃগ ভ্রমে মুগ্ধ হয়ে রামকে অনুবোধ করলেন ঐ মৃগটি ধরে আনবার জন্যে।

রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে হরিণ ধরতে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পরই রামের স্বর অনুকরণ করে ঐ মৃগ 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' বলে ডাকতে থাকে।

সেই আর্ত্তস্বরে সীতা রামের বিপদ আশঙ্কায বিচলিত হলেন। লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে যেতে অনুরোধ কবা সত্ত্বেও, অরণ্যে সীতাকে একাকী রেখে কোথাও যেতে লক্ষ্মণ অস্বীকৃত হলেন। তিনি বুঝেছিলেন ঐ রত্নময মৃগ যেমন মায়াবী রাক্ষস, তেমনি রামেব কণ্ঠস্ববও বাক্ষসেব মায়া।

কিন্তু স্বামীব বিপদ আশঙ্কায় সীতাব বুদ্ধিবিভ্রম ঘটলো। তিনি লক্ষ্মণকে কটূক্তি করে বলেছিলেন :—

নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।

ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥ (অরণ্য) ৪৫।২৩

—লক্ষ্মণ, তোমার ন্যায় নির্দ্দয় কপটাচারী জ্ঞাতিশত্রু যে পাপকার্য্য করবে তা বিচিত্র নয।

লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।

ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে॥ (অরণ্য) ৪৫।৭

—তুমি আমাকে পাবাব লোভেই রামের অনুগমন করছ না। ভাইয়েব প্রতি তোমাব স্নেহ নেই। তাঁর বিপদই তোমার ঈপ্সিত—আমি মনে কবি।

তিনি আরও বলেন, তুমি ভরত কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে কিংবা স্বয়ং নিজেই আমাকে গ্রহণ করবার অভিপ্রায় গোপন করে একাকীই বনে রামের অনুগমন করেছ। তোমার অভিপ্রায় কখনও সিদ্ধ হবে না।

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।

আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥

ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।

... ...

ভরত সনে তব আছে ভারি ভুবি॥
মনের বাসনা কি সাধিয়ে এই বেলা॥
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা।

... ...

অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥ (অরণ্য)

বাল্মীকি রামায়ণেও সীতা একই ভাব প্রকাশ করে লক্ষ্মণকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন :—

উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥ (অরণ্য) ৪৫।২৬

—রামকে পতিরূপে ভোগ করে কি করে অন্য জনকে কামনা করব? হে সুমিত্রানন্দন, তোমাব সামনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। তাই সীতার এমন মতিভ্রম ঘটেছিল, যার জন্য তিনি দেবতুল্য দেবর লক্ষ্মণের প্রতি কেবল মাত্র কটূক্তি করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ কদর্য্য সন্দেহ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। যদি তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন, তবে লক্ষ্মণ সম্বন্ধে এমন চিন্তা করতেও লজ্জা বোধ করতেন। এই সাময়িক মতিভ্রমই তাঁর জীবনে সকল বিপদের হেতু।

স্বর্ণমৃগের প্রতি লোভ এবং লক্ষ্মণের প্রতি অহেতুক কটূক্তি—তাঁর উত্তর জীবনে যাবতীয় দুঃখভোগ—এই দুই অন্যায়েব যেন প্রাযশ্চিত্ত।

স্বামী সোহাগিনী সীতা যেমন স্বামীর নিকট আবদার করেছিলেন স্বর্ণমৃগের জন্য—তার পরিণাম রাম ও সীতা উভয়েরই পক্ষে বেদনাদায়ক হযেছিল, তেমনি দ্রৌপদীও যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে

বদরিকাশ্রমে ভ্রমণরত ছিলেন, বায়ু তাড়িত সহস্রদল দিব্যপদ্ম দেখে ঐ পদ্মটি যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়ে ঐ জাতীয় আরও পদ্ম সংগ্রহ করে আনতে ভীমের কাছে আবদার করেন। স্বর্ণমৃগ দর্শন, তার পশ্চাৎ অনুধাবন রামের স্বর অনুকরণে লক্ষ্মণ ও সীতাকে ডাকা—রাবণের এক ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ, যার পরিণতি সীতার জীবনে অশেষ দুঃখ। কিন্তু ভীমের এই অভিযানে দ্রৌপদীর বা ভীমের বা পাণ্ডবদের কোন দুর্ভাগ্য টেনে আনেনি। পরন্তু এই অভিযানের মাধ্যমে ভীম তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পবনপুত্র হনুমানের সাক্ষাৎ পান, ও তাঁর কাছে রামচরিত ও চার যুগের ধর্ম সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। অধিকন্তু ভীমের আপন শক্তি সম্বন্ধে যে দৃঢ় বিশ্বাস ও অহমিকা ছিল, হনুমান সেই বিশ্বাসের ভিত নেড়ে দিয়ে তা নির্মূল করেছিলেন।

অনাত্মীয় রাবণ এসে প্রথমেই যেভাবে সীতার রূপের প্রশংসা করছিলেন, সেই ব্যক্তি সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের রূপে আসলেও, তাকে বিশ্বাস করা সীতার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়নি। এবং তাঁর কাছে অপকটে আত্মপরিচয় দেওয়া বা স্বামীর অবর্ত্তমানে অতিথির সেবায় ব্রতী হওয়া প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরায় সীতার নারী সুলভ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের এই দুরভিসন্ধি পূর্বাহ্নে অনুমান করতে না পারা—এটাও কি সীতার নিয়তি বা বিধির বিধান?

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতার বিলাপ ও রাবণের প্রতি অভিসম্পাত খুবই মর্মস্পর্শী। তিনি রামের সঙ্গে রাবণের তুলনা করে রাবণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন রাম রাবণের তুলনা চলে না। ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন :—

শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস্ কুবচন॥

বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিস্ আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুব দশরথ নৃপমণি ॥
আপনি ত্রিলোক মাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাঁহারে রাক্ষস হরে অতি চমৎকার ॥ (আরণ্য)

সীতা নিজে যে জনার্দ্দনেব অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। এই ক্ষেদোক্তির মধ্যে তাঁর এরূপ দুর্দ্দশাব জন্য অপার বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

সীতা কেবল উচ্চৈঃস্বরে রাম লক্ষ্মণকেই ডাকেননি, তিনি বলেছেন,—হে জনস্থানের পুষ্পিত কর্নিকার তরু, তোমাদের মিনতি করছি, হংসসারসবন্দিত গোদাবরী নদী, বৃক্ষে পূর্ণ বনদেবতাগণ, তোমাদের নমস্কার জানাচ্ছি, এখানে যত মৃগ বিহঙ্গ আছে সকলের শরণ নিচ্ছি—শীঘ্র রামকে জানাও, রাবণ তাঁর প্রাণাধিকা সীতাকে হরণ করছেন।

জটায়ুকে সম্বোধন করে বলেছেন, দেখুন এই পাপিষ্ঠ রাবণ আমাকে অনাথার ন্যায় নির্দয়ভাবে হরণ করছেন। এই অস্ত্রধারী রাক্ষসকে নিবারণ করা আপনার অসাধ্য, আপনি রাম-লক্ষ্মণকে জানান।

সীতার এই বিলাপ হতে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি যেমন তাঁর ব্যবহারে সৌজন্যে বনের আশ্রমিকদের তুষ্ট করেছিলেন, তেমনি প্রাকৃতিক লতা, পাতা, পুষ্প, পশু, পক্ষীর সঙ্গেও তাঁর অন্তরের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, যার জন্য তিনি তাঁর এই দুঃসংবাদের বার্ত্তা রাম লক্ষ্মণেব নিকট পৌঁছিয়ে দেবাব জন্য

তাদের কাছে আবেদন নিবেদন করেছিলেন। বনের সমস্ত স্থাবর জঙ্গম যেন তাঁর একেবারে আপনার জন।

সীতার সঙ্গে বন্য প্রকৃতির এই একটা আত্মিক বা আন্তরিক যোগাযোগ, দ্রৌপদীর চরিত্রে তার একান্ত অভাব, যদিও দ্রৌপদী দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর প্রকৃতির কোলে বন্য লতা পুষ্প ও পশুপক্ষীর মধ্যেই বাস করেছিলেন।

রাবণের ছলনা সরলা সীতাকে অসতর্ক করে সীতাহরণ সহজ ও অনায়াসলভ্য করেছিল। অবলা সীতা, দ্রৌপদীর মত রাবণকে কাবু করতে পারেন নাই। ফলে অশোককাননে দীর্ঘকাল তাঁর বন্দী জীবন। চেড়ী পরিবৃত হয়ে যথার্থই বন্দীর মতই তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছিল এবং দুবন্ত চেড়ীদের নানাপ্রকার নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা তাঁর জীবনকে দূর্বহ করে তুলেছিল। তাদের নানারকম অমূলক অপপ্রচার সীতার মনে ভয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দ্রৌপদীকে এ ধরণের কোন দুঃখ ভোগ করতে হয়নি।

রাবণের দ্বারা অপহৃত হয়ে আকাশ পথে যাবার সময় সীতা পথিমধ্যে বানরদের দেখে তাঁর উত্তরীয় নূপুর কণ্ঠহার ইত্যাদি অভিজ্ঞান ভূতলে নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে বানররা রামকে তাঁর সংবাদ দিতে পারে। এবং কোন পথে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তা যেন রাম লক্ষ্মণ নির্ণয় করতে পারেন।

সীতার এই প্রকার আচরণে তাঁর প্রখর বুদ্ধিব পরিচয় পাওয়া যায়। যদি এইরূপ না করতেন, তবে সুগ্রীব তাঁর অলঙ্কার দেখিয়ে রামকে জানাতে পারতেন না যে তিনি রাবণের দ্বারাই অপহৃত হয়েছেন। তাঁর অলঙ্কারই একমাত্র নিদর্শন যার দ্বারা রাম সুগ্রীবাদি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে লঙ্কাধিপতি রাবণই সীতাকে হরণ করেছেন।

অপহৃতা হয়ে সীতা দৃপ্ত কণ্ঠে রাবণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :—

অপহৃত্য শচীং ভার্য্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।

নহি রামস্য ভার্য্যাং মামানীয় স্বস্তিমান ভবেৎ॥ (অরণ্য) ৪৮।২৩
—ইন্দ্রের শচীকে অপহরণ করে জীবিত থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি রামের ভার্য্যা আমাকে হরণ করে স্বোয়াস্তিতে থাকতে পারবে না।

তিনি রাবণকে শাসিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ঃ—

আমা লাগি হবে তোমার সবংশে মরণ॥

... ...

করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥

... ...

বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর॥ (সুন্দর)

রাবণ তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলে রোরুদ্যমানা সীতা তাঁকে অভিসম্পাত দিয়ে বার বার শাসিয়েছেন যে ঃ—

আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত॥
বিষ্ণু অবতাব রাম তুমি নিশাচর।
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর॥ (সুন্দর)

রাবণ যখন সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করেছিলেন, তখন সীতা তাঁকে নানা অভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে রাবণ তাঁর অচেতন দেহকে বন্ধন বা বিনাশ করতে পারে, কিন্তু তাঁর পাতিব্রত্য ধর্মকে বিনষ্ট করবার শক্তি তাঁর নেই।

সীতা যথার্থই শেষ অবধি তাঁর ধর্ম রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি অন্নজল ত্যাগ করায় দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ সীতা অনশনে প্রাণত্যাগ করলে রাবণ বধ হবে না। তাই ব্রহ্মার আদেশে নিদ্রাদেবী দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কায় গিয়ে রাক্ষসদের গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন এবং সীতাকে হবিষ্যান্ন দান করেন, যেন তা ভোজন করে সীতা সহস্র বৎসরেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর

না হন। সীতা দেবরাজ ইন্দ্রকে যথার্থই চিনতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র প্রদত্ত পরমান্ন প্রথম রাম লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ইন্দ্রের সমীপে তা ভক্ষণ করেন। ইন্দ্র রাম লক্ষ্মণের সংবাদ জানিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করেন।

সীতা হরণ যে দেবতাদেরই অভিপ্রেত ছিল, সীতার জীবনের জন্য দেবকুলের চিন্তিত আচরণ হতেই তা' প্রতীয়মান হয়। সীতাকে হরণ না করলে দেবশত্রু রাবণকে হত্যা করার কোন কারণই ঘটত না। এই কারণেই রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ প্রভৃতি দেবতারা পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

রাবণের আদেশে চেড়ীরা রাবণের ধন ও আয়ুর সঙ্গে রামের ধন ও আয়ুর তুলনা করে রাবণকে স্বামীরূপে বরণ করতে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলে সীতা বলেন ঃ—

সীতা বলে অল্পধন অত্যল্প জীবন।
সেই যে আমার স্বামী কমললোচন॥ (সুন্দর)

অল্পেই সীতার তুষ্টি। কমললোচন রাম তাঁর আকাঙ্ক্ষার চরম প্রাপ্তি অন্য কোন কিছুতে তাঁর লোভ নেই। দ্রৌপদীর মধ্যে এই ভাবটি বিরল।

সীতার কঠোর ভাষণে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ সীতাকে বলেছিলেন এক বৎসরের মধ্যে সীতা তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করলে, রাবণ তাঁকে হত্যা করবেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হতে মাত্র দুইমাস বাকী। সেই সময় সীতাকে রাবণগৃহে দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যারা (রাবণ যাঁদের ইতিপূর্বে বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলেন) আশ্বাস দিলেন। সীতা তখন দীপ্ত কণ্ঠে রাবণকে বলেছিলেন যে, তোমার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই। তাই এমন পাপকর্ম হতে কেউ তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। যতদিন রামের দৃষ্টিপথে তুমি না পড়বে, ততদিন মাত্রই তুমি জীবিত থাকবে। সীতা আরও বলেছিলেন যে রাবণকে ভস্মসাৎ করবার মত তেজ তাঁর আছে। কিন্তু পতির নির্দেশ

তিনি পাননি। তপঃক্ষয়ের ভয়ও রয়েছে বলে রাবণ এখনও জীবিত আছে। বিধাতা রাবণ বধের জন্যই তাকে এই দুর্মতির দ্বারা মোহিত করেছেন।

তপস্যার বলে তিনি যে রাবণকে ভস্মীভূত করতে পারতেন এ ভয় দেখাতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। এখানে দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সভামধ্যে লাঞ্ছিত হয়ে দ্রৌপদীও তাঁর তপস্যার তেজে সকলকে ভস্মীভূত করতে পারতেন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ আশঙ্কা করেই তাঁকে বর দিয়ে তুষ্ট করেছিলেন।

রাবণের প্ররোচনায় চেড়ীরা সীতাকে রাবণের বংশ, শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে। অন্যথা তার মৃত্যু অনিবার্য্য এ কথাও জানায়। উত্তরে সীতা বলেন :—

কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ। (সুন্দর) ২৪।৮

—তোমরা সকলে বরং আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু তোমরা যা বলছ তা করতে পারবো না।

এখানেও সীতার নির্ভীকতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবন অপেক্ষা সতীত্বকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দেন।

চেড়ীরা সীতার মাংস ভক্ষণের ভয় দেখালে ভীতা সীতা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন পূর্বজন্মে না জানি কত পাপ করেছিলাম যার জন্য এত দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আমি অনার্য্যা অসতী, তাই স্বামীর বিরহেও এই পাপ জীবন ধারণ করে আছি। মনুষ্য জন্মকে ধিক্, ইচ্ছা থাকলেও প্রাণত্যাগ করতে পারছি না।

জীবনের প্রতি সীতার এই যে বিতৃষ্ণা, তা যে কোন সতী নারীর উপযোগী। দ্রৌপদীর জীবনে কখনও এমন দুর্ভোগ ঘটেনি।

অশোককাননে চেড়ীপরিবৃতা রাজকন্যা রাজবধূ নিত্য নানা ভাবে লাঞ্ছিতা। সীতা মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। বার বার রামের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বার বার মায়াবলে ভূমিতে সংজ্ঞাহীন

রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়ে তাঁকে মানসিক যন্ত্রণায় ও ব্যথায় জর্জরিত করেছে রাক্ষসীরা। তিনি দুঃখে মুহ্যমান হয়ে বিলাপ করে বলেছিলেন—জ্যোতির্বিৎ ব্রাহ্মণগণ স্বামীর সঙ্গে আমার রাজ্যাভিষেক হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,—আজ সেই কথা কি মিথ্যা হলো? কখনও বা বিলাপ করে বলেছেন, জ্যোতির্বেত্তাগণ আমি পুত্রবতী হবো, পতিবতী বা এয়োতী থাকবো বলেছিলেন। রামের মৃত্যুতে জ্ঞানীগণের বচন মিথ্যা হলো!

অশোকবনে সীতা এইভাবে নিজের হতভাগ্যের কথা চিন্তা করে বারংবার নিজের মৃত্যু কামনা করলে বৃদ্ধা ত্রিজটা রাক্ষসী রাক্ষসীদের জানালো যে সে এক স্বপ্ন দেখেছে তাতে রামের জয় ও রাবণের পরাজয় হযেছে। সে রাক্ষসীদের সীতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে যে সীতাই তাদের ত্রাণ করবেন। সীতা এই স্বপ্নের কথা শ্রবণ করে হৃষ্ট চিত্তে বললেন :—

তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাদের রক্ষা করব। সীতা এই প্রতিশ্রুতি যথার্থই পালন করেছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর হনুমান যখন চেড়ীদের শাস্তি দেবার জন্য সীতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন সীতা তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।

সীতার এই বাধা দানের মধ্যে তাঁর মনেব কোমলতাই কেবল প্রকাশ পায়নি, তিনি যে সুদিনেও তাঁর দুর্দ্দিনের প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হননি তাই প্রমাণিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ দুর্দ্দিনে যাদের থেকে দুর্ব্যবহার পায়, সুদিনে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবাব চেষ্টা করে। কিন্তু সীতা লক্ষ্মী স্বরূপিণী। আচরণে তিনি সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে তার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁব ক্ষমাশীল মনের অভিব্যক্তি এখানে ফুটে উঠেছে।

চেড়ীদের গঞ্জনায় জর্জরিত হয়ে তাঁকে বিলাপ করতে হযেছে। সেই বিলাপে তাঁকে বলতে শোনা গেছে—আমার তপস্যা ও ব্রতাদি নিষ্ফল হয়েছে। আমি দুঃখের জীবন পরিত্যাগ করব।

সীতা যে তপস্যা ও ব্রতাদি পালন করতেন, তাঁর উক্তি হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রৌপদীও তপস্যাদি করতেন।

হনূমানকে দেখে সীতা প্রথমে ভীত হয়ে বলেছেন—

মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ (সুন্দর) ৩৪।১৪

—তুমি যদি মায়াবী রাবণ হয়ে মায়াময় বানরদেহ ধারণ পূর্বক আমাকে পুনরায় দুঃখ দিতে থাকো, তবে তোমার মঙ্গল হবে না।

কিন্তু হনূমান সীতার সন্দেহ নিরসন করবার জন্য রামের ইতিবৃত্ত ও সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিত্রতা প্রভৃতি কাহিনীর উল্লেখ করেন এবং রাম শীঘ্র রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করবেন জানালেন। সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনূমান রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সীতাকে প্রদান করেন।

গৃহীত্বা প্রেক্ষমণা স ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ॥ (সুন্দর) ৩৬।৪

—জানকী স্বামীর অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে তা দেখতে দেখতে যেন স্বামীকেই সাক্ষাৎ পেয়েছেন এমন মনে করে আনন্দিতা হলেন।

রামের ও লক্ষ্মণের বিষয় বিশদভাবে হনূমানকে জিজ্ঞাসা করে লক্ষ্মণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন বনে।
সিংহস্কন্ধে মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ॥
পিতৃবদ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ॥

... ...

রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে॥
মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।

... ...

যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্য্যমনুস্মরৎ।

স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম ॥ (সুন্দর) ৩৮।৫৭-৬১

—যিনি ভ্রাতৃপ্রেমের বশে রামের সঙ্গে বনে এসেছেন, তিনি সিংহস্কন্ধ মহাবাহু মনস্বী প্রিয়দর্শন, যিনি রামেব সঙ্গে পিতৃবৎ এবং আমার সঙ্গে মাতৃবৎ আচরণ করেন, যে বীর লক্ষ্মণ আমার অপহরণ জানতে পারেননি, যিনি রাজপুত্র রামের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যিনি আমার শ্বশুরের সদৃশ, যিনি আমার অপেক্ষাও রামের প্রিয়, যাঁকে দেখে রাম মৃত পিতাকেও চিন্তা করেন না, তুমি তাঁকে আমার হয়ে কুশল প্রশ্ন করবে।

লক্ষ্মণের প্রতি অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ ও রূঢ় ব্যবহারের পরিণতিই সীতার এই চরম দুঃখ। এই জন্য সীতার মনে হয়ত অনুশোচনা এসেছিল, যার জন্য লক্ষ্মণ সম্বন্ধে হনুমানের কাছে বলতে গিয়ে তিনি লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। লক্ষ্মণের এই প্রশস্তি যেন সীতার অনুতপ্ত হৃদয়ের অনুবেদন।

হনূমান সীতাকে তাঁর পৃষ্ঠে আরোহণ করতে বলেন, কেননা তিনি তখনই তাঁকে রামের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁর সব দুঃখের অবসান ঘটাবেন এ কথা ব্যক্ত করেন। অথবা হনূমানের নিকট সীতার সংবাদ পেয়ে রাম বানরসেনা দ্বারা পরিবৃত হয়ে সীতাকে লঙ্কাপুরী হতে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনূমান তাঁর দেহকে বিকটাকৃতি করলেন।

সীতা হনূমানের প্রজ্ঞা, শক্তি, গতি ইত্যাদির প্রভূত প্রশংসা করে বললেন, তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ দেখতে পেলে রাক্ষসরা তোমাকে আক্রমণ করবে। তোমাব সঙ্গে যুদ্ধরত রাক্ষসরা যদি আমাকে ধরে ফেলে, তবে তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, এবং আমাকে তারা হত্যা করবে। যদি রাক্ষসদের তুমি হত্যা কর, তবু স্বয়ং রাম আমাকে উদ্ধার করতে পারলেন না বলে তাঁর যশ হানি হবে। তাছাড়া স্বেচ্ছায় আমি রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের দেহ স্পর্শ করতে চাই না। তুমি বরং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানর সেনাকে

লঙ্কায় এনে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর।

হনূমান যখন সীতাকে তাঁর পৃষ্ঠোপরি নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তখন সীতা তাঁকে একথাও বলেছিলেন :—

যথাহং তস্য বীরস্য বলাদুপধিনা হৃতা।

রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ॥ (সুন্দর) ৬৮।১৩

—রাক্ষস রাবণ যেমন বীরের ভয়ে ছল প্রদর্শনে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে। তার ভয়ে আমাকে ছল পূর্বক নিয়ে যাওয়া রঘুবংশ তিলক রামের পক্ষে উচিত হবে না।

এখানেও সীতার ঔচিত্যজ্ঞান সাধারণ নারীদের উর্দ্ধে। তিনি লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করলেও তথাপি কোন ছল বা কপটতার আশ্রয় নিতে ইচ্ছুক নন। সীতার এই যুক্তি কেবল সুন্দরই নয়, বরং তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচায়কও। হনূমানকে অসন্তুষ্ট না করেও, তিনি সুযুক্তি প্রদর্শন করে আপন সিদ্ধান্ত তাঁকে জানালেন।

এ প্রসঙ্গে সীতা হনূমানকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের আচরণ :—

জয়ন্ত নামেতে কাক আকাশেতে ছিল।
সহসা সীতার গায়ে উড়িয়া পড়িল॥

— — —

দুই নখে আঁচড়ে সীতার দেহখানি॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।

— — —

ডাকেন জনকসুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন ভাই সীতাকে কে মারে॥

— — —

কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।

মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায় ॥
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ—বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই।
কহিলেন আমি যে জযন্ত কাক চাই ॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম বধিব জীবন।
রাখিবে যে জন কাক তাহারি মরণ ॥
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর ॥
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিযা করিল তাব এক চক্ষু কাণ ॥
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি। (অযো)

সামান্য কাকের উপর যিনি ব্রহ্মাস্ত্র আরোপ করেছিলেন, তিনি পত্নী হরণকারী রাক্ষসদের কেন দীর্ঘকাল ক্ষমা করছেন ?

এখানেও সীতাব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকে উত্তেজিত করবার জন্যই ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত-কাকের কথা তিনি উল্লেখ করলেন।

ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেযো রাঘবায়েতি সীতা হনূমতে দদৌ ॥ (সুন্দর) ৩৮।৬৬

—অতঃপব সীতা অতি মনোহর চূড়ামণি (শিরোরত্ন) বস্ত্রের অভ্যন্তর হতে বের করে 'এটা রামকে দেবে'—বলে হনুমানকে দিলেন।

সীতা বললেন—এই মণি দর্শন করলে বীব রাম আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে—এই তিনজনকে স্মবণ করবেন। যেহেতু বিবাহকালে রাজা দশরথের সামনে আমার জননী এই মণি আমাকে প্রদান কবেছিলেন।

রামকে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য সীতা

তাঁকে অনেক কিছু বলে পাঠালেন (হনূমানের মাধ্যমে)। হনূমানের বুদ্ধি প্রজ্ঞা শক্তি ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করে সীতা হনূমানকে একদিন কোন নির্জন স্থানে বিশ্রাম করে প্রত্যাগমন করতে উপদেশ দিলেন।

প্রবাসে আপনজন বা স্বদেশবাসীকে দেখলে যেমন মনের সব বিষাদ দূর হয়, মন প্রফুল্ল হয়, তেমনি সীতাও এই রাক্ষস পরিবৃত অশোককাননে স্বামীর বার্ত্তাবহ হনূমানকে পেয়ে যেন সাময়িক কালের জন্য সব শোক দুঃখ ভুলে গেলেন।

হনূমান অশোকবন ধ্বংস করলে রাক্ষসীরা সীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? কোথা হতে এসেছে এখানে? তোমার সঙ্গে কি কথা বলছিল? সীতা উত্তরে বললেন :—

যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্ বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ॥ (সুন্দর) ৪২।৯

—তোমরাই জান এ কে আর কি করতে এসেছে, সাপের পা সাপই চিনতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছি, এই বীর কে তা জানতে পারছি না, মনে হয় কোনও রাক্ষস এই প্রকার মায়ারূপ ধারণ করে এসেছে।

শাস্ত্রানুসারে জীবনসঙ্কট কালে মিথ্যা ভাষণ দোষণীয় নয়। সুতরাং সীতার এ স্থলে সত্য গোপন করা দোষণীয় নয়।

হনূমান লঙ্কার প্রভূত ক্ষতি করেন এবং তাঁকে বন্দী করতে গেলে বহু রাক্ষস তাঁর হাতে নিহত হয়। অবশেষে রাবণ দর্শনের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে রাজসভায় আনীত হন। রাজসভায় রাবণের সঙ্গে হনূমানের বচসা হয়। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়ে তাঁকে নগরের চত্বরে ও সর্বত্র ঘুরিয়ে বেড়াতে আদেশ দিলেন। হনূমান নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েও লঙ্কাপুরী দিবালোকে অবলোকন করবার জন্য চুপ করে রইলেন। রাক্ষসরা হনূমানের লাঙ্গুলে জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র জড়িয়ে তৈলাক্ত করে তাতে

অগ্নি সংযোগ করল। রাক্ষসরা হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে বাজাতে হনুমানকে নিয়ে লঙ্কাপুরী পরিভ্রমণ করতে লাগল।

রাক্ষসীরা সীতাকে এই সংবাদ দিলে শোকাভিভূতা সীতা হনুমানের কল্যাণার্থে অগ্নিদেবের উপাসনা করে প্রার্থনা করেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।

যদি বা ত্বেক পত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ॥ (সুন্দর) ৫৩।২৭

—যদি আমি পতিসেবা বা তপশ্চর্যা করে থাকি, যদি আমি পতিব্রতা হই তবে তোমার স্পর্শ হনুমানের অঙ্গে শীতল হোক।

অগ্নিদেব সীতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। হনুমানের অগ্নিদগ্ধ লাঙ্গুল তুষারসিক্তের ন্যায় তাঁর নিকট হিম বোধ হচ্ছিল।

এখানেও সীতার উদার ও কোমল মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। স্বল্প পরিচিত সামান্য একটি হনুমানের জন্য শোকার্ত্ত হয়ে তিনি অগ্নিদেবের নিকট যে ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তা সাধারণতঃ কেউ করে না। এখানেও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

সীতাকে কোন প্রকারে বশীভূত করতে না পেরে, এদিকে রামের সঙ্গে বানর সেনা দেখে রাবণ ভীত হয়ে কৌশলে সীতাকে বশীভূত করলে রাম ঘৃণা ও দুঃখে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবেন, এই আশায় রাবণ সীতাকে রামের ছিন্ন মায়া মুণ্ড দেখালেন।

আর্য্যেণ কিং নু কৈকেয্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্।

যন্মায়া চীরবসনং দত্ত্বা প্রব্রাজিতো বনম্॥ (যুদ্ধ) ৩২।৫

—কৈকেয়ী, এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। তুমি রামকে নিহত করালে এবং সুমহৎ রঘুকুলও নষ্ট করলে। হায়! আর্য্যপুত্র তোমার কি অনিষ্ট করেছিলেন যে তুমি চীরবসন পরিয়ে আমার সঙ্গে তাঁকে নির্বাসিত করেছিলে।

রামের উদ্দেশ্যে সীতা বললেন—বশিষ্ঠাদি দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তুমি অল্পায়ুর ন্যায় নিহত হওয়ায়, তাঁদের বাক্য মিথ্যা হলো। রাবণকে উদ্দেশ্য

করে সীতা বললেন—তুমি শীঘ্র আমাকে বধ কর। তুমি পতি-পত্নীর মিলনের এই পুণ্য কাজটি সম্পন্ন কর।

সীতার এই বিলাপে একটি পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয়ের অকৃত্রিম আকৃতি করুণভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভীষণপত্নী সরমা লঙ্কায় সীতার একমাত্র সাথী। তিনিই সীতার নিকট সত্য কথা প্রকাশ করে জানান রাবণ ভীত হয়ে রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়েছেন।

বীর রামকে বধ করা অসম্ভব। তোমার শোকের কাল উত্তীর্ণ হয়েছে, তোমার সুখের দিন আগত প্রায়, রাম বানর সৈন্যসহ লঙ্কায় এসেছেন।

লঙ্কাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের নাগবাণ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেছে। উভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লে, রাবণের নির্দেশে সীতার রক্ষী রাক্ষসী ত্রিজটার সঙ্গে পুষ্পক রথে সীতাকে রামলক্ষ্মণকে দেখাবার জন্য সমরক্ষেত্রে পাঠান হলো। মৃতপ্রায় দুই রাজপুত্রকে দেখে সীতা বিলাপ করে বলেন—জ্যোতিষসিদ্ধান্ত নিপুণ ব্রাহ্মণগণ স্বামীর সঙ্গে আমার রাজ্যাভিষেক হবে এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজ সেই কথা মিথ্যা হলো।

> ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
> নাত্মানং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্॥
> সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্।
> কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ সরাঘবম্॥ (লঙ্কা) ৪৮।২৪।২৯

—আমি রাম, বীর লক্ষ্মণ, বা নিজের বা আমার মাতার জন্য তেমন শোক করছি না, যেমন তপস্বিনী শ্বশ্রূমাতার জন্য করছি। তিনি প্রত্যহ এই চিন্তা করছেন—সেদিন কবে আসবে যখন বনবাসব্রত সমাপ্তে রামের সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখবেন।

অন্যত্র রামের মিথ্যে মৃত্যু সংবাদে সীতা বিলাপ করে বলছেন—

> একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি।

সা হি জন্ম চ বাল্যঞ্চ যৌবনঞ্চ মহাত্মনঃ ॥
ধর্মকার্য্যাণি রূপঞ্চ রুদতী সংস্মরিষ্যতি।
নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্ত্বা শ্রাদ্ধমচেতনা॥ (লঙ্কা) ৯২।৫৭-৫৮

—একপুত্রা কৌশল্যা যখন শুনবেন তাঁর পুত্র যুদ্ধে নিহত হযেছেন, তিনি রোদন করতে করতে মহাত্মা পুত্রের বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, ধর্মকর্ম এবং রূপ স্মরণ করবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে—'পুত্র নিহত হযেছেন' এই কথা শুনেই তিনি নিরাশ ও জ্ঞানহীন হয়ে তাঁব পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত করতে অগ্নি অথবা জলে প্রবেশ কববেন।

সীতাব এই শোকেব বা বিলাপের মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। তিনি প্রিয়জনের বিয়োগে তাঁব অপরিমেয দুঃখকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে এই কাবণে তাঁর শ্বশ্রূমাতার দুঃসহ শোকের বিষয চিন্তা কবে অত্যন্ত মুহ্যমান হযেছেন। কৌশল্যার জন্য তাঁব এই শোকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি যথার্থই স্নেহশীলা পুত্রবধূ ছিলেন। কৌশল্যাব প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসারই অভিব্যক্তি এই বিলাপ।

ইন্দ্রজিতের নাগবাণে রামলক্ষ্মণ মৃত মনে কবে সীতা যখন বিলাপ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গিনী ত্রিজটা রাক্ষসী সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল অনেক লক্ষণ হতে এটাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত আছেন।

সীতাকে পুনরায় অশোকবনে নিযে যাওযা হলো। পালা বদলের খবর এলো। লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিৎ নিহত হযেছেন।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করলে পুত্র শোকাতুব রাবণ প্রতিশোধ নেবার জন্য ভীষণ মূর্তি ধবে সীতার নিকট আসলে

আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিযা রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিবে ছেদন।
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ॥

অভাগীরে দেখা দাও অশোক বনে ॥
রামের মহিষী আমি কাটিবে রাবণে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতা দেবী করেন রোদন। (লঙ্কা)

বাল্মীকি রামায়ণে সীতা ক্ষেদোক্তি করে বলেছেন—আমি দুর্বুদ্ধি বশতঃ হনূমানের কথা শুনিনি। যদি আমি তাঁর পৃষ্ঠে আরোহণ করে পতির কাছে চলে যেতাম তবে এখন আমাকে আক্ষেপ করতে হতো না।

এই শোকে সীতা যেন ভীতসন্ত্রস্তা—এই মাটিরই সরলা মেয়ে। হনূমানের পৃষ্ঠে পলায়ন করা অন্যায় বলে তিনি যা' দীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বিপদের সম্মুখীন হয়ে সেই সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন বলে অনুতপ্ত। যদিও লক্ষ্মীরূপা সীতার পক্ষে এই ধরণের শোক বাঞ্ছনীয় নয়।

বনবাস জীবনে সীতা একবারই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। তিনি অবলা নারীর প্রতিমূর্ত্তি। এই কারণে জীবন ব্যাপী অকারণে লাঞ্ছিতা হয়েছেন বার বার। নীরব অশ্রুজলে তা সহ্য করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হবাব অপমানেও তিনি প্রতিবাদে মুখর হতে পারেননি। তিনি দুর্বলা অবলা কূলবধূ। রামায়ণের সীতা দশপ্রহরণধারিণী শক্তিরূপিণী নন, কোমলা কমলা কল্যাণদায়িনী।

দ্রৌপদী বনবাস জীবনে দুইবার পরপুরুষ দ্বারা অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। যদিও দুইবারই ভীমই দুষ্কৃতদের শেষ সাজা দিয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদী অন্যের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর শক্তিব দ্বারা যথাসম্ভব দুর্বৃত্তদের পর্যুদস্ত করতে কখনও ইতস্ততঃ করেননি।

অন্যদিকে স্বামীর শক্তি ও স্বামীর উপর তাঁর অগাধ আস্থা। তাঁর বিশ্বাস তিনি স্বামী সোহাগিনী। তাই তিনি বলেছেন :—

বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎ সৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।
ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ॥ (সুন্দর) ২১।২৩

—বজ্র ও তোমাকে বর্জন করতে পারে। যমও তোমাকে চিরকালের

জন্য বর্জন করতে পারে। কিন্তু ক্রুদ্ধ লোকনাথ রাঘব তোমার ন্যায় দুর্জনকে বর্জন করবেন না। অবশ্যই বধ করবেন।

অন্যত্র বলেন :—

নাপহর্তমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ।

বিধিস্তব বধার্থায বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ (সুন্দর) ২২।২১

—বুদ্ধিমান রামের ভার্য্যা আমাকে তুমি অপহরণ করতে পারতে না, তবে বিধাতা তোমার বধের জন্য এই বিধান করেছেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি আরও বলেছেন :—

শক্যা লোভযিতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।

অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভো ॥ (সুন্দর) ২১।১৫

—ঐশ্বর্য বা ধনের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না। সূর্য্যের প্রভা যেমন সূর্য্য হতে বিচ্ছিন্ন হয না, সেরূপ আমিও রাঘব হতে অভিন্ন।

রাম হ'তে রাবণের পরিত্রাণ নেই—এই ভয় দেখিয়ে সীতা রাবণকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবণ ধর্মের কাহিনী শুনবেন কেন?

সীতা দ্রৌপদী অপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখিনী। দুঃখের সাগরে ডুবে থাকলেও রামই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা,—যিনি এই দুঃখের সাগর মন্থন করে তাঁকে সুখের সাগরে টেনে নেবেন। এত লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেও তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হারাননি। মাতা ধরিত্রীব সহিষ্ণুতাই যেন বারংবার আমবা সীতার জীবনে দেখতে পেয়েছি।

নানা শোকে তাপে মানসিক যন্ত্রনায় সীতা যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, সে সময হনূমানের নিকট রাবণবধ ও রাম লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে হনূমানকে বলেছিলেন :—

ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন।

সদৃশং যৎ প্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্ ॥ (লঙ্কা) ১১৩।১৯

—তোমার মত প্রিয় সংবাদদাতাকে দিয়ে সুখী হতে পারি, এমন কোন উত্তম পদার্থ আমি পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি না। এইরূপ শুভ সংবাদের কাছে পৃথিবীর সব জিনিষই নগণ্য।

স্বামী দর্শনের জন্য তিনি অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন তা প্রকাশ হয়েছিল হনুমানের কাছে তার কথিত উক্তি হতে :—

সাব্রবীদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং ভক্তবৎসলম্॥ (লঙ্কা) ১১৩।৪৯

—ভক্তবৎসল আমার পতিকে সত্বর দেখতে ইচ্ছা করি।

দীর্ঘ বিরহের পর স্বামী সন্দর্শনে উদ্‌গ্রীব সীতা যখন রাম সকাশে আনীত হলেন, তখন রাম সীতাকে বললেন :—

আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস॥
... ...
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে॥
এই দেখ সুগ্রীব বানর—অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন॥
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাঁই॥
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সন্মুখে॥
থাকিতে রাক্ষস ঘরে না হৈত উদ্ধার।
ত্রিভুবন অপযশ গাইত আমার॥
ঘুচিল যে অপযশ তোমার উদ্ধারে। (লঙ্কা)

ঠিক সেই মুহূর্তে রামের মুখে এই প্রকার নির্মম কথা শুনবার জন্য

সীতা প্রস্তুত ছিলেন না। সর্বসমক্ষে অকারণে স্বামীর এইরূপ রূঢ় ভাষণ ও নির্দ্দয় ব্যবহার—কোন স্ত্রীই নীরবে সহ্য করতে পারে না।

সীতা এই অপমানে দগ্ধ হয়ে উত্তরে কেবলমাত্র বলেছিলেন :—

কিং মাম সদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।

রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥ (লঙ্কা) ১১৬।৫

—হে বীর, নীচ শ্রেণীর পুরুষ নীচ শ্রেণীর নারীকে যেরূপ রুক্ষ কথা বলে থাকে, তুমি আমাকে সেইরূপ কঠোর ও শ্রুতিকটু বাক্য শোনাচ্ছ কেন?

রাম সীতাকে বলেছিলেন রাবণ কুদৃষ্টিতে তোমাকে দেখেছে, ক্রোড়ে করেছে। অতএব আমি তোমাকে পুনর্বার গ্রহণ করে নিজের মহৎকুল কলঙ্কিত করতে পারি না।

উত্তরে সীতা বলেছেন :—

যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।

কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥ (লঙ্কা) ১১৬।৮

—প্রভু, আমি আত্মবশে না থাকায় রাবণের সঙ্গে আমার যে গাত্র সংস্পর্শ ঘটেছিল, তা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, দৈবই সে ব্যাপারে অপরাধী।

সীতা নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে আবেগ ভরে আরও বলেন :—

মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥

— — — —

অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।

মম শক্তিশ্চ শীলঞ্চ চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্‌ ॥

(লঙ্কা) ১১৬।৯-১০।১৫-১৬

—যা আমার অধীন সেই হৃদয় তোমারই রয়েছে। তা কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু আমার যে দেহ পরাধীন, সে দেহ সম্বন্ধে অসমর্থ আমি কি করতে পারি? দীর্ঘকাল সংসর্গে ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও যদি আমার মান-রক্ষাকারী তুমি আমাকে না বুঝে থাকো, তবে আমার পক্ষে মৃত্যুই সত্য। আমার জানকী নামের অর্থ এ নয় যে জনক রাজা হতে আমার জন্ম, বা জনক রাজা আমার জন্মদাতা। বসুধাতল হতে আমার উৎপত্তি। তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না। যে প্রতিজ্ঞা করে বাল্যকালে তুমি আমাব পাণিগ্রহণ করেছিলে, তাও রক্ষা করলে না, আমাব ভক্তি চরিত্র সবই পশ্চাতে ফেলে দিলে।

সীতা স্বামীর অভিযোগে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন :—

সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ॥

... ...

ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ॥
গণিকার মত মোরে পরে কর দান।
সভা বিদ্যমানে কর এত অপমান ॥ (লঙ্কা)

সীতা নিষ্কলুষ, প্রকৃতির নিষ্পাপ সন্তান। পাপ জানেন না বা পাপ তাঁকে স্পর্শ কবে না। স্বামীর মনে এ প্রতীতি জন্মাবার উদ্দেশ্যে সীতাব আকুল চেষ্টা উপরি উদ্ধৃত যুক্তিগুলি তার প্রমাণ। দৃপ্ত কণ্ঠে এমন অকাট্য যুক্তি একমাত্র সাধ্বী সীতার পক্ষেই সম্ভব।

সেক্সপীযারের পোরসিয়া তার স্বামীর বন্ধু অ্যানটোনিওকে ইহুদী সাইলকের কোপানল হতে রক্ষা করবার জন্য এমন সুন্দর যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দুঃখে অপমানে জর্জরিত হয়ে সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবেন স্থির করে লক্ষ্মণকে বললেন—এই মিথ্যাপবাদ নিয়ে আমি আব জীবনধারণ করতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে চিতাই এই মহাবিপদের একমাত্র ওষুধ। অতএব তুমি চিতা প্রস্তুত কর। রামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—

হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন॥
বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগর বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জন। (লঙ্কা)

সভামধ্যে স্ত্রীকে গণিকার মত যার তার কাছে বিকিয়ে দেবার অপমান ও দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হতো না।

এইরূপ সঙ্কট মুহূর্তে দ্রৌপদী কখনও এত সহজে যুধিষ্ঠিরকে অব্যাহতি দিতেন না।

অগ্নি পরীক্ষায় সীতা উত্তীর্ণ হলেন, দশরথ ও দেবতারা সীতা অপাপ রামকে জানালেন। সীতার এই অগ্নি পরীক্ষা, বামের নিষ্ঠুব নির্দ্দয়তা, পাঠকের মনে রাম চবিত্র সীতা চরিত্রেব পাশে নিষ্প্রভ হয়েছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের এই ত্রুটিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্য ও রামের সম্বন্ধে পাঠকের বিরূপ মনোভাব যেন না জন্মে এজন্যে কবি রাক্ষসীদের অভিসম্পাতের ফলে রাম সীতাকে সুদৃষ্টিতে দেখেননি—এই কথা বলে রামেব এই অন্যায়কে পবোক্ষে সমর্থনের প্রয়াস পেয়েছেন :—

মন্দোদবী বলে শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥

...   .

আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে ॥

এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।

বিষ দৃষ্টি তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥ (লঙ্কা)

ক্ষমা সীতা চরিত্রের এক বৈশিষ্ঠ্য। এ জন্যে তিনি অনন্যা। সীতার মন কোমল, দয়া ও সহানুভূতিতে তা' পরিপূর্ণ। হনুমান যখন সীতাকে লঙ্কা জয়েব খবর দিয়ে চেড়ীদের হত্যা করে সীতার প্রতি তাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, সীতা তখন তাঁকে বাধা দিযে বলেছিলেন :—

রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্বতীনাং পরাজ্ঞয়া ॥

বিধেয়ানাঞ্চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ বানরোত্তম্।

ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ ॥

ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্বং স্বকৃতং হ্যপভুজ্যতে।

মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ ॥ (লঙ্কা) ১১৩।৩৮-৪০

—হে বানর শ্রেষ্ঠ, দাসীগণ প্রভুর বশীভূত। প্রভু যা আদেশ করেন, তারা তা পালন কবে। এই রাক্ষসীগণ রাজার আদেশেই তাদের কর্ত্তব্য করেছে মাত্র। অতএব প্রভুবচন পালনকারিণী এদের উপর কে ক্রোধ করবে? আমি পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি ও দোষেই এরূপ দুঃখ পেলাম। হে মহাবাহু, দৈবের গতি বিচিত্র, তুমি এইরূপ কথা বলো না।

এই ভাবে সীতা হনুমানকে নারীবধ হতে কেবল নিবৃত্তই করেননি, তাঁকে তাঁর বুদ্ধি ও কৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মহাবীর হনূ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।

স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥ (লঙ্কা)

সীতা চরিত্রে কোথাও প্রতিহিংসা স্পৃহা দেখা যায় না। বরং ক্ষমাই তাঁর চরিত্রকে মহৎ হতে মহত্তর করেছে। দ্রৌপদী চরিত্রে প্রতিহিংসা স্পৃহা অত্যধিক।

লঙ্কা জয়ের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসালেন। সীতা রামের সঙ্গে রথে চড়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময় সাগরকে সেতুবন্ধ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে রামকে বললেনঃ—

সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন।
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন॥
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার॥ (লঙ্কা)

সীতার অপরিসীম মমতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে সাগর ও প্রাণীদের জন্য। কোমল হৃদয়া সীতার দূরদর্শিতার পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। এই সেতু বন্ধন যে ভবিষ্যতে মানুষ, বানর প্রভৃতির জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে এ আশঙ্কা করে তিনি সাগরের সেতুবন্ধন মুক্ত করিয়েছিলেন।

নিজের মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে বা আত্মসুখে মগ্ন হয়ে তিনি অন্য সব কিছুকে ভুলে থাকেননি। তাই সেতু বন্ধনের মত সামান্য ঘটনার পরিণাম সম্বন্ধেও তিনি সজাগ ও সম্পূর্ণ অবহিত।

শুধু তাই নয়। স্বামীর সঙ্গে রথে চড়ে আকাশ মার্গে তিনি যখন অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন কিষ্কিন্ধ্যা নগরী তাঁর দৃষ্টি পথে পড়লে, তিনি স্বামী রামকে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা সুগ্রীবের প্রিয়া পত্নী তারা এবং অন্যান্য বানর প্রধানদের পত্নীদের অযোধ্যায় নিয়ে যাই। তাঁর ইচ্ছানুসারে কিষ্কিন্ধ্যার তারা ও বানর পত্নীরা সীতার সঙ্গে অযোধ্যায় গেলেন। এই সামান্য ঘটনা হতেও সীতার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞভাব পরিচয় পাওয়া যায়। যাদের সহায়তায় তাঁর মুক্তি সম্ভব হয়েছিল, তাঁর সুখের দিনে সীতা তাদের কথা ভুলেননি। তাই অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে তাদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

চৌদ্দ বৎসর জটা বল্কল পরিধান করে তপস্বিনী বেশে সীতাকে

বনে মহাক্লেশে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। লঙ্কায় অশোককাননে চেড়ীপরিবৃতা হয়ে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে কিছুকাল সীতা রাম ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে আনন্দের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। দেবপূজা ও শ্বশ্রূমাতাদের সেবা করে ও স্বামীর সঙ্গে ভোগবিলাসের মধ্যে সীতা দিনাতিপাত করতেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হলে প্রজারঞ্জনের জন্য রাম গর্ভবতী নিষ্কলুষ সীতাকে তাঁর অজ্ঞাতে পুনঃ বনবাসে পাঠালেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রামের নির্দেশে গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করে গেলে, তখন সীতা আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ—

মামিকেয়ং অনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ। (উত্তর) ৪৮।৩

—লক্ষ্মণ, বিধাতা দুঃখের নিমিত্তই আমার দেহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন ঃ

কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিল জিজ্ঞাসা ॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈল অপমান ॥
... ...
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে ॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥
... ...
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥
রাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহার ॥ (উত্তর)

এত অপমান লাঞ্ছনার পরও সীতা জন্ম জন্ম রামকেই পতিরূপে প্রার্থনা করেছেন। এখানে তাঁর পতিপ্রেমের অভিব্যক্তি অতুলনীয়।

পুনঃপুনঃ রামের এই নিষ্ঠুর আচরণে সীতা কিছুমাত্র উগ্র স্বভাব বা ঊষ্মা প্রকাশ করেননি। লাঞ্ছিতা সীতার হৃদয় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে সতীত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু রামের প্রতি কোন রকম কর্কশ ভাষণ বা বিরূপ ভাব পোষণ করেননি। পরন্তু সীতা লক্ষ্মণ মারফৎ রামকে বলে পাঠিয়েছিলেন :—

অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুনা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিত ॥
ময়া চ পবিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমাগতিঃ।

(উত্তর) ৪৮। ১৩—১৪

—হে বীর, আপনি লোকাপবাদ ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। অতএব যাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয়, এমন কাজ আমারও করা উচিত নয়। কারণ আপনি আমার পরম আশ্রয়।

গর্ভবতী অবস্থায় বনে নির্বাসিতা হযেও স্বামীর মঙ্গলের জন্য এই শাস্তি মেনে নেওয়ার মধ্যেও সীতার অসাধারণ মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিনা কারণে গর্ভবতী সীতার নির্বাসন বোধ করি কৃত্তিবাস কবিও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। তুচ্ছ একটা ঘটনা অবলম্বনে রামের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়ে সীতার নির্বাসন আজ্ঞা সমর্থন করে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥ (উত্তর)

সীতা বলেন সাগরের জলেতে তার ছায়া মাত্র তিনি দেখেছেন। পুরনারীগণ পুনঃপুনঃ তাঁকে রাবণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন :—

রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ।

বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই আলস সীতা ভূমিতে শয়ন ॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী ॥

মাটিতে খড়ির আঁচড় কাটাই সীতার জীবনে অভিশাপ রূপে দেখা দিল।

সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন ॥
...   .
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতা ত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ ॥
...   .
রূপ গুণ দেখি তারে না দিলাম সতিনী ॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিল হাতে হাতে ॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস ॥ (উত্তর)

তখনই রাম সীতাকে পরিত্যাগ করবেন স্থির করে তিন ভ্রাতাকে ডেকে পাঠালেন। ভ্রাতারা রামের সিদ্ধান্ত সমর্থন না করলেও, রাম তাঁর সঙ্কল্পে অটল। তিনি বললেন :—

সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর ॥
অপযশ কত সব নারীর কারণ।

অকীৰ্ত্তি হইলে বৰ্জ্জি তোমা তিনজন॥ (উত্তর)

কিন্তু যথার্থই সীতা অকীর্ত্তির কিছু করেছিলেন কি? তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি যুক্তিসঙ্গত? দেবতারা ও রাজা দশরথ যখন সীতার নিষ্কলুষ চরিত্র সম্বন্ধে রামকে অবহিত করে তাঁকে অগ্নি হতে অক্ষত দেহে উদ্ধার করে রামের হাতে অর্পণ করেন, তারপরও রামের সীতা সম্বন্ধে এ ধরণের সন্দেহ কি যুক্তিসঙ্গত?

ভবভূতির উত্তররামচরিতে রাম লোপামুদ্রাব আমন্ত্রণে অগস্ত্য-মুনির আশ্রমে যাবার পথে, পথিমধ্যে পঞ্চবটীবন দেখবার জন্য সেইখানে রথ থামাতে বললেন।

সীতা তখন পঞ্চবটী বনে ছিলেন। রামের কণ্ঠস্বরে সীতা ভযে আহ্লাদে উঠে বসলেন। সীতাকে রামের কণ্ঠস্বর শুনে বিচলিত হতে দেখে তমসা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন—একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনে মেঘের ডাকে মযূরীর মত চম্‌কে উঠলে!

উত্তরে সীতা বললেন, তিনি আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বব চিন্‌তে কখনই ভুল করেননি। তখন তমসা আব গোপন না করে বললেন—শোনা যাচ্ছে যে রাম কোন শূদ্র তাপসকে দণ্ড দেবার জন্য জনস্থানে এসেছেন।

এই কথা শুনে সীতা বললেন:—

—"দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীণরাঅধর্ম্মো কৃখু সো রাআ।"

—সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্মপালনে ত্রুটি হচ্ছে না।

সীতার এই উক্তিব মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিমান ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ রামের নিকট পতির কর্ত্তব্য অপেক্ষা রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ—তাই নির্দ্দোষ স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পুত্র লবকুশের নিকট পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিল। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। তাঁর অশ্ব বাল্মীকি আশ্রমে প্রবেশ করলে লবকুশ তা আটক করলেন। এই নিয়ে রাম ও তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দুই কিশোরের জয়লাভ ঘটে।

লবকুশ মৃত রামের আভরণ নিয়ে সগর্বে জননী সীতাকে দেখালে তিনি শিরে করাঘাত করে বলেন, তারা পিতা পিতৃব্যদের হত্যা করে এসেছে। এই দুঃখে শোকে ও লজ্জায় সীতা বিষ পান করে আত্মহত্যা করবেন স্থির করলেন। সীতা আক্ষেপ করে বলেছেন :—

হায় হায় কি করিলি ওরে লবকুশ।
পিতৃ হত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥ (উত্তর)

অন্যত্র হনূমান ও জাম্বুমানকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পা বেঁধে রেখেছে দেখে সীতা বলেন :—

তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি ধর্ম্ম॥
তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে হনূমান।
এই হনূমান মোর দিলা প্রাণদান॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনূমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক। (উত্তর)

সীতার বিলাপ, পুত্রদের প্রতি ভর্ৎসনা ও আত্মগ্লানির মধ্য দিয়ে সীতা চরিত্রেব নিরুপম সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে। (উত্তর)

একদিকে স্বামীর পরাজয় ও স্বামীর বিয়োগ ব্যথা অন্যদিকে পুত্রদ্বয়ের জয় ও বীরত্ব। এই হাসি কান্নার সংমিশ্রণে আমরা সীতার এক পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখতে পাই এই দৃশ্যে। সীতার মনের এই অভিব্যক্তি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন মহাকবি কৃত্তিবাস :—

ছাওয়ালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা॥

অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥ (উত্তর)

সর্বশেষে বাল্মীকি মুনির আশ্রম হতে সীতাকে আনিয়ে প্রজা রঞ্জনের জন্য সভাস্থলে রাম পুনরায় সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলায় সীতা আক্ষেপ করে বলেছিলেন :—

পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব বিদ্যমান।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া সে আশ্বাস।
... ...
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী ॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
... ...
কুলবধূ যত নারি সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
... ...
সর্ব্বগুণধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত ॥
... ...
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতালে ॥
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি ॥ (উত্তর)

সীতা পতিব্রতা। এক অনুপম চরিত্র ফুটে উঠেছে শেষ দুই

চরণে। জন্মে জন্মে তুমিই আমার পতি হবে—তবে এমন দুর্গতি আর কর না। কত না করুণ প্রার্থনা।

অপমানিতা লাঞ্ছিতা রাজকন্যা, রাজরাণী ভবিষ্যৎ রাজমাতা সীতা বার বার সর্বসমক্ষে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার এই গ্লানি হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে যুক্ত করে মাতা ধরিত্রীর কাছে এইরূপ দুঃখ লাঞ্ছনা হতে মুক্তি প্রার্থনা করে বলেন ঃ—

মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হইলে তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
... ...
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগো ঠাঁই। (উত্তর)

বসুন্ধরা আপন ক্রোড়ে টেনে নিয়ে চিরকালের জন্য সব গ্লানি হতে সীতাকে মুক্তি দিলেন।

রামের দ্বারা তিনবার সর্বসমক্ষে অপদস্থ ও লাঞ্ছিতা হয়েও সীতা তাঁর শেষ প্রার্থনা জানাচ্ছেন জন্মে জন্মে যেন রামকেই পতিরূপে পান, তবে পরজন্মে যেন তাঁর অদৃষ্টে আর এত দুর্ভোগ না ঘটে।

এই ধরণের আবেগ দ্রৌপদীর চরিত্রে একান্ত অভাব, বরং দ্রৌপদী যেখানে অন্যায় দেখেছেন লঘু গুরু ভেদ না করে তীব্র সমালোচনার চাবুক চালিয়েছেন। শ্বশুর, স্বামী, ভগবান—সকলের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শ্লেষোক্তিতে তিনি মুখর। দ্রৌপদীর দীপ্ত কঠোর সমালোচনা বা ধিক্কার পাঠকের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। সেই সব স্থান বার বার পাঠ করলেও ক্লান্তি আসে না।

সীতা লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শে ম্রিয়মাণ। সীতা অদৃষ্টবাদিনী। দ্রৌপদী পুরুষকারের পূজারিণী। সীতা ভুলক্রমেও স্বামীকে তাঁর অন্যায়ের জন্য একবারও কটূক্তি করেন নি বা তাঁর কার্য্যকলাপের

সমালোচনা করেননি। তিনি বরং নিজে অকারণে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে মানসিক কষ্ট পেলেও, রাম যেন যশ নিয়ে প্রজারঞ্জন করেন ইহাই সর্বদা কামনা করেছেন।

সীতা চরিত্র দেবদুর্লভ মাধুর্য্যরসে পূর্ণ। তিনি নিয়তির অন্ধ ভক্ত। সীতা কবি বাল্মীকিব মানসকন্যা। সর্বগুণের আধার, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু সীতা চরিত্রে কোন কলঙ্ক নেই।

পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে বাল্যসখা দ্রোণকে অপমানিত করেন। আচার্য দ্রোণ সেই অপমানের প্রতি-শোধ নিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রদের দ্বারা পাঞ্চাল-রাজকে পরাজিত করিয়ে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ করেছিলেন।

অপমানিত যজ্ঞসেন সেই অপমানেব প্রতিশোধ নেবার জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্থিত হন্। তারপর সেই যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী দ্রৌপদী আবির্ভূত হন। দ্রৌপদীর আবির্ভাব কালে আকাশবাণী হয় :—

সর্ব্বযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষয়ম্।
সুরকার্য্যমিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যাঃ হেতোঃ কৌববাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্॥

(আদি) ১৬৬।৪৮-৪৯

—সব নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই সুন্দরী কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস কববার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। এই সুমধ্যমা যথাকালে দেবতাদের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করবেন। তাঁর জন্য কৌরবদের সমূহ ভয় উপস্থিত হবে।

তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন বলে তাঁব নাম কৃষ্ণা রাখা হয়েছিল। যজ্ঞসেনেব কন্যা বলে তাঁর অপর নাম যাজ্ঞসেনী, দ্রুপদ রাজার কন্যা বলে তাঁর অপর নাম দ্রৌপদী। পাঞ্চালরাজ কন্যা বলে তাঁব অপর নাম পাঞ্চালী।

দ্রুপদ রাজার ইচ্ছা ছিল তিনি অর্জুনের সঙ্গে কন্যা দ্রৌপদীব

বিবাহ দেবেন। এইজন্য তিনি এমন একটি ধনু নির্মাণ করালেন যাতে বাণ যোজনা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া শূন্যে একটা ছিদ্রদ্বার যন্ত্র স্থাপিত করে তার উপরে লক্ষ্য বস্তু রাখলেন। দ্রুপদ রাজা কন্যার আহূত স্বয়ংবর সভায় ঘোষণা করলেন যে সেই ধনুতে বাণ যোজনা করে ছিদ্র পথে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করবে—সে-ই কৃষ্ণাকে লাভ করবে।

দুর্যোধন, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, শল্য প্রভৃতি বহু নৃপতি ঐ স্বয়ংবর সভায় যোগদান করেন এবং ধনুতে তীর যোজনায় ব্যর্থ হলেন। কর্ণ ধনুতে বাণ যোজনা করতে উদ্যত হ'লে দ্রৌপদী সূতকে বরণ করবেন না বলে উঠেন। সব ক্ষত্রিয়রা ব্যর্থ হলে, অবশেষে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন ব্রাহ্মণদের মধ্য হতে উঠে ধনুর নিকটে উপস্থিত হলেন। তিনি ধনু প্রদক্ষিণ করে মহাদেবকে প্রণাম করে, কৃষ্ণকে স্মরণ করে ধনু গ্রহণ করে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিদ্র পথে লক্ষ্যটি বাণবিদ্ধ করে ভূপাতিত করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আনন্দে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। ক্ষত্রিয় নৃপতিরা লজ্জিত হয়ে অধোবদনে রইলেন।

দ্রৌপদী নিঃশঙ্কচিত্তে সভায় উপস্থিত নৃপতি ও ব্রাহ্মণদের সম্মুখে অর্জুনের গলায় বরমাল্য অর্পণ করলেন।

নৃপতি দ্রুপদ একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করায় অন্য অন্য নৃপতিরা অপমানিত বোধ করে একত্রে দ্রুপদ রাজাকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন ও ভীম দ্রুপদের সাহায্যার্থে দ্রুপদের পক্ষে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে নৃপতিদের পরাজিত করলেন। ক্ষত্রিয়রা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন।

বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় ভীমার্জুন গৃহে প্রত্যাগত হয়ে বাইরে থেকে মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—মা, ভিক্ষা এনেছি। রুদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর হতে কিছু না দেখে মা কুন্তী বললেন,—"সকলে মিলে ভোগ কর।"

জননী কুন্তীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। এদিকে দ্রুপদ রাজা যখন ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হলেন, পঞ্চ ভ্রাতাই দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করবেন শুনে দ্রুপদ সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হলেন। ব্যাসদেব দ্রুপদ রাজাকে গোপনে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানালেন। যুধিষ্ঠিরও দ্রুপদ রাজাকে মুনিকন্যা বার্ক্ষীর একই সঙ্গে দশজন পতিকে বরণ এবং গৌতমী জটিলার সাতজন ঋষিকে পতিরূপে গ্রহণ করার পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে এই বিবাহে সম্মত করালেন।

পুরোহিত ধৌম্য পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। দ্বারকা হতে কৃষ্ণও বহুবিধ মহার্ঘ উপহার পাণ্ডবদের জন্য পাঠালেন। দ্রুপদ রাজার প্রাসাদে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব বধূ দ্রৌপদী সহ বাস করতে থাকেন।

ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডবই যে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রুরমতি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঞ্চাল দেশে প্রেরণ করে সমাতৃক পাণ্ডবদের হস্তিনায় আনালেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশেই পাণ্ডবরা অর্ধরাজ্য লাভ করে ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানী নির্মাণ করিয়ে পরম সুখে বাস করতে থাকেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ রাজসভায় এসে যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন যে দ্রৌপদীকে নিয়ে যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে বিবাদ না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। পাণ্ডবরা নারদের সামনেই নিয়ম করলেন যে—

দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানন্যোন্যং যোঽভিদর্শযেৎ।
স নো দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ॥ (আদি) ২১১।২৯

—দ্রৌপদীর সঙ্গে যখন যিনি বাস করবেন, তিনি ব্যতীত অপর কোন ভ্রাতা তখন দ্রৌপদীকে শয়ন গৃহে দর্শন করলে বার বৎসর ব্রহ্মচারী হয়ে বনে বাস করবেন।

এক রাত্রে এক চোর এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে তাঁর গোধন চুরি করে নিয়ে যায়। বিপন্ন ব্রাহ্মণের চীৎকারে অর্জুন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল, সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন চোরদেব শাস্তি দিয়ে গরু উদ্ধার করে ব্রাহ্মণকে দিলেন বটে, কিন্তু নিয়ম ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে গেলেন।

বাব বৎসব পব অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসলেন। অর্জুন দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, দ্রৌপদী বলেছেন,—কৌন্তেয, তুমি সুভদ্রাব কাছেই যাও। পুনর্বার বিবাহ করলে, পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। দ্রৌপদী আরও বহুপ্রকার বিলাপ করতে থাকলে অর্জুন নানাবিধ স্তোক বাক্যে তাঁকে শান্ত করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

দ্রৌপদী যে অভিমানিনী ছিলেন, এই উক্তি হতে প্রকাশ পায়। দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনকেই অধিক ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁর প্রেমাস্পদ যদি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হন, তবে তাঁর দুঃখ বা অভিমান স্বাভাবিক।

সুভদ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন,—আমি আপনার দাসী। দ্রৌপদী তখন তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেন:—

নিঃসপত্নোঽস্তু তে পতিঃ। (আদি) ২২০।২৪

—তোমার পতি শত্রুহীন হোন।

স্বামীর প্রতি অভিমান প্রকাশ করলেও, সপত্নীকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। বড় বধূ রূপেই যেন তিনি তাঁর সপত্নীর প্রতি কর্তব্য করেছেন।

কিছুকাল পর দ্রৌপদীর পঞ্চ পাণ্ডব হতে পাঁচটি পুত্র জন্মায়। তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

রাজসূয় যজ্ঞে হিড়িম্বা সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর সঙ্গে একাসনে বসলে দ্রৌপদী কেবল ঈর্য্যাই প্রকাশ করেনি, হিড়িম্বা যখন তাঁকে বললেন :—

তোমার জনকে পূর্বে জানে সর্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা॥
যেই জন করিলেন এত অপমান।
কোন লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব॥
... ...
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম॥
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার॥ (সভা)

হিড়িম্বার সঙ্গে এইভাবে দ্রৌপদীর বচসা চলতে থাকে। অবশেষে দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে অভিসম্পাত করে বলেন :—

কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ॥ (সভা)

দ্রৌপদীর মত রাজকন্যা ও রাজবধূর সামান্য একটি রাক্ষসীর সঙ্গে এইভাবে মেয়েলী কোন্দল শোভনীয় বা সঙ্গত নয়। শুধু তাই নয়। সতীনে সতীনে বিবাদ। তার মধ্যে সতীনের পুত্রের মৃত্যুর অভিসম্পাত কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। দ্রৌপদীর প্রতিহিংসাপরায়ণতার এই আর একটি দৃষ্টান্ত।

পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করতে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য শক্তি ও বিভিন্ন দেশের নৃপতিদের উপর আধিপত্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পাণ্ডবদের কি ভাবে রাজ্যচ্যুত করা যায় সেই মন্ত্রণা করেন। অবশেষে দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদির নিষেধ অমান্য করে

যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন।

যুধিষ্ঠির শকুনির চক্রান্তে দ্যূতক্রীড়ায় সব ঐশ্বর্য, রাজত্ব ভ্রাতাদের এমন কি নিজেকেও পণ রাখেন। অবশেষে দ্রৌপদীকেও পণ রেখে যুধিষ্ঠির পরাজিত হলেন। দুর্যোধনের নির্দ্দেশে প্রতিকামী তাঁকে নিতে আসলে, দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন ঃ—

কিং নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবা নু মাম্॥ (সভা) ৬৭।৭

—রাজা কি প্রথমে নিজেকে পণ রেখে হেরে, আমাকে হেরেছেন, অথবা পূর্বে আমাকে পণ রেখে নিজেকে হারিয়েছেন।

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির কিভাবে পরাজিত হযেছেন তা জেনে, তবে দ্রৌপদী দাসত্ব স্বীকার করবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এখানে দ্রৌপদীর বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।

দুঃশাসন বলপূর্বক কেশাগ্র ধরে দ্রৌপদীকে সভাস্থলে টেনে আনলে দ্রৌপদী ক্ষোভে দুঃশাসনকে শাসিয়ে বলেন, আমাকে বিবস্ত্রা করো না। দেবগণের সঙ্গে ইন্দ্রও যদি তোমার সহায় হন তবুও পাণ্ডবগণের হাতে তোমার নিস্তার নেই। অতঃপর দুঃখে রাজসভায় উপস্থিত সব সভ্যবৃন্দকে ধিক্কার দিয়ে বলেন :—

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং
ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং
প্রেক্ষন্তি সর্বে কুরবঃ সভায়াম্॥ (সভা) ৬৭।৪০

—সভ্যবৃন্দকে ধিক্, ভরতকুলের ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম ও ক্ষাত্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়। কারণ, কৌরবগণের ধর্ম্মবেলা বা সীমা অতীত হচ্ছে দেখেও, সভায় সমাসীন কৌরবরা তা কেবল দর্শন করছেন।

দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্ত্বং
ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মানাঽপি। (সভা) ৬৭।৪১

—ভীষ্ম ও দ্রোণের কোন অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হচ্ছে না। মহাত্মা বিদুরেরও অনুরূপ অবস্থা।

এখানে লজ্জায় ও দুঃখে দহ্যমানা দ্রৌপদী দর্প ও তেজের সঙ্গে ভীষ্মাদি গুরুজনদের সভামধ্যে কেবল ধিক্কারই দেননি, তিরস্কারের সুরে বলেছেন তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁদের সামনে কুলবধূ রাজরাণী লাঞ্ছিতা। তাঁরা ক্লীবের মত নীরব দ্রষ্টা।

প্রকাশ্য রাজসভায় তিনি মহাবীরদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার সমালোচনা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁদের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী বলেছেন—দুহিতৃস্থানীয়া পুত্রবধূর উপর এই প্রকার অত্যাচার চলেছে। আর কৌরব প্রধানগণ তা সহ্য করছেন। বোধ হয় এটাই কুরুবংশ ধ্বংসের সূচনা।

দ্রৌপদীর মত তেজস্বিনী নারীর পক্ষেই সর্বসমক্ষে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের এইরূপ কঠোর মন্তব্য সম্ভব।

রামায়ণে কোন পরিস্থিতিতেই সীতার মুখে এ প্রকার অপ্রিয় কঠোর সত্য শোনা যায়নি। বারংবার তিনি নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য আপন ভাগ্যকেই দায়ী করেছেন।

দ্রৌপদীর দম্ভ ও বীরত্ব হঠাৎ স্তিমিত হলো, যখন কর্ণ সভাস্থলে দ্রৌপদীকে বেশ্যা (যেহেতু তাঁর পঞ্চ স্বামী) বলে পরিহাস করে ও দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র ধরে টানে। এই পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী অন্য এক সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মান্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্ ॥ (সভা) ৬৮।৪৩

—হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বভাবন, হে গোবিন্দ কুরুগণের হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে আমি তোমার শরণাগত। আমাকে রক্ষা কর।

এইখানে দ্রৌপদীর দর্প আর রইল না। ভয়ে তিনি বিহ্বলা। তাই তিনি সর্বান্তঃকরণে ভক্তবৎসল মধুসূদনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পঞ্চপাণ্ডব যখন সভাস্থলে স্ত্রীকে নিগৃহীত হতে দেখেও ক্লীবের মত অধোবদনে রইলেন বসে, তখন দ্রৌপদী সর্বান্তঃকরণে

তাঁর লজ্জা নিবারণের জন্য কৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে ডাকলেন।

ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল কৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। দুঃশাসন যতই দ্রৌপদীর বস্ত্র টানতে থাকেন ততই নতুন নতুন বস্ত্র রাশি দ্রৌপদীর দেহকে আবৃত করতে থাকে। কৃষ্ণের কৃপায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করা সম্ভব হলো না। দুঃশাসনেব দুর্ধর্ষ শক্তিকে ও দ্রৌপদীর অচলা ভগবৎ ভক্তির কাছে পরাভব মানতে হলো। এই ভক্তিই তাঁর রক্ষাকবচ এবং তিনি দেবাশ্রিতা। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভায় তুমুল কোলাহল শোনা গেল, সভাস্থ বাজারা দ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী চবিত্রে সংঘাত, উত্থান পতন সীতাচরিত্র হতে অধিকতব। দ্রৌপদী ধর্মপরায়ণা, নির্ভীক, কিন্তু দাম্ভিকও বটে। এই তিনগুণের অপূর্ব সংমিশ্রণে দ্রৌপদী চবিত্র। একদিকে গোবিন্দ গত প্রাণ, অন্য দিকে আত্মশক্তিতে গর্বিতা, সত্যিই বীর রমণী। এ-হেন অপূর্ব গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলে দ্রৌপদী দ্যূতসভায় দুঃশাসনকর্তৃক কেশাকর্ষণ, দুর্যোধনের উরু প্রদর্শন, কর্ণের ব্যঙ্গোক্তি ও শকুনির পরিহাস সহ্য করেছিলেন।

দ্বিতীয়বারও পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে দুঃশাসন উৎফুল্ল হযে দ্রৌপদীকে বলেছিলেন—যাজ্ঞসেনী, ধনহীন অরণ্যগামী পতিদেব ত্যাগ কবে এই সভায় উপস্থিত কৌরবদের মধ্যে কাউকে পতিরূপে বরণ করে নাও।

দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'দাসী' বলে কেশাকর্ষণ কবে সভাকক্ষে আনয়ন কবলে দ্রৌপদী আক্ষেপ করে বলেছিলেন :—

পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ংবর কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে ॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে।
আজি পুন সেই সভা দেখিল নযনে ॥

চন্দ্র সূর্য বায়ু আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে॥ (সভা)

দ্রৌপদীর এই বিলাপ বড়ই মর্মস্পর্শী। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশের রাজরাণীর অদৃষ্টে বোধ হয় দ্রৌপদীব মত লাঞ্ছনা ঘটেনি। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রিয়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরকে ভাই ও স্ত্রীসহ বনগমন করতে হয়।

বনগমনের পূর্বে শোকাতুরা কুন্তী দ্রৌপদীকে বলেন—বৎসে, তুমি সর্বগুণান্বিতা। আমার কোন উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কৌরবগণ ভাগ্যবলে তোমার কোপে দগ্ধ হয়নি। তুমি নির্বিঘ্নে যাত্রা কর। আমি সর্বদা তোমার মঙ্গল চিন্তা করব। আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসাদক্লিষ্ট না হয়।

দ্রৌপদী তপস্যার বলে কৌবরদের দগ্ধীভূত করতে পারতেন—কুন্তীর উক্তি হতে তাহাই প্রকাশ পেয়েছে।

বনগমন কালে দ্রৌপদী ক্রন্দনরতা মুক্তকেশী। তিনি ক্ষুব্ধ মনে কেশের দ্বারা মুখ আবৃত করে স্বামীদেব অনুগামিনী হযেছেন। কিন্তু স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও সীতা প্রফুল্ল চিত্তে স্বামীর অনুগমন করেছিলেন। স্বামীর প্রতি এই অন্যায় নির্বাসনের প্রতিবাদে দশবথ বা কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। দশরথের নিকট রামের জন্য কোন প্রকার অনুগ্রহও তিনি যাচ্ঞা করেননি। বার বার তিনি ভবিতব্যই মেনে নিয়েছেন। বিনা ক্ষোভে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর সহচারিণী হয়েছেন। স্বামী আপাততঃ রাজ্যচ্যুত হচ্ছেন দেখেও সীতার মনে কোন দুঃখ ছিল না। তার প্রমাণ তাঁর বনপথে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁর আচরণ অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা বটবৃক্ষের বন্দনা ইত্যাদি।

রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী আলুলায়িত কেশে বনপথে যাত্রা করলে পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পরিণতি যে কি রকম ভয়াবহ হবে, তা শোনাতে লাগলে, ধৃতরাষ্ট্র বলেন :—

তস্যাঃ কৃপণচক্ষুর্ভ্যাং প্রদহ্যেতাপি মেদিনী।
অপি শেষং ভবেদদ্য পুত্রাণাং মম সঞ্জয়॥ সভা ৮১।১৮

—দ্রৌপদীর করুণ নেত্রদ্বয় পৃথিবীকেও দগ্ধ করতে পারে। হে সঞ্জয়, আমার পুত্রদের নিঃশেষ হবার সূত্রপাত হলো আজ।

প্রজাগণ, ব্রাহ্মণরা—সকলেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা আলোচনা করছে। সকলেই এই জন্য রুষ্ট।

এখানেও দ্রৌপদীর তপস্যার ফল সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে ভীত হতে দেখা যাচ্ছে। সভামধ্যে সর্ব সমক্ষে দ্রৌপদীকে যেভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে, সীতাকে তা হতে হয়নি। এই কারণে বনগমনকালে উভয়ের যাত্রার রীতির মধ্যেও প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়।

রাম স্বেচ্ছায় পিতৃসত্য পালনে বনগমনে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি যদি অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন, তবে কৈকেয়ীর পক্ষে কখনই তাঁকে জোর করে বিনা অপরাধে বনে প্রেরণ করা সম্ভব হতো না। রাম পিতৃসত্য রক্ষা করে ধর্মাচরণ করতে গিয়েছিলেন। সীতাও স্বেচ্ছায় সহধর্মিণীর উপযুক্ত কর্মই করেছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে দ্রৌপদীব ন্যায় ক্ষোভের কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

যুধিষ্ঠির তাঁদের পুরোহিত ধৌম্যকে বলেন, আমার সঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তাঁদের পালন করতে অক্ষম। পরিত্যাগ কবতেও পারছি না। এ ক্ষেত্রে কি করণীয় তা জানান। ধৌম্যের নির্দেশে যুধিষ্ঠির সূর্য্যের অষ্টোত্তরশত নাম জপ করে পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করেন। এবং কঠোর তপস্যা করেন। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হয়ে বলেন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বনবাসের দ্বাদশ বৎসর আমি তোমাকে অন্ন দেব। তিনি একটি তাম্রময় স্থালী যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বলেন, দ্রৌপদী রন্ধনশালায় গিয়ে এই পাত্রে রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন, ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় থাকবে। চতুর্দশ বৎসব পরে তুমি আবার রাজ্যলাভ করবে।

সেইজন্য দ্রৌপদীর অল্প খাদ্য প্রয়োজনে বৃদ্ধি পেতো। সকলকে

খাদ্য পরিবেশন করে, দ্রৌপদী সকলের শেষে আহার করতেন। তাঁর আহারের পর অন্ন নিঃশেষ হয়ে যেতো। সূর্য্যের কৃপায় এইভাবে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত খাদ্য দান করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী একদিন দুঃখ করে কৃষ্ণকে বলেছিলেন :—

কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী ॥ (বন) ১২।৬১

—আমি পার্থদের ভার্য্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং তোমার সখী। হে বিভো, আমার ন্যায় নারী কেন সভাস্থলে লাঞ্ছিতা হবে ?

তিনি কৃষ্ণের নিকট তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করে দুঃখ করে বলেন :—

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন ॥
যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।
ন চ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎ প্রাহসাৎ তদা ॥
চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব ॥

(বন) ১২।১২৫-১২৭

—মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্রও নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, এমনকি তুমিও নেই। ক্ষুদ্ররা আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, তোমরা শোকহীনের ন্যায় তা উপেক্ষা করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করেছিল সেই দুঃখও আমার দূর হচ্ছে না। কেশব আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে, আমার উৎপত্তির গৌরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু—এই চার কারণে আমাকে নিত্য তোমার রক্ষা করা উচিত।

এখানেও দেখা যাচ্ছে দ্রৌপদী স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণকেও তাঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচকিত করতে দ্বিধা বোধ করেননি, তাঁর দীপ্ত বাক্যবাণ সবার প্রতি প্রয়োগ করে থাকেন।

দ্রৌপদীর মধ্যে স্বামীদের বিরুদ্ধে উষ্মা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে।

ধিক্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডিবম্।

যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দ্দন ॥ (বন) ১২।৬৭

—কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ দেখা করতে আসলে, দ্রৌপদী তাঁকে বলেছেন,—হে জনার্দ্দন, ভীমের বাহুবল ও অর্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্। কেন না নরাধমগণ দ্বারা আমাকে অপমানিত হতে দেখেও তাঁরা তা সহ্য করছেন।

বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মালোচনা করবার সময়ও ঈশ্বরের প্রতি বক্রোক্তি করে দ্রৌপদী বলেছেন—

কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥

... ...

যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ শুনিযাছি ব্যাসমুখে ॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণ।
এই ত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে ॥

... ...

ধিক্ বিধাতারে যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্যোধন কবিল আজন্ম ॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমার করিল বিধি এমন সংযোগ ॥ (বন)

দ্রৌপদীব এই খেদ যেন বর্ত্তমান যুগের মানবজাতির খেদের প্রতিধ্বনি, যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী বলছেন, তোমাকে এইরূপ বিপদে পড়তে এবং দুর্যোধনকে সমৃদ্ধ সম্পন্ন হতে দেখে :—

ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোহনুপশ্যন্তি ॥ (বন) ৩০।৪০

—আমি ঈশ্বরের নিন্দা করছি। কারণ তিনি বিষম পক্ষপাতসম্পন্ন।

তিনি কেবল তাঁর নিজপতিদেব বা ভগবানের প্রতি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি, যেখানে অন্যায়, অবিচাব দেখেছেন, সেখানেই দ্রৌপদী সমালোচনায় শানিত তরোয়ালের ন্যায় ঝলসে উঠেছেন।

দ্রৌপদীর মনে মনে অহঙ্কার ছিল যে যেহেতু তিনি স্বামীদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরেছেন, স্বামীর দুঃখক্লেশের ভাগী হয়েছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামী সেবা করেছেন, অতএব তাঁর মত সতী পতিব্রতা ত্রিভুবনে নেই।

কৃত্তিবাসী রামাযণে দর্পহারী কৃষ্ণ দ্রৌপদীর মনের কথা জানতে পেরে অকালে আম্রফল গাছে ফলিয়ে তার মাধ্যমে দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণ করেছিলেন। সীতা চরিত্রে এ ধবণের দর্পভাব কোথাও দেখা যায় না। এবং এমন পরীক্ষার কোন অবকাশও ছিল না।

দ্রৌপদীর আব্দারে অর্জুন ঐ অকালের আম পেড়েছিলেন। তা দেখে কৃষ্ণ জানালেন সন্দীপন মুনি সারাদিন তপস্যা করে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরে রোজ একটি করে আম পেড়ে খান। আজ সেই আম না পেলে ক্রোধে মুনি সবাইকে ভস্ম করে ফেলবেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামী নারায়ণ জানালেন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যে কথা সব সময় চিন্তা করেন যদি তা অকপটে প্রকাশ করেন, তবে সেই আম গাছে যেমন ঝুলছিল, তেমনি আবার ঝুলবে।

এই নির্দেশ মত পঞ্চপাণ্ডব তাদের মনের কথা প্রকাশ করায় আম ক্রমেই গাছের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু দ্রৌপদীর মনোভাব প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আম আবার নীচে নেবে আসে।

কৃষ্ণ বলে……কৃষ্ণা কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥ (বন)

যুধিষ্ঠিরও সত্য কথা বলতে দ্রৌপদীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দ্রৌপদী নারব। তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন শীগ্গির সত্য কথা

বল, নতুবা তীর শরে তোমার মাথা কেটে ফেলব।

লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী ॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্য তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন॥
এই জন হত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন॥
এমন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত। (বন)

প্রাতঃস্মরণীয়া দুই কন্যার চরিত্র কি রকম বিসদৃশ, সীতা মনে প্রাণে স্বামী অনুরাগিনী। তাঁর হৃদয় রামে সমর্পিত, দ্রৌপদীর এইরূপ অহঙ্কার করবার অধিকার নেই। তাঁর মনের এক অন্ধকার গহ্বরে কর্ণের জন্য আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিল।

কিন্তু দ্রৌপদীর সম্বন্ধে এই ঘটনাটি কৃত্তিবাস কবির কল্পনা প্রসূত। বাল্মীকি রামায়ণে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ নেই, বস্তুতঃ দ্রৌপদীর মনে এই ধরণের কোন অভিলাষ থাকা সম্ভব নয়। কারণ যে কর্ণ রাজসভা মধ্যে দ্রৌপদীকে নানাভাবে উপহাস করেছেন, যে কর্ণের ইঙ্গিতে দ্রৌপদীকে দুঃশাসন সভামধ্যে বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করেছে—তাঁর প্রতি অন্ততঃ দ্রৌপদীর মত প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর মনে কোন রকম দুর্বলতা থাকার সম্ভাবনা সম্ভব নয়। অন্য-পক্ষে একদিন দ্রৌপদীর মুখ থেকেই বেরিয়েছিল—

'নাহং বরয়ামি সুতম্।'

সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েই বিদুষী রমণী, রামায়ণে ও মহাভারতে বিভিন্ন স্থানে এই নারীদ্বয়ের জ্ঞানের স্বাক্ষর আছে।

বনবাসকালে রাম নির্বিচারে পশুবধ করায় সীতা শাস্ত্রের উল্লেখ

করে তাঁকে নিবৃত্ত করবেন। রামকে তাঁর কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে সীতার প্রভৃত জ্ঞানদান সীতার মধ্যে অপরিমিত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয়।

রাবণ কর্তৃক অপহৃত হবার সময় সীতা রাবণের উদ্দেশ্যে বলেছেন :—শস্য পক্কতার জন্য যেমন অপেক্ষা করে, কর্মফল নিষ্পত্তি বিষয়েও কাল পূর্ণ হবার সময় প্রয়োজন।

এই উক্তি হ'তেও সীতার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, বিপদকালেও যার ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি গুণে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে অসামান্যা।

মহাভারতেও নানাস্থানে দ্রৌপদীর জ্ঞানের পরিচয় বিদ্যমান। কুমারী বয়সে পিতৃগৃহে পণ্ডিতদের মধ্যে যে শাস্ত্রালোচনা হতো, দ্রৌপদী সেই তত্ত্বকথা শ্রবণে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন।

বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আলোচনা কালে দ্রৌপদীর প্রখর দার্শনিক জ্ঞান ও বিদ্যার নমুনা পাওয়া যায়।

সংসারেতে যত দেখ কর্ম্ম ভোগ করে।
কর্ম্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে॥

... ...

কর্ম্ম না করিলে কোথা হতে হয় লভ্য॥
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি।

... ...

পশু পক্ষী আদি যত কৃত কর্ম ভুঞ্জে॥
সবে কর্ম অনুগত দেখ মহারাজ।

... ...

যে জন যেমতে শুভাশুভ কর্ম করে।
জন্ম জন্ম দেন ফল বিধাতা তাহারে॥ (বন)

রাজধর্ম ও প্রশাসন বিষয়েও দ্রৌপদী অবহিত ছিলেন। শত্রুর দোষ দর্শন—উপযুক্ত সময়ে আঘাত করা, সামদানাদি নীতির প্রয়োগের সময় বিষয়েও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন।

পাণ্ডবগণ তাঁদেব অজ্ঞাতবাস কালে বিরাটরাজ্যে ছদ্মবেশে আছেন, দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী সেজেছেন। তাঁব রূপে মুগ্ধ বিবাট শ্যালক কীচক তাঁকে প্রেম নিবেদন করলে দ্রৌপদী তা প্রত্যাখ্যান করেন। কীচক শুধু রাজার শ্যালক নন, তিনি বিবাটের সেনাপতিও ছিলেন। প্রত্যাখ্যানের অপমানে তিনি সৈরিন্ধ্রীকে পদাঘাত কবেন। দ্রৌপদীর গুপ্ত গৌরব মর্যাদা জেগে উঠল। তিনি বিরাটরাজ সভায় এই অভিযোগ নিয়ে বিচার প্রার্থী হলেন। বিরাটরাজকে রাজধর্ম পালনে অবহেলা করলে দ্রৌপদী যজ্ঞাগ্নির মত প্রদীপ্ত হয়ে বিরাটরাজকে শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন—

যাঁদের বৈরী বহু দূরদেশে বাস করেও নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মাননীয়া স্ত্রী। সূতপুত্র কীচক আমাকে রাজসভায় পদাঘাত করেছে। যাঁরা আশ্রিত শরণাপন্নকে রক্ষা করেন, সেই মহারথীরা আজ কোথায়? বিরাট রাজা যদি কীচককে ক্ষমা করে ধর্ম নষ্ট করেন এক্ষেত্রে আমি কি কবতে পারি? রাজা আপনি কীচকের প্রতি রাজতুল্য আচরণ করছেন না। আপনার ধর্ম দস্যুর ধর্ম, কীচক ধার্মিক নয়, বিরাট রাজাও ধার্মিক নন, যে সভাসদ্গণ তাঁর অনুবর্ত্তী তারাও ধার্মিক নন। এইভাবে দ্রৌপদী বিবাট রাজাকে রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা বলেন, তার দ্বারা বাজধর্ম বিষয়ে দ্রৌপদীর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বনপর্বে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী আলোচনা সময়ে দ্রৌপদীর সংগত যুক্তি প্রশংসার্হ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি সুন্দর উপমার মাধ্যমে তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

সম্প্রযোজ্য বিযোজ্যায়ং কামকারকবঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব॥
ন মাতৃপিতৃবদ্ বাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ততে।
রোষাদিব প্রবৃত্তোহয়ং যথায়মিতরো জনঃ॥
তবেমামাপদং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে।

ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোঽনুপশ্যতি ॥
কর্ম চেৎ কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং নান্যমৃচ্ছতি।
কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ ॥
অথ কর্মকৃতং পাপং ন চেৎ কর্তারমৃচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনান শোচামি দুর্বলান ॥

(বনপর্ব) ৩০।৩৭, ৩৮, ৪০, ৪২ ৪৩

—বালক যেমন খেলনা নিয়ে খেলে, সেই রকম ভগবান নিজ ইচ্ছানুসাবে কখনও সংযুক্ত কখনও বিযুক্ত করে প্রাণিগণকে নিযে খেলা করেন। মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা পিতার মত দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতর জনেব ন্যায ব্যবহার করেন। তোমার এইরূপ বিপদ ও দুর্যোধনকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করছি। যিনি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন, যদি কৃতকর্মের ফল কর্ত্তাব প্রাপ্য, অন্যের ভোগ্য না হয়, তবে মনুষ্যকৃত পাপকর্মে ঈশ্বরও লিপ্ত। আর কৃতকর্মের পাপ যদি কর্ত্তা ঈশ্বরকে স্পর্শ না করে, তবে তার কারণ—তিনি বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার দুঃখ হচ্ছে।

অন্যত্র দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—যে লোক কেবল দৈবের উপর নির্ভরশীল এবং যে হঠবাদী (অর্থাৎ যে মনে করে সব কিছু হঠাৎ ঘটবে) তারা উভয়েই শঠ। মানুষ দেবোপাসনা দ্বারা ভাগ্যানুসারে যা' প্রাপ্ত হয, তাকেই নিশ্চিতরূপে দৈব বলে। লোকে নিজকর্ম দ্বারা যা অর্জন করে তাকেই পুরুষকার বলে। আর যা স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়ে পাওয়া যায় তাকে স্বভাবাত্মক ফল জানবে।

সাংসারিক জীবনেও দ্রৌপদী অতুলনীয়া। দ্রৌপদী—সত্যভামা আলোচনার মধ্যে দ্রৌপদী যে সুগৃহিণী ছিলেন, গৃহপালিত পশু ও পরিচারকমণ্ডলের তত্ত্বাবধান কবতেন, স্বামীদের পরিচর্য্যা, পাণ্ডবদের সমস্ত আয় ব্যয়ের পরিপূর্ণ হিসাব তিনিই রাখতেন এ সব তথ্য প্রকাশ পায়। এসব থেকে দ্রৌপদীর গার্হস্থ্য ধর্মের,

গণিতশাস্ত্রেরও প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্ব্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ।

একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণ্ডবানাং যশস্বিনি॥ (বন) ২৩৩।৫৩

—হে যশস্বিনি, কল্যাণি, পাণ্ডবদের এবং মহারাজার আয় ব্যয় সমস্ত হিসাব আমি একাই জানি।

কুটুম্বদের পরিচর্যার দায়িত্বও দ্রৌপদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। মহাভারতে দ্রৌপদীকে :—

প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা।

—কেবল প্রিয়দর্শিনী নয়, পণ্ডিত ও পতিব্রতা বলে—উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বৈতবনে একদিন পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদী নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা করেন। সেই সময় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেন :—

দ্রুপদস্য কুলে জাতাং স্নুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম॥

মাং বৈ বনগতা দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব॥ (বন) ২৭।৩৪-৩৫

—দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, বীরপত্নী আমাকে বনবাসী দেখেও তুমি শত্রুদের ক্ষমা করছ কেন?

তিনি আরও বলেন—ক্রোধ বলে কোন বস্তু তোমাতে নেই। নতুবা ভ্রাতাদের সকলকে ও আমাকে বনবাস দুঃখ ভোগ করতে দেখেও তোমার মন ব্যথিত হচ্ছে না? ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় নেই। একমাত্র তুমিই তার ব্যতিক্রম। অপমান মরণ হতেও গর্হিত। দ্রৌপদী প্রাচীন গ্রন্থ হতে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন—ক্ষমাশীলকে কেউই গ্রাহ্য করে না। তাঁকে অক্ষম বলে তুচ্ছ করে। সর্বদা অপরাধীকে ক্ষমা করা উচিত না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কোন প্রকারেই ক্ষমার্হ নয়। তাদের উপর তেজ প্রকাশ করাই উচিত।

দ্রৌপদীকে শান্ত করবার চেষ্টা করে যুধিষ্ঠির ক্ষমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করলে, দ্রৌপদী শ্লেষের সঙ্গে বলেন—

নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহং চক্রতুস্তব।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে বোঢ়ব্যে তেঽন্যথা মতিঃ॥ (বন) ৩০।১

—সেই ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমাতে এমন মোহ উৎপাদন করেছেন। পিতৃ পিতামহের বৃত্তি অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তোমার বুদ্ধি অন্যরূপ।

যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করবার জন্য তিনি বলেছেন, তোমাকে এভাবে বিপদে পতিত এবং দুর্যোধনকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হতে দেখে আমি ঈশ্বরের নিন্দা করছি। কারণ তিনিও সমদৃষ্টি সম্পন্ন নন।

দ্রৌপদী নিজের সুখ, ঐশ্বর্য ও শান্তির বিঘ্ন ঘটার দরুন ভগবানকেও নিন্দা করতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু সীতার মধ্যে এইরূপ আচরণ সমগ্র রামায়ণে কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি আপন ভাগ্যকে তাঁর সব দুঃখের কারণ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

একদিন ধর্মাত্মা দুর্বাসা মুনিকে অযুতশিষ্যসহ সমাগত দেখে, দুর্যোধন দুঃশাসন ও কর্ণের কুপরামর্শে পরম কোপন স্বভাব দুর্বাসা মুনিকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। মুনি দুর্বাসা সম্মত হয়ে নানাভাবে দুর্যোধনকে বিব্রত করবার চেষ্টা করলে, দুর্যোধন অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে মুনির সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। তখন দুর্বাসা মুনি দুর্য্যোধনকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। উত্তরে রাজা দুর্যোধন বলেন, আপনি যেমন সশিষ্য আমার অতিথি হয়েছেন, তেমনি আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনবাসী যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। এবং সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের অতিথি হবেন, যখন তাঁদের সকলের ভোজন শেষ হয়ে গেছে। এমনকি তাঁদের ভার্যা দ্রৌপদীও ভোজন সমাপান্তে বিশ্রাম করছেন। মুনি বললেন—তথাস্তু।

অতঃপর একদিন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর ভোজন সমাধা হয়েছে জানতে পেরে দুর্বাসামুনি অযুতশিষ্যসহ যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আসতে বলেন। সন্দিগ্ধচিত্তে

মুনি সশিষ্য স্নানার্থে জলে নিমজ্জিত হলেন।

এদিকে দ্রৌপদী প্রমাদ গুণলেন। এই অবেলায় অযুতশিষ্যসহ দুর্বাসা মুনিকে তিনি কি করে ভোজন করাবেন? উপায়ান্তব না দেখে দ্রৌপদী মনে মনে কংসনিধনকারী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে কাতরভাবে তাঁব শরণাপন্ন হয়ে, তাঁকে বিপন্মুক্ত করবার জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে কৃষ্ণ কাম্যক বনে দ্রৌপদীর নিকটে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণা তাঁর সঙ্কটের বিষয় শ্রীকৃষ্ণেব নিকট নিবেদন করলে, ভক্তবৎসল সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বলেন, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে শীঘ্র খেতে দাও। খাদ্য না থাকায় দ্রৌপদী তাঁর অক্ষমতা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে সেই স্থালী আনতে বলেন। সেই স্থালীর গলদেশে শাকান্নের কণা মাত্র পড়ে থাকতে দেখে তিনি তা খেয়ে তুষ্ট হয়ে বলেন, এই অন্নের দ্বাবা বিশ্বাত্মা হরি প্রীত হোন এবং যজ্ঞেশ্বর তুষ্ট হোন। ঐদিকে কৃষ্ণের তুষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসামুনি প্রভৃতি সকলের উদর আকণ্ঠ অন্নরসে পরিপূর্ণ হয়ে উদ্গার উঠতে থাকে।

এইভাবে ভক্তিমতী দ্রৌপদীই দুর্বাসার ক্রোধ ও অভিশাপ হতে পাণ্ডবদেব রক্ষা করেন।

বনপর্বে পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে মনের সুখে বিচরণ করেন। একদিন তাঁরা দ্রৌপদীকে আশ্রমে একাকী রেখে মৃগয়ায় বের হলেন। সেই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বিবাহের জন্য শাল্বদেশে যাবার পথে কাম্যকবনে উপস্থিত হন। তিনি তখন পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদীকে আশ্রমদ্বারে দণ্ডায়মানা দেখতে পান। সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখে জয়দ্রথের মনে কুমতলব উদয় হলো। তিনি তাঁর সহচব কোটিকাস্য রাজাকে বলেন, এই পরমাসুন্দরী রমণীকে নিয়েই আমি গৃহে ফিরবো। আমার অন্য বিয়েব কোন প্রয়োজন নেই।

তখন জয়দ্রথ কোটিকাস্য রাজাকে দূতরূপে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করেন। রাজা কোটিকাস্য—

উপেত্য প্রপচ্ছ তদা ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব ॥ (বন) ২৬৪।১৭
—ব্যাঘ্রবধূর (দ্রৌপদীর) নিকট শৃগালের ন্যায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—তুমি কে? আমি তোমার পিতার বা পতির পরিচয় জিজ্ঞেস করছি। রাজা কোটিকাস্য আত্মপরিচয় ও তাঁর দলের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তাঁরা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহচর।

দ্রৌপদী আত্মপরিচয় দিয়ে, পিতৃপরিচয় ও তাঁর পঞ্চস্বামী পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় দেন। তিনি আরও জানান যে তাঁর পতিরা পৃথক পৃথকভাবে মৃগয়ার জন্য বাইরে গেছেন ও শীঘ্র ফিরবেন। অতিথিবৎসল যুধিষ্ঠির আত্মীয় আপনাদের অতিথিরূপে পেলে খুবই আনন্দিত হবেন। এই কথা বলে তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করেন।

ঐদিকে কোটিকাস্যরাজার মুখে সব সংবাদ অবগত হয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছায় জয়দ্রথ ছয় ভ্রাতা সহ আশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি কৃষ্ণা ও তাঁর পতিগণের কুশল জিজ্ঞেস করেন। দ্রৌপদী তাঁদের কুশল সংবাদ দিয়ে জয়দ্রথের ও অন্যান্য আত্মীয়দের কুশল জিজ্ঞেস করেন। তারপর জয়দ্রথকে পাদ্য ও আসন দিয়ে তা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। স্বামীদের অবর্তমানে দ্রৌপদী আত্মীয় জয়দ্রথদের ধর্মসঙ্গত আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত করেন। সীতা যেমন ছদ্মবেশী রাবণের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছিলেন।

দুর্জন জয়দ্রথও রাবণের ন্যায় বলেন—তুমি আমার রথে এসো, এবং সুখ ভোগ কর। অরণ্যবাসী পাণ্ডবদের সেবা কেন করবে? বুদ্ধিমতী নারী ঐশ্বর্যহীন পতিগৃহ ত্যাগ করে।

জয়দ্রথ তাঁর দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করলে, দ্রৌপদী ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত গর্জন করে তাঁর তেজস্বিতা প্রকাশ করেন। এইখানে তাঁর বীরাঙ্গনার ছবি ফুটে উঠেছে। দ্রৌপদী জয়দ্রথের প্রস্তাবে ধিক্কার দিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বলেন এই কথা বলা তাঁর অনুচিত। পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নি দুঃশলার স্বামী ধার্মিক

রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ধর্ম জানে না—এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তারপর কৃষ্ণা তাঁর পঞ্চ স্বামীর বীরত্বের কথা শুনিয়ে জয়দ্রথকে শাসিয়ে বলেন ক্রুদ্ধ ভীমসেনের পদাঘাতে তুমি পলায়নের পথ পাবে না। জিষ্ণুর সঙ্গে তোমার যুদ্ধের আস্ফালন অর্থ প্রসুপ্ত সিংহের গায়ে আঘাত করা, যমজ পাণ্ডবদ্বয়েব সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা সাপের লেজে পা দেওয়া। এইভাবে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে তাঁব দুষ্ট অভিপ্রায় হতে নিবৃত্ত কবতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জয়দ্রথ উত্তরে বলেন দ্রৌপদীর কথার বিভীষিকার দ্বারা তিনি ভীত নন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে হয় স্বেচ্ছায় তাঁর রথে আরোহণ অথবা পাণ্ডবগণের পবাজয়ের পর তাঁর কৃপা ভিক্ষা এই দুই পথ দ্রৌপদীর সামনে আছে।

তখন দ্রৌপদী বলেন আমি বলশালিনী হলেও দুর্বলা। সীতার ন্যায় তিনিও দীপ্ত কণ্ঠে জয়দ্রথকে শাসিয়ে বলেছিলেন—

যস্যা হি কৃষ্ণৌ পদবীং চরেতাং
সমাস্থিতাবেকরথে সমেতৌ।
ইন্দ্রোঽপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চি
মনুষ্যমাত্র কৃপণঃ কুতোঽন্যঃ॥ (বন) ২৬৮।১৪

—আমাকে হরণ করলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একই রথে চড়ে খুঁজতে থাকবেন। আমাকে ইন্দ্রও হবণ কবতে সমর্থ নয়। তোমার ন্যায় হীন মনুষ্য তো দূরের কথা।

অতঃপর জয়দ্রথ দ্রৌপদীর উত্তরীয় বস্ত্রেব আঁচল ধরলে দ্রৌপদী এমন ধাক্কা দিলেন যে

স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ। (বন) ২৬৮।২৪

—সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পতিত হলো।

জয়দ্রথ পুনরায় দ্রৌপদীকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে থাকলে দ্রৌপদী পুরোহিত ধৌম্যমুনিকে প্রণাম করে জয়দ্রথের রথে আরোহণ করতে বাধ্য হলেন। ধৌম্যমুনি দ্রৌপদীর পশ্চাদ্ধাবন

করতে লাগলেন।

মৃগয়া শেষে পঞ্চপাণ্ডব এক জায়গায় মিলিত হলেন এবং ধর্মরাজ চারিদিকে অশুভ লক্ষণাদি দেখতে পেয়ে বলেন যে তাঁর অন্তরাত্মা শোকাবিষ্ট ও রোদন করছে। তিনি সকলকে আশ্রমের দিকে যাবার জন্য আদেশ করলেন। আশ্রমে পৌঁছিলে পাণ্ডবদের পরিচারিকা দ্রৌপদীর জন্য রোদন করে এবং তার মুখে পাণ্ডবরা সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। দ্রৌপদীর অপহরণ বার্তা শ্রবণ করেই পঞ্চপাণ্ডব বিশাল ধনু হতে জ্যা-ধ্বনি করতে করতে জয়দ্রথেব পিছনে ধাবিত হলেন এবং এক প্রচণ্ড সংগ্রামের পর দ্রৌপদীকে উদ্ধার কবেন।

যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিব গান্ধারী ও ভগ্নী দুঃশলার কথা চিন্তা করে দুরাত্মা জয়দ্রথকে বধ কবা উচিত নয়, ভীমের নিকট এই মত প্রকাশ করলে, ক্রোধপরায়ণা, প্রতিহিংসাপরায়ণা দ্রৌপদী উত্তেজিতা হয়ে বলেছিলেন :—

ঐ নরাধমকে নিশ্চয়ই প্রাণে বধ করবে। কারণ ঐ পাপী দুর্মতি। জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের কলঙ্ক ও কুলাঙ্গার।

ভার্য্যাভিহর্ত্তা বৈবী যো যশ্চ রাজ্যহরো রিপুঃ।

যাচমানোঽপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥ (বন) ২৭১।৪৬

—যে ভার্যা ও রাজ্য হরণ করে, এমন যে শত্রু, সে যুদ্ধে প্রাণ যাচ্ঞা করলেও তাকে মুক্তি দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়।

পরিশেষে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য কবে দ্রৌপদী ভীমকে বলেন—সে (জয়দ্রথ) যখন রাজাব দাসত্ব স্বীকাব করেছে এবং তার মাথায় পাঁচ শিখা রেখেছে তখন তাকে ছেড়ে দাও।

অরণ্যে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। এবার এক বৎসব অজ্ঞাত বাসের পালা। স্থির হলো এই এক বৎসর পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীসহ বিরাটরাজের পুরীতে অজ্ঞাতবাস করবেন। কে কি কর্ম করবেন এবং কি নাম গ্রহণ করবেন তার পরামর্শ হচ্ছিল। যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদী সম্বন্ধে বললেন :—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা॥ (বিঃ) ৩।১৪

—জননীর ন্যায় পালনীয়া এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত পূজনীয়া আমাদের প্রাণ অপেক্ষা গরিয়সী এই প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদী কি কর্ম গ্রহণ করবেন?

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি হতে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে কত সম্মান করতেন তার এক স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরেব কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন, তিনি সৈরন্ধ্রীর (পরিচারিকা) বেশে বিরাট পুরীতে বাস করবেন। মহিলাদের কেশবিন্যাসের কাজে তিনি অভিজ্ঞা। রাজরাণী সুদেষ্ণার পরিচারিকা রূপে তিনি নিযুক্ত হবেন। কেউ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলেন বলবেন।

তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ যুধিষ্ঠিরকে এই আশ্বাস দেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ভূয়সী প্রশংসা করে প্রচ্ছন্নভাবে বাস কববার উপদেশ দেন।

দ্রৌপদীব এই মিথ্যা ভাষণে কোন পাপ স্পর্শ করে না। কারণ বিপদকালে বা জীবন সংশয় কালে মিথ্যা ভাষণে দোষ নেই ইহাই ঋষি বাক্য।

পাণ্ডবদের পূর্ব কল্পনানুযায়ী দ্রৌপদী মলিন বস্ত্র পরে সৈবন্ধ্রীর বেশে পথে বিচরণ করতে থাকেন এবং নিজেকে একজন সৈরন্ধ্রী বলে আত্মপরিচয় দেন। তিনি কাজ প্রার্থী বলে জানান। বিরাটরাজ মহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদ থেকে তাঁকে দেখে তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে দ্রৌপদীকে ডাকালেন এবং তাঁর পরিচয জানতে চাইলেন। উত্তরে দ্রৌপদী বলেন তিনি একজন সৈরন্ধ্রী, কাজের জন্য বিচবণ করছেন। রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর রূপ লাবণ্য, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও লক্ষণাদি দেখে দ্রৌপদী যে একজন সৈবন্ধ্রী তা অবিশ্বাস করেন। উত্তরে দ্রৌপদী কেবল বলতে থাকেন তিনি কর্মপ্রার্থী একজন সৈরন্ধ্রী। তিনি কি

কি কাজ জানেন তার এক ফর্দ্দ রাণী সুদেষ্ণাকে দেন।

অদৃষ্টের কি কঠিন পরিহাস! পাণ্ডবদের ভার্যা রাজরাণীকেও চাকরীর উমেদারী করতে হচ্ছে।

দ্রৌপদীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে রাণী সুদেষ্ণা বললেন, মহারাজ যদি দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত না হন, তবে তিনি সৈরন্ধ্রীকে রাখতে পারেন। কিন্তু পুরবাসীরা সকলেই সৈরন্ধ্রীর রূপে মুগ্ধ। পুরুষরা তাঁকে দেখলে না জানি কি অবস্থা হবে।

উত্তরে রাণী সুদেষ্ণার সংশয় কাটাতে চেষ্টা করে সৈরন্ধ্রী বলেন—

নাস্মি লভ্যা বিরাটেন ন চান্যেন কদাচন।

গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভাবিনি॥ (বি) ৯।৩০

—বিরাট রাজা অথবা অন্য কেহ আমাকে লাভ করতে কখনও পারবে না। হে ভাবিনি, পাঁচজন যুবক গন্ধর্ব আমার পতি।

তাঁরা প্রবল পরাক্রমশালী। তাঁরা সর্বদাই সৈরন্ধ্রীকে রক্ষা করবেন। তাছাড়া তাঁকে কঠোর নিয়ম পালন করে চলতে হয়। যে ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট দেয় না বা তাঁকে দিয়ে পাদ প্রক্ষালন করাবে না, তাঁর স্বামীরা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

সুদেষ্ণা রাণী জানালেন কারও উচ্ছিষ্ট বা চরণ তাঁকে স্পর্শ করতে হবে না। বিরাটপুরীতে সুদেষ্ণার পরিচারিকা রূপে দ্রৌপদী অতি দুঃখে দশমাস কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু যৌবনের প্রান্তে এসেও তাঁর রূপই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে। বিরাট রাজার শ্যালক ও সেনাপতি কীচক সৈরন্ধ্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কামনা করে। কীচক তার বাসনার কথা ভগ্নী সুদেষ্ণার নিকট ব্যক্ত করেন।

কীচক দ্রৌপদীর নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করলে, দ্রৌপদী তাকে পরস্ত্রীর প্রতি এইরূপ মনোভাবের জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু কীচক তাতে নিবৃত্ত না হয়ে, তাঁকে বশ করতে চেষ্টা করলে দ্রৌপদী তাকে তাঁর পরাক্রমশালী গন্ধর্ব স্বামীদের ভয়

দেখালেন এবং বলেন যে তাঁর পতিগণের রোষে পড়লে কীচকের কোন প্রকারে প্রাণ থাকবে না।

সৈরন্ধ্রী কীচককে বার বার প্রত্যাখান করায় কীচক অবশেষে ভগ্নী সুদেষ্ণার শরণাপন্ন হয়ে বলেন যে, যে কোন উপায়ে সৈরন্ধ্রীকে যেন তাঁর নিকট পাঠানো হয়। রাণী সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীর পঞ্চস্বামীর প্রবল বিক্রমের কথা ও তাঁদেব প্রতিশোধ নেবাব ক্ষমতা প্রভৃতির কথা কীচককে জানানো সত্ত্বেও যখন কীচক নিবৃত্ত হলো না, তখন রাণী সুদেষ্ণা কীচকেব অনুরোধে সম্মত হলেন।

একদিন সুদেষ্ণা সৈবন্ধ্রীকে কীচক গৃহ হতে সুরা আনতে বলেন। দ্রৌপদী কোনরূপ সঙ্কোচ না করেই স্পষ্ট জানালেন—তিনি কীচকের গৃহে যাবেন না। কীচক কিরূপ নির্লজ্জ তা জানাতেও তিনি তার ভগ্নীর নিকট দ্বিধা কবলেন না। সুদেষ্ণার গৃহে বাস করে তিনি ব্যাভিচাবিণী হতে পাববেন না জানালেন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে সৈরন্ধ্রীর পদে নিযুক্ত করবাব সমযকাব কথা স্মবণ করিয়ে দিলেন। তথাপি কীচবের ষড়যন্ত্রে তার ভগ্নী রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্রৌপদীকে কীচক ভবন হতে সুবা আনতে পাঠান।

ভীতা দ্রৌপদী কীচক ভবনে যাত্রার পুর্বে সূর্যদেবের উপাসনা করেন। সূর্য দ্রৌপদীর রক্ষণার্থে একটি প্রচ্ছন্ন রাক্ষসকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। সৈবন্ধ্রীর আগমনে কীচক উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে স্বাগত জানায় এবং নানাভাবে সৈবন্ধ্রীব প্রেম প্রার্থনা করে। সৈরন্ধ্রী কীচকের বাক্যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে সত্ত্বব পানীয় দেওয়াব জন্য বলে। অন্য দাসী পানীয নিযে যাবে বলে কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণ হস্ত ধরে—

তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ॥ (বি) ১৬।৮

—দ্রৌপদী হাত ছাডিয়ে নেবাব চেষ্টা করলে কীচক ধরে রাখায় দ্রৌপদী তাকে ধাক্কা দিযে সবিযে দিলেন। দেহে ধাক্কা লাগাতে

সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হলো।

কীচককে ভূপাতিত করেই দ্রৌপদী দৌড়িয়ে রাজসভায় গেলেন। কীচক দৌড়ে রাজসভার সন্নিকটে সৈরন্ধ্রীর কেশগুচ্ছ ধরে তাঁকে ভূমিতলে ফেলে দিয়ে পদাঘাত করল। বিরাটরাজা, সভাসদ্‌গণ বা পঞ্চপাণ্ডব সকলেই বিনা প্রতিবাদে এই দৃশ্য দেখলেন। অদৃশ্য রাক্ষসের ধাক্কায় কীচকও মৃতের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সভায় দ্রৌপদী অপমান, ক্রোধ ও ক্ষোভে তাঁর স্বামীদের ও বিরাট রাজাকে তীব্র ভাষায় যে তিরস্কার করেছিলেন, তাতে দ্রৌপদী যে শুধু আত্মসম্মান জ্ঞানে সতত সজাগ তা নয়, তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয়ও দিয়েছেন। ক্ষত্রিয় নারীর মতই তিনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাই সভামাঝে লাঞ্ছিতা হয়ে, নীরবে তা সহ্য করেননি। অপরাধীকে নিজে কেবল দণ্ডই দেননি, দেশের রাজা অপরাধীকে দণ্ড না দেওয়ার জন্য তাঁকেও তিরস্কার করতে দ্বিধা করেননি।

বিরাটরাজার রাজদরবারে সমস্ত সভ্যগণ ও নিজ পতিগণের সম্মুখে তিনি রাজধর্ম সম্বন্ধে এক সারগর্ভ আবেদন করেন। বিরাটরাজ বিবাদের বিষয়বস্তুর অজ্ঞতার জন্য বিচারে অক্ষম বলে জানালেন। তখন দ্রৌপদী সব ঘটনা সভামাঝে বর্ণনা করেন। সভাসদগণ দ্রৌপদীর ভূয়সী প্রশংসা ও কীচকের নিন্দা করতে থাকেন। যুধিষ্ঠির নিরপেক্ষভাবে বলতে থাকেন, যে স্ত্রীর স্বামী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছেন সেইরূপ স্ত্রীর এ রকম অন্যায় সাময়িকভাবে সহ্য করতে হয়, যতক্ষণ তার স্বামীর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আসে। তিনি দ্রৌপদীকে রাণী সুদেষ্ণার কাছে ফিরে যেতে বলেন।

দ্রৌপদীও আর্তির বেশে সুদেষ্ণার কাছে ফিরে গেলেন। দুঃখিতা রোরুদ্যমানা সৈরিন্ধ্রীকে দেখে রাণী সুদেষ্ণা তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করলে, সৈরন্ধ্রী বলেন—

কীচকো মাধবীং তত্র সুরাহারীং গতাং তব।

সভায়া পশ্যতো রাজ্ঞো যথৈব বিজন বনে ॥ (বি) ১৬।৪৯

—আপনার জন্য সুরা আনয়ন করতে গেলে বিজন বনে লোকে যেরূপ লোককে প্রহাব করে, কীচক আমাকে রাজসমীপে রাজার সাক্ষাতে সেরূপ প্রহার করেছে।

রাণী সুদেষ্ণা বললেন, যে তোমার এমন অপমান করেছে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাবো। দ্রৌপদী বললেন যে যাঁদের কাছে কীচক অপরাধ করেছে তাঁরাই তাকে বধ করবেন এবং আজই সে যমলোকে যাবে। দুঃখিতা সৈরন্ধ্রী কীচক-বধের ব্রত গ্রহণ করলেন। সৈরন্ধ্রী স্নানাহার কিছুই করলেন না। গায়ের ধূলি গাযে ছিল, রক্তাপ্লুত বদনে রোদনরতা দ্রৌপদী চিন্তা করতে থাকেন কে তাঁব কার্য সুসম্পন্ন করবেন? ভীম ভিন্ন অন্য কেহ তাঁর মনেব প্রীতি সম্পাদন করতে পারবেন না।

দ্রৌপদীর উগ্রদৃষ্টি যেন সকলকে দগ্ধীভূত করতে পারত, কিন্তু তিনি অপরিসীম সংযম ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন।

ভীমকে কীচক বধে প্ররোচিত করতে গিয়ে দ্রৌপদী অতি দুঃখে বলেছেন :—

অশোচ্যত্বং কুতস্তস্য যস্যা ভর্তা যুধিষ্ঠিরঃ। (বি) ১৮।১

—যুধিষ্ঠির যার স্বামী, তার শোকের অভাব কোথায়?

কাশীদাসী মহাভারতে কীচক বধের জন্য ভীমকে প্ররোচিত করতে দ্রৌপদী তাঁর তুল্য দুঃখী কেউ নেই, একথা প্রমাণ করতে তাঁব দুঃখেব কাহিনী বিবৃত করেন :—

হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল।
কুরুসভা মধ্যে সবে বসিয়া দেখিল ॥
... ...
অনন্তর অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত ॥
... ...

বিরাটের সুদেষ্ণার দাসী হৈনু গিয়ে ॥
গোরচনা চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর।
হের দেখ কলঙ্কিত হৈল দুই কর ॥

... ...

বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্মতি।
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি ॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ ॥
রাজকন্যা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কভু না দেখি শুনি ॥

... ...

যাঁহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল ॥
এমন করেছে কোন্ রাজা কোন্ দেশে।

... ...

দ্রুপদের কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজি এবে হৈনু অনাথিনী ॥
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির ॥ (বি)

ভীম দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সীতা, লোপামুদ্রা, দময়ন্তীর কাহিনী শুনিয়ে বললেন অজ্ঞাত বৎসরের কাল অতিক্রান্ত হবার সময় বেশী নেই। এই সময় কীচককে সাজা দিতে গেলে পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসেব সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়বে। অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হলে কীচককে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।

অসহিষ্ণু দ্রৌপদী এই উত্তর শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন :—

এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমাব গোচরে ॥
জয়দ্রথ-ভয় হতে কবিলে উদ্ধার।
জটাসুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতীকার ॥

এখন কীচক ভয় কর পরিত্রাণ।

অবশেষে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী পরদিন কীচককে রাত্রে গোপনে রাজবাড়ীর নৃত্যশালায় আসতে বলেন। সেইখানে তিনি কীচকের অভিলাষ পূর্ণ করবেন জানান।

ভীম দ্রৌপদীর প্ররোচনায় কীচককে নিশীথ রজনীতে হত্যা করার পর প্রতিহিংসা পরায়ণা দ্রৌপদী উৎফুল্ল হয়ে বললেন।

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হয়ে।
সভাপাল প্রতি বলিল ডাকিয়ে॥
মোরে যথা দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল গন্ধর্ব্বেরা মোর পতি॥ (বি)

এই ধরণের প্রতিহিংসা সাধনে আনন্দ ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করতে দ্রৌপদীকে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে।

সৈবন্ধ্রীর জন্য তার গন্ধর্ব স্বামীরা কীচককে বধ করায় কীচকের আত্মীয় বন্ধুবা স্থির করলেন কীচকের শবেব সঙ্গে সৈরন্ধ্রীকেও দাহ করা হবে। বিরাটরাজও তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এই জন্য তারা জোর কবে দ্রৌপদীকে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে চল্লো। তিনি উচ্চস্বরে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন, জয়দবলকে ডেকে তাঁর বিপদের কথা শোনালে ভীম সৈরন্ধ্রীর আর্ত্তস্বরে সাড়া দিয়ে বল্লভের ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তন করে শ্মশানের নিকট একটা বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তা উৎপাটিত করে তার আঘাতে একশ পাঁচজন উপকীচককে যমালয়ে প্রেরণ করেন এবং সৈরন্ধ্রীকে বন্ধন মুক্ত করেন।

সৈবন্ধ্রী নগরে প্রবেশ মুখে ভীমসেনকে রন্ধনশালার দ্বারদেশে দেখে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে চলতে থাকেন। তারপর নর্ত্তনাগারে বিরাটরাজার·কন্যাদের সঙ্গে বৃহন্নলাকে দেখতে পান। বিরাটরাজার কন্যারা নিবাপবাধী সৈরিন্ধ্রীর মুক্তিতে আনন্দ জানালে বৃহন্নলা সৈরন্ধ্রী কিরূপে মুক্ত হন এবং পাপিষ্ঠগণ কিভাবে নিহত হয়েছে এ সব প্রশ্ন করলেন।

অভিমানিনী সৈরন্ধ্রী বলেন, তুমি ত কন্যাদের নিয়ে সুখে আছ তোমার সৈরন্ধ্রীব কথায় প্রয়োজন কি? তখন বৃহন্নলাও ক্লীব যোনি প্রাপ্ত হয়ে মহাদুঃখে আছেন জানালেন। অতঃপর দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে রাজভবনে প্রবেশ করেন।

সৈরন্ধ্রীর জন্য কীচক ও তার একশত পাঁচ ভ্রাতা নিহত হওয়ায় বিরাট রাজ্যের প্রজাবা ও স্বয়ং বিরাটরাজাও সৈরন্ধ্রীর গন্ধর্ব স্বামীদের ভয়ে ভীত হলেন। বিরাট রাজার নির্দ্দেশে রাণী সুদেষ্ণা সৈবন্ধ্রীকে বললেন, তুমি এখান হতে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন। তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে পারেন না। তাই আমি বলছি।

উত্তরে সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণাকে জানালেন আর তেরদিন পর গন্ধর্ব স্বামীদের দুঃখেব অবসান হবে। তখন তাঁরা এসে সৈরন্ধ্রীকে নিয়ে যাবেন, বিরাটরাজারও মঙ্গল করবেন। এই কয়টা দিন বিবাটরাজা যেন সৈরন্ধ্রীকে তাঁর রাজপুরীতে থাকতে দেন। সুদেষ্ণা ভযে বিহ্বল হযে বলেন, ভদ্রে, তোমার ইচ্ছামত থাক এবং আমার স্বামী ও পুত্রদের রক্ষা কর।

বিরাটরাজার পুবীতে ছদ্মবেশী পতিদেব দুরবস্থা দেখে দ্রৌপদী আক্ষেপ করে ভীমকে বলেন:—

তোমাকে পাচক হয়ে বিরাটের সেবা করতে দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। বিরাট রাজা নিজের আনন্দেব জন্য যখন তোমাকে দিয়ে হিংস্র পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করায়, অন্তঃপুরের রমণীরা তখন হাসতে থাকে। তা দেখে আমি উদ্বিগ্ন হই। এই উদ্বিগ্নতা সুদেষ্ণার পরিহাসের বিষয় হয়ে পড়ে। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অর্জুন এখন নপুংসক সেজে অলঙ্কার পরে বেনা ঝুলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন।

ধর্মে শৌর্য্যে চ সত্যে চ জীবলোকস্য সম্মতম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ॥ (বি) ১৯।২৮

ধর্ম, শৌর্য এবং সত্যে যিনি জীবজগতে সমাদৃত, সেই অর্জুনকে নারীবেশে বিকৃত দেখে আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।

দশ হাজার হস্তী ও সুবর্ণমালাঙ্কৃত অশ্ব যার যাবার সময় অনুগামী হয়, সেই যুধিষ্ঠিব আজ দ্যূতক্রীড়া দ্বারা জীবিকা অর্জন করছেন। সেই বীর সহদেব, যাঁকে যত্ন করবার ভার জননী কুন্তী আমাকে দিয়েছিলেন, তিনি গো-পালনে ব্যাপৃত ও রাত্রিতে গোচর্মোপরি শায়িত দেখেও আমি কেন বেঁচে আছি। রূপবান, বুদ্ধিমান এবং অস্ত্রবিশারদ নকুল এখন রাজার অশ্বরক্ষক হয়েছেন, সময়ের বিপর্য্যয় দেখ। দ্রৌপদী নিজের ছদ্মবেশী পরিচারিকার দুঃখের কথাও প্রকাশ করেন।

পঞ্চ পাণ্ডবের ভাগ্য বিপর্যয়ের এ করুণ কাহিনী সত্যই দুঃখদায়ক। উপরোক্ত ক্ষোভের মধ্যে দ্রৌপদীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবার ব্যথাই কেবল প্রকাশ পায়নি, পতিদের জন্য তাঁব দুঃসহ বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

বনবাস জীবনে সীতা দ্রৌপদী উভয়েই কঠোর কৃচ্ছ্রতা ভোগ করেছেন। চৌদ্দ বৎসর সীতা ও ত্রয়োদশ বৎসর দ্রৌপদী কঠোর নীরস বনবাসে যাপন করেন। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার অবিচার নিগ্রহ ভোগের তুলাদণ্ডে সীতার সমতুল্য দ্রৌপদী নহেন।

দ্রৌপদীর বনবাস জীবন সাধু সজ্জনের সাহচর্য্য এবং কৃষ্ণ নাবায়ণেব সময় সময় দর্শন দ্বাবা সরস হয়ে থাকতো। সীতাও স্বামী দেওরের সঙ্গে বনবাস কালে নানা মুনি ঋষিদের আশ্রম পর্যটন কবে মুনি ঋষি ও তাঁদের পত্নীদের সঙ্গ লাভেব পুণ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু সীতার বনবাস জীবনের শেষাংশ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। অবশ্য বনবাসকালে দ্রৌপদীকেও কিছু কিছু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হযেছে। কিন্তু সীতার দুঃখ লাঞ্ছনার মত তেমন বেদনাদায়ক নয়। দ্রৌপদী তাঁর দুঃসময়ে সর্বদা তাঁর পতিগণের সমবেদনা ও সহানুভূতি পেযেছেন। কিন্তু অশোকবনে সীতা নিতান্ত একা। তদুপরি দুষ্ট

চেড়ীবৃন্দ তাঁর বন্দী জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।

এই দুই মহীয়সী নারীর প্রতিপক্ষদের মধ্যেও কোন তুলনা চলে না। একদিকে অমিত বিক্রম দেবাশ্রিত রাক্ষসকুলরাজ রাবণ। অপর দিকে জয়দ্রথও কীচকের মত সামান্য ব্যক্তি—যাদের দ্রৌপদী একাই পরাভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সীতা ও দ্রৌপদীর জীবনে অন্যতম পার্থক্য তাঁদের পতিদের মনে তাঁদের অপহরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও পাওয়া যায়। জয়দ্রথ বা কীচক দ্রৌপদীকে বলপূর্বক হরণ বা লাঞ্ছিত করার জন্য দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর মনে দ্রৌপদীর প্রতি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি—যেমন রামের মনে দেখা গিয়েছিল। সীতাকে এজন্য অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে স্বীয় পাতিব্রত্যের প্রমাণ করতে হয়েছিল। এই প্রকার কোন সঙ্কট দ্রৌপদীর জীবনে ঘটেনি।

বনবাস জীবনে সীতা একবারই রাবণ কর্তৃক অপহৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তিনি অবলা নারীর প্রতিমূর্ত্তি। তাই জীবন ব্যাপী অকারণে লাঞ্ছিতা হয়েছেন বারবার। নীরব অশ্রুজলে তা সহ্য করেছেন। অহেতুক প্রত্যাখ্যাত হবার অপমানেও তিনি প্রতিবাদে মুখর হতে পারেননি। তিনি দুর্বলা অবলা কুলবধূ।

দ্রৌপদী বনবাস জীবনে দুইবার পরপুরুষ দ্বারা অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন, দুইবারই ভীমই দুষ্কৃতদের সাজা দিয়েছেন। দ্রৌপদী অন্যের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর আত্মশক্তির দ্বাবা যথাসম্ভব দুর্বৃত্তদের পর্যুদস্ত করতে কখনও ইতস্ততঃ করেননি।

উদ্‌যোগ পর্বে পাণ্ডবরা যখন কৃষ্ণকে দূত রূপে দুর্যোধনের কাছে শান্তি স্থাপনের জন্য পাঠাচ্ছিলেন, তখন দ্রৌপদী শান্তির বিরোধিতা করেন। তিনি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :—

হে জনার্দ্দন, দুর্যোধনের সব দুষ্কৃতির কথা তোমার স্মরণ আছে। অর্দ্ধেক রাজ্য প্রত্যর্পণ না করলে সন্ধির প্রস্তাব করবে না। দ্যূত ক্রীড়ার সভায় আমার লাঞ্ছনার কথা কি বিস্মৃত হয়েছ?

পুনরায় স্বামীদের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন :—

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিক্ বলম্।

যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥ (উ) ৮২।৩১

—হে কৃষ্ণ, যদি এ অবস্থায় দুর্যোধন এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকে, তবে অর্জুনের ধনুষ্মত্তাকে ধিক্। ভীমসেনের শক্তিকেও ধিক্।

মহাভারতে অনেক ক্ষেত্রে দ্রৌপদী এইভাবে স্বামীদের শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছেন।

দ্রৌপদীর এইরূপ ধিক্কার সমর্থনযোগ্য নয় বলা চলে না। তিনি পুনরায় কৃষ্ণকে কৌরবদেব দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :—

যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।

পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥ (উ) ৮২।৩৭

পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।

অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥

দুঃশাসনভুজং শ্যামং সঞ্ছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।

যদ্যহং তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥ (উ) ৮২।৩৮-৩৯

—ভীমার্জুন যদি যুদ্ধে কাতর হয়ে সন্ধি কামনা করেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পুত্রগণ কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। অভিমন্যুকে অগ্রবর্ত্তী রেখে আমার পাঁচ পুত্রও যুদ্ধ করবে। দুঃশাসনের শ্যাম বর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলি লুণ্ঠিত না দেখি তবে আমার হৃদয়ে কি করে শান্তি আসবে ?

এখানেও দ্রৌপদীর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বংশনাশ আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবেব মৃত্যু আশঙ্কায় যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন যেখানে কেবলমাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সন্ধিব প্রস্তাব কবে পাঠাচ্ছেন, সেইখানে দ্রৌপদী নারী হয়ে যুদ্ধকেই স্বাগত জানাচ্ছেন।

দ্রৌপদীর মনে জিঘাংসার কারণ দ্যূত সভায় দুঃশাসন তাঁকে

যেভাবে অপমান করেছে, সে অপমান প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তিনি তের বৎসব পালন করেছেন। এখন মহাবাহু ভীমেব সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব তাঁর হৃদয়ে বাণের আঘাত হেনেছে। একথা বলতে বলতে দ্রৌপদীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হলো।

উদ্‌যোগ পর্বে দ্রৌপদী সম্বন্ধে নকুল সহদেবের মাতুল রাজা শল্য যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

জটাসুরাৎ পরিক্লেশঃ কীচকাচ্চ মহাদ্যুতে।
দ্রৌপদ্যাধিগতং সর্বং দয়মন্ত্যা যথাশুভম্ ॥
সর্ব্বং দুঃখমিদং বীর সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।
নাত্র মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো বিধির্হি বলবত্তরঃ ॥ (উ) ৮।৫১।৫২

—পূর্বে দময়ন্তী যেমন দুঃখ ভোগ করেছিলেন, তেমনি দ্রৌপদী জটাসুর ও কীচক হতে যে মহাক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, এ সমস্ত দুঃখই তোমার ভবিষ্যৎ সুখের সূচনা করে। সেইজন্য তুমি কোন খেদ করো না। কারণ বিধাতার বিধান সর্বত্র বড়ই প্রবল।

শল্যর উক্তি হতেও দ্রৌপদী সারা জীবন যে দুঃখ ও নিগ্রহের মধ্যে কাটিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সীতা যেমন অটল ধৈর্যের প্রতিমূর্ত্তি, দ্রৌপদী তেমনি অসহিষ্ণু। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণাও। সাধারণ নারীর মতই তিনি দুঃখে শোকে কখনও উত্তেজিত, কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও অসহিষ্ণু, কখনও বা জিঘাংসাপবায়ণা, কখনও বা সতী সাধ্বী বিনম্র স্ত্রী। তিনি বলেছেন:—

দুঃশাসনভুজং শ্যামং সঞ্ছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহং তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥ (উঃ) ৮২।৩৯

—যদি আমি দুঃশাসনের শ্যামল হস্তকে ছেদন করত ধূলিতে লুণ্ঠিত হতে দেখতে না পাই, তবে আমাব হৃদয়ে শান্তি কিরূপে হবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুঃশাসনকে বধ করে ভীম সেই রক্ত দ্রৌপদীর কেশে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাবপর দ্রৌপদী তাঁর পণ রক্ষা হওয়ায়

আবার কেশ বন্ধন করেছিলেন—এই ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতে ফিরে দ্রৌপদী শ্বশ্রূ কুন্তীকে জানিয়েছিলেন।

কৌরবদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি বার বার পঞ্চপাণ্ডবদের ও কৃষ্ণকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করেছেন।

শল্য পর্বে কৃপাচার্য দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বললে, উত্তরে স্বীয় দোষ স্বীকার করে দুর্যোধন বলেছেন,—

যদা দ্রৌপদী ক্লিষ্টা মদ্বিনাশায় দুঃখিতা।
স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্॥ (শ) ৫।১৯

—যেদিন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, সেইদিন হতে সে আমার বিনাশের সঙ্কল্পে মৃত্তিকা নির্মিত বেদীতে প্রতিদিন শয়ন করে। যতদিন শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়, ততদিনের জন্য সে এই ব্রত গ্রহণ করেছে। অতএব সন্ধির আশা নিরাশা।

দ্রৌপদী পতিদের ও নিজের অপমানের প্রতিশোধের জন্য নিজেই কঠোর তপস্যা করেছেন। সুতরাং তিনি কেবল কৃষ্ণ ও পতিদেরই প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করেননি, নিজেও তাঁর তপলব্ধ ফল প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ রাত্রিতে অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সহ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতাদের নিদ্রিত অবস্থায় নিহত করেন। পুত্রদের ও ভ্রাতাদের জন্য দ্রৌপদীব বিলাপ বড়ই মর্মস্পর্শী। এবারও রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী বললেন, অশ্বত্থামা যদি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিহত না হন, তবে তিনি প্রায়োপবেশন করবেন।

মহাভারতের যাবতীয় জটিল ঘটনার সঙ্গে দ্রৌপদীর জীবন ও ভাগ্য জড়িত ছিল। এ কারণে দ্রৌপদীর জীবনবৃত্তান্ত ঘটনাবহুল এবং এক অবিচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী।

যুধিষ্ঠির তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চাইলেন। কিন্তু

দ্রৌপদী কোন প্রকারেই তাঁর সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত হলেন না। তিনি বললেন অশ্বত্থামাকে বধ করে তাঁর মস্তকের মণি যুধিষ্ঠির স্বীয় শিরে ধারণ না করা পর্যন্ত তিনি প্রায়োপবেশন করবেন।

অশ্বত্থামাকে হত্যা করবার জন্য ভীমকে উত্তেজিত করবার জন্য দ্রৌপদী বলেন :—

হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে॥
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বক করিলে বিনাশ।
কির্ম্মীরে বধিয়া কৈলে কানন নিবাস॥
জয়দ্রথ-ভয় হতে করিলে উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার॥
... ...
দুঃশাসন-রক্তপান কৈলে রণ-মাঝে।
উরু ভাঙ্গি ভূমিতে পাড়িলে কুরুরাজে॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে পদাঘাতে কৈলে শিরে।
.. ..
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র মাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়। (ঐষীক পর্ব)

এখানেও দ্রৌপদীর ভয়ঙ্করী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামা নিষ্পাপ পাণ্ডবশিশুদের কাপুরুষের মত হত্যা করেছে। সেই পাপিষ্ঠের শিরোমণি চাই-ই চাই। এ পণ করে দ্রৌপদী অন্নজল ত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর নিকট যুধিষ্ঠিরের অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হলো। তিনি ভীমের কাছে আবদার করেন।

ভীম সেই মণি এনে দ্রৌপদীকে দিলেন। তারপর দ্রৌপদী সেই মণি যুধিষ্ঠিরকে মস্তকে ধারণ করতে দিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

প্রবাদ আছে—ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। দ্রৌপদীর চরিত্রে এই মহত্ত্ব কিন্তু বিরল।

কুরুক্ষেত্র—মহাশ্মশান। কেবল কুরুবংশ বা পাণ্ডবদের আত্মীয় বন্ধু নয়, বহু দেশ হতে বহু নৃপতি এ যুদ্ধে সাহায্য করতে এসে এ মহাশ্মশানে শায়িত। যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন, তাঁরা আপন জন ও আত্মীয়বন্ধুদের জন্য শোক করতে এ মহাশ্মশানে মিলিত হয়েছেন। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী,—যাঁর সব পুত্রই নিহত হয়েছে, তাঁর জন্যে শোক কবতে লাগলেন। তিনি দেখলেন দ্রৌপদী শোকে ভূপতিত। দ্রৌপদী কুন্তী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন :—

আর্য্যে পৌত্রাঃ ক তে সর্বে সৌভদ্রসহিতাঃ গতাঃ।
ন ত্বাং তেঽদ্যাভিগচ্ছন্তি চিবং দৃষ্ট্বা তপস্বিনীম্॥
কিন্নু বাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনাযাঃ সুতৈর্মম। (স্ত্রী) ১৫।৩৬

—আর্য্যে অভিমন্যুসহ আপনার সব পৌত্ররা কোথায় গেছে? দীর্ঘকাল পর তপস্বিনী আপনাকে দেখেও আজ তাবা আপনার নিকট আসছে না। পুত্রদের হারিয়ে এ রাজ্যে আমার কি কাজ হবে?

পুত্রহীনা জননীব ব্যথাতুব হৃদয়েব এক অতি করুণ ছবি আমাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। কঠিন হৃদয়া দ্রৌপদীর সেই দীপ্ত তেজ যেন পুত্র শোকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। জননী হৃদয়ের শাশ্বত করুণা তাঁর হৃদযকে কোমল করেছে। সব রকম অনুভূতিকে ছাপিয়ে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদযের শোকের সুন্দব ছবি ফুটে উঠেছে। যে রাজ্যের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ও স্বামীদের উত্তেজিত করেছেন, পুত্রহীনা জননীর আজ সেই রাজ্যেব কোন প্রযোজন নেই।

শোকাতুবা কুন্তী দেবী ক্রন্দনবতা দ্রৌপদীর সঙ্গে গান্ধারীর নিকট গমন করেন। শতপুত্রহারা গান্ধারীব সান্ত্বনায় দ্রৌপদী কিটাছু

শান্ত হলেন। আত্মীয় পরিজন বন্ধুদের শোকে অভিভূত হয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেন, তাঁব রাজ্যের প্রয়োজন নেই। "অর্জুন তুমিই রাজ্য গ্রহণ কর।" যুধিষ্ঠির স্বযং বনে গমন করে চীর ও জটা ধারণ করে তপস্যা কববেন স্থির করেন। ভীমার্জুন, নকুল সহদেব ভ্রাতারা কেউই যুধিষ্ঠিবকে তার সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলেন—হে কুন্তীপুত্র, চাতকপক্ষী যেমন জল পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়ে বারম্বার রব করতে থাকে, সেরূপ তোমার ভ্রাতারাও তোমার সঙ্কল্পে হতাশায় শুষ্ক হয়ে বারংবাব তোমাকে রাজ্য শাসন করতে অনুরোধ করছে। তুমি তাদের অভিলাষ পূর্ণ কবছ না। তোমার এই ভ্রাতারা মত্ত গজরাজের মত সর্বদা তোমাব জন্য দুঃখ ভোগ করেছে, যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিয়েছে, তুমি এখন তাদের আনন্দিত কব। হে রাজন, দ্বৈতবনে তুমি এই ভ্রাতাদের ধৈর্য ধারণ কবে শত্রুদের দমন করতে বলেছিলে। জয় লাভের পর এই বসুন্ধরাকে উপভোগ করবে। পূর্বে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আজ কেন আমাদের হৃদয় বিদাবক কথা শোনাচ্ছ? অতঃপর দ্রৌপদী ব্রাহ্মণের ধর্ম ও ক্ষত্র ধর্মেব পার্থক্য বিশ্লেষণ কবে বলেন, রাজধর্ম পরম ধর্ম—দুষ্টের দমন। সৎ লোকের পালন ও যুদ্ধে কখনো পলায়ন না করা। তারপর কুন্তী দেবীর নামোল্লেখ করে দ্রৌপদী বলেন, আমার শ্বশ্রূমাতা কখনো মিথ্যে কথা বলেন না। তিনি সর্বজ্ঞা ও সর্বদর্শী। কিন্তু রাজন, তোমার এই মোহ দেখে তাঁর কথিত সেই বাক্যও ব্যর্থ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। মহারাজ, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মাদ হওয়ার জন্যে সব পাণ্ডবরাই উন্মত্ত হয়েছে। নতুবা তারা তোমাকে বন্ধন করে নিজেরাই এই বসুন্ধরাকে শাসন করতো। এ জগতের স্ত্রীদেব মধ্যে আমিই অধম। যেহেতু পুত্ররা নিহত হওয়া সত্ত্বেও আমি এখনো জীবিত। তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর। এভাবে উদাসীন থেকো না।

এইভাবে দ্রৌপদী তাঁর কঠোর বাক্যবাণে যুধিষ্ঠিবের মোহগ্রস্ত

মনকে প্রবুদ্ধ করে তুলেন। এই ভাষণে দ্রৌপদীর তেজ, যুক্তি ও প্রজ্ঞা লক্ষণীয়।

অতঃপর দ্রৌপদীর ও ভ্রাতাগণের অনুরোধে যুধিষ্ঠির রাজদণ্ড হাতে নিলেন। দ্রৌপদীই প্রধানা মহিষীর সম্মান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁর আরও সপত্নী ছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞেও দ্রৌপদীই তাঁর সঙ্গে দীক্ষিতা হয়ে সহধর্মিণীর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্ণ সীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কারণ সীতা তখন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পরিত্যক্তা।

রাজ্য প্রাপ্তির পনর বছর পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে অরণ্য যাত্রা করেন। বনে যাবার পূর্বে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা দ্রৌপদীর প্রিয় কাজ সম্পাদন করতে বলেন। কুন্তী বধূ দ্রৌপদীর তেজস্বিতার ও তপলব্ধ শক্তির জন্য তাঁকে সমীহ করতেন।

দ্রৌপদীও স্বামী ও পুরনারীদের সঙ্গে শ্বশুর ও শাশুড়ীকে দেখবার জন্য অরণ্য যাত্রা করেন। ব্যাসদেবের যোগবলে তথায় দ্রৌপদী তাঁর মৃতপুত্রও আত্মীয়দের দর্শনলাভের জন্য ব্যাসদেবকে অনুরোধ করে বলেন ঃ—

মোর সম হতভাগ্য নাহি ত্রিনলোকে।
পিতৃকুল-ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন—শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন্॥
মোর পঞ্চপুত্র ম'ল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল মোরে॥
যদি পুনঃ তা' সবায় করি দরশন।
এ শোক-সাগর তবে হইবে মোচন॥ (আশ্র)

মৃতপুত্রদের ও আত্মীয়দের দর্শনলাভ করে তাঁর হৃদয় কিছুটা শান্ত হলো।

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর পঁয়ত্রিশ বৎসর তাঁরা সুখে রাজত্ব করেন। তারপর নানা অশুভ চিহ্ন দেখে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। দ্রৌপদী তখন বললেন :—

আমি ধর্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময়॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি॥ (মুষল)

এখানে তিনিও সীতার মত যথার্থই সহধর্মিণী। তিনি কেবল পতিদের সঙ্গে বনগমনই করেননি, তাঁদেব সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পথে যেতেও দ্বিধা করেননি। এটাও তাঁব অকৃত্রিম পাতিব্রত্যের অন্য এক দৃষ্টান্ত।

মহাপ্রস্থানের পথে পথিমধ্যে প্রথমেই দ্রৌপদীর পতন ঘটে। ভীম যুধিষ্ঠিবকে দ্রৌপদীর স্বর্গ গমনের পথে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন :—

পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।
তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম্॥ (মহাপ্র) ২।৬

—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয়েব প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত ছিল। ইনি আজ সেই পক্ষপাতের ফল ভোগ করলেন।

যুধিষ্ঠিরেব এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ হয় অর্জুন যখন তপস্যার জন্য হিমালয় গেলেন, তখন দ্রৌপদী তাঁর বিরহে বলেছিলেন :—

তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং কাম্যকং নাতিভাতি মে॥ (বন) ৮০।১২

—সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে দেখতে না পাওয়ায় এই বনভূমি আমার ভাল লাগছে না।

শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম॥ (বন) ৮০।১৩

—(অর্জুনের বিরহে) এই সুন্দর বনভূমিব সেই সেই স্থান যেন শূন্য

বোধ হচ্ছে।

ন লভে শর্ম্ম বৈ রাজন্ তং স্মরন্তী কিরীটিনম্। (বন) ৮০।১৫
—রাজন, সমান কান্তিযুক্ত কিরীটিকে স্মরণ করে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

উপরোক্ত খেদোক্তি হতে পঞ্চ স্বামী মধ্যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই অধিক ভালবাসতেন তা স্পষ্টই প্রকাশ পায়।

দ্রৌপদীকে পক্ষপাত দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ তিনি অর্জুনেরই বীর্যশুল্কা। অর্জুনই স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যবিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। পরে মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অনুরাগ যদি অধিক প্রকাশ পেয়ে থাকে তার জন্য তিনি কি কোন রূপে অপরাধী? কারণ দ্রৌপদী তো মানবীই ছিলেন। বীরপুরুষই নারীদের পূজ্য।

দ্রৌপদীকে হরণ করলেও, তাঁর স্বামীদের বা প্রজাদের মনে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন জাগেনি। অবশ্য সীতার মত তাঁকে পররাজ্যে দীর্ঘকাল বন্দী জীবন কাটাতে হয়নি।

পঞ্চ পাণ্ডবের আরও পত্নী থাকা সত্ত্বেও—দ্রৌপদীই প্রধানা রাণীর আসন ও সম্মান পেয়েছিলেন। মহাভারতের ঘটনাবলী দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে। এক্ষেত্রে দ্রৌপদীকে ভাগ্যবতী নারী বলা যায়।

সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয়া। লঙ্কা হতে ফিরে হনূমান রামকে সীতা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া॥ (সুন্দর) ৬৫।১৫

—ভূমিশয্যায় শায়িতা হিমাগমে পদ্মিনীব মত বিবর্ণাদেহা সীতা রাবণ দ্বারা অবরুদ্ধ থাকায় স্বীয় বাসনায় বঞ্চিত হয়ে মরণের জন্য স্থির নিশ্চয়া হয়ে রয়েছেন।

এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা তদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ ॥ (সুন্দর) ৬৫।১৯

—হনূমান রামকে সীতার তপস্যা সম্বন্ধে বলেছেন—মহাত্মন, পুরুষোত্তম, আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ জনকনন্দিনী কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা রয়েছেন দেখলাম।

সীতা হনূমানকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ—

কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রসাদং পার্থিবাত্মজঃ।
কচ্চিৎ পুরুষকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে ॥ (সুন্দর) ৩৬।১৯

—রাম দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছেন তো? দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই অবলম্বন করেছেন তো?

'এই দুই মহাকাব্যের নায়িকা চরিত্র অঙ্কনে মহাকবিদ্বয় উভয় চরিত্রকে অতি মানবীয়তার রং এ রঞ্জিত করেছেন। রামায়ণে সীতার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। পতিভক্তি তাঁর অন্যান্য গুণাবলীকে অতিক্রম করেছে।

কিন্তু তবু যে স্বামী রাক্ষস ও বানর সমাজের সামনে অকারণে তাঁকে নানা কটূক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত করে পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, সেই স্বামীর সব অপমানের জ্বালা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গিয়ে, লাঞ্ছনার গ্লানি মুছে ফেলে স্বচ্ছন্দে তাঁর ক্রোড়ে উপবেশন করে, সীতার গল্প গুজব করবার স্পৃহা রক্ত মাংসের শরীরে কি সম্ভব?

কবি কি সীতা চরিত্রের মান অভিমানের অভিব্যক্তিগুলি কোথাও প্রকাশ করবেন না বলেই তাঁর লেখনী ধরেছিলেন? অথবা এই চরিত্র অঙ্কিত করবার সময় তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে সীতা স্বর্গের লক্ষ্মী হলেও, মর্ত্যের মানবী, সুতরাং মানবীয় গুণাগুণ তাঁর চরিত্রে অপরিহার্য্য।

অপর পক্ষে মহাকবি দ্রৌপদী চরিত্র অঙ্কন করবার সময় কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি নারী চরিত্র অঙ্কন করছেন? দ্রৌপদীর

নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, সীমাহীন। মৃত দুঃশাসনের বুকের রক্ত দিয়ে করবী রঞ্জিত করা নারী চরিত্রে অদৃষ্টপূর্ব, বরং রাক্ষসীদের পক্ষে এটা সম্ভব। এখানেও অতি মানবীয় রূপ ফুটেছে নয় কি? দুঃশাসন যত অপরাধই করুক না কেন, মৃত্যুর পরও এমন নির্মম প্রতিহিংসার স্পৃহা অন্ততঃ কোন মানবীর পক্ষে কি সম্ভব? প্রবাদ আছে—Man wars not with the dead, সেই স্থলে দ্রৌপদীর পক্ষে এতটা নির্মমতা কি সম্ভব?

জগতের ভোগ্য বস্তু বিষয়ে অনীহা, সুখ সম্পদের প্রতি নিস্পৃহা সীতা চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। রাজনন্দিনী, রাজরাণী সীতা যেন মূর্ত্তিমতী তপস্বিনী—তাঁর স্বভাবে, আচরণে, বসন ভূষণে তিনি মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি।

মৃদুভাষী সংযত রসনার মাধুর্যে সীতা প্রিয়ংবদা।

দ্রৌপদীর মধ্যে ক্ষমা ও উদারতার অভাব। রূঢ় ভাষণে বা কটু ভাষণে দ্রৌপদীর সমতুল্য নেই। যুদ্ধ সমাপ্তির পর আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় বিধুর যুধিষ্ঠির সিংহাসন ত্যাগ করে বনগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে, ভ্রাতারা তাঁর সঙ্কল্প হতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারেননি। অবশেষে দ্রৌপদীর বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর বনগমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

এই দুইটি চরিত্রের মধ্যে সীতা যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, কোমল, মধুর। দ্রৌপদী যেন নিদাঘের তপ্ত সূর্য রশ্মির মত দীপ্ত, প্রচণ্ড, কঠোর। দুই নারী চরিত্র বিপরীত মুখী। কিন্তু উভয়েই ধার্মিকা ও আদর্শবাদী।

জীবনের নানা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এই দুই রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজ্ঞীকে নানা কণ্টকপূর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েই যেমন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দৈব নির্দেশে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের জীবনের

প্রতিটি ঘটনা যেন পূর্ব পরিকল্পিত। আঘাতে আঘাতে তাঁরা চৌচির হয়ে গেলেও—ধৈর্যহীন হননি।

দ্রৌপদী চরিত্র পাঠ করলে তাঁকে রক্ত মাংসের মানবী বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ তাঁর মধ্যে যেমন প্রেম, ভালবাসা রয়েছে, তেমনি ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিহিংসার সমন্বয় ঘটেছে।

কিন্তু সীতা যেন মাটির পুতুল—প্রাণহীন। কোথাও তাঁর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না। এত নম্র, পরনির্ভরশীল, ক্ষমাশীল, ব্যক্তিত্বহীনা কি রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভব? সীতার কোন প্রকার অনুভূতি আছে বলে মনে হয় না। তাই সারাটা জীবন অকারণে তাঁর উপর এত উপদ্রব সম্ভব হয়েছে। সীতা ব্যতীত অন্য কোন নারীর পক্ষে এ প্রকার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্ভব হত না।

দুই মহাকাব্যের দুই নায়িকা চরিত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই প্রকট। উভয় চরিত্রই দোষ গুণে ঔদার্য্যে অনীহায় উজ্জ্বল। এই দুইটি চরিত্র এই দুই মহাকাব্যের প্রাণ স্বরূপ। তাই রামায়ণ মহাভারত পাঠে সীতা দ্রৌপদী চরিত্র অনুধ্যান অপরিহার্য্য।

Hamletকে বাদ দিয়ে যেমন Hamlet নাটকের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তেমনি সীতা ও দ্রৌপদী ব্যতিরেকে ভারতের এই দুই মহাকাব্য সম্ভব হতো না।

রাম ও যুধিষ্ঠির

Our wills and fates do so contrary run, that our devices still are overthrown; our thoughts are ours, their ends none of our own—Shakespeare.

মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাকাব্য মহাভারতের রাম ও যুধিষ্ঠিরের জীবনে সেক্সপীয়ারের এই উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

অযোধ্যার মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের জীবন ও কুরুবংশীয় মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরের জীবন যেন নিয়তি নির্দ্দেশিত।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥

—জীবনও চাইবে না, মরণও নয়—শুধু কালের নির্দ্দেশের পথ চেয়ে থাকবে, যেমন ভৃত্য থাকে প্রভুর নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

উল্লিখিত এই চরিত্র দুটি যেন তেমনি প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কর মত নিয়তির নির্দ্দেশে চলেছিলেন। দুই মহাকাব্যের এই দুই নায়কের জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে কেবল তাঁরাই জর্জরিত নন, পাঠক সমাজও ব্যথাতুব। এই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভাবতবর্ষের দুই অমর মহাকাব্য।

রামায়ণে রাবণ বধের নিমিত্ত যেমন স্বয়ং নারায়ণ, রাজা দশরথের গৃহে তাঁর চার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি যুধিষ্ঠিরও দুর্জন মানবদের বিনাশ করবার জন্য কুন্তীব গর্ভে ধর্মের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই চরিত্রের জন্ম ব্যাপারেও অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

রাম ও যুধিষ্ঠিরের জন্ম কাহিনীর মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। কথিত আছে যে মহারাজ দশরথ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও তাঁর

কোন পুত্র সন্তান লাভ হযনি। অবশেষে পুত্র কামনায় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। অমাত্য সুমন্ত্রর পরামর্শে দশরথ বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদেব জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গর পৌবোহিত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। অনন্তব মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। এ যজ্ঞ অনুষ্ঠানেব সময দেবতাগণ যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় দেবতাবা ব্রহ্মার নিকট গিয়ে বললেন, আপনার আশীর্বাদে লঙ্কাধিপতি রাবণ বলান্বিত হয়ে দেবতাদের পীডন কবছে। সে যাতে বিনষ্ট হয়, তার উপায় উদ্ভাবন করুন। ব্রহ্মা কিছুক্ষণ চিন্তা করে তাঁদেব অভয় দিয়ে বলেন, রাবণ আমার কাছে বর চেয়েছিল—গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হবে। আমিও তথাস্তু বলে সেইরূপ বর দিয়েছি। কিন্তু সে অবজ্ঞা বশে মানুষের নামোল্লেখ কবেনি। সেই মানুষই তাকে বধ কববে। দেবতা ও মুনিঋষিগণ ব্রহ্মার এ বাক্যে প্রীত হলেন।

এই সময় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী জগদীশ্বর বিষ্ণু সেই সভায় উপস্থিত হলেন। দেবতারা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানালেন। তিনি বললেন, তিনি রাজা দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে চার ভাগে নিজেকে বিভক্ত করে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হযে দেবতার অবধ্য রাবণকে সবংশে নিধন করবেন। একথা বলে ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন।

যজ্ঞাগ্নি হতে এক অতুলনীয় মহাবীর্যশালী পুরুষ উত্থিত হযে দশরথকে বললেন, তিনি ব্রহ্মার প্রেরিত, দেবতার তৈরি সন্তানদায়ক পায়স এনেছেন। আপনি এই পায়স আপনাব পত্নীদের খেতে দিন, তাতে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

পায়স পেয়ে পরমানন্দিত দশরথ সেই পায়সের অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্টের অর্ধ কৈকেয়ীকে দিয়ে, শেষাংশ পুনরায় সুমিত্রাকে দিলেন। তিন মহিষী সেই পায়স পরম ভক্তি সহকারে গ্রহণ করে

যথাসময়ে চার পুত্র লাভ করেন। মহিষী কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর ভরত, সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

কথিত আছে রাজা পাণ্ডু একদিন অরণ্যে বিচরণ করবার সময় একটি মৈথুনরত হরিণ মিথুনকে শরবিদ্ধ করেন। আহত হরিণ ভূপতিত হয়ে মানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তিনি কিমিন্দম (কিন্দম) নামক মুনি। তিনি এ মৃগীতে আনন্দের সঙ্গে মৈথুন আচরণে পুরুষার্থ ফল লাভে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তা বিফল হলো। পাণ্ডুরাজ যখন কামমোহিত অবস্থায় মৃগদম্পতিকে বধ করেছেন, তখন তাঁকেও কামমোহিত অবস্থায় মৃত্যু আক্রমণ করবে।

শাপগ্রস্ত পাণ্ডু নিজের দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করে, নানাস্থানে পরিক্রমণ করে অবশেষে তিনি স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীসহ তপস্যায় রত হন। ঐ সময় সেখানে আরও অনেক মুনি ঋষি তপস্যা করছিলেন।

পাণ্ডু যখন শতশৃঙ্গে তপস্যা করছিলেন, তখন তথাকার মুনিঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাবার জন্যে একদিন প্রস্তুত হলেন। কারণ সেখানে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের মহামিলনের এক মহতী সভা হবে। রাজা পাণ্ডুও তাঁদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু সে স্থানের পথ দুর্গম বলে পাণ্ডুর রাণীদ্বয়ের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মুনিরা রাজা পাণ্ডুকে তাঁদের সঙ্গে যেতে নিষেধ করেন।

তখন রাজা পাণ্ডু আক্ষেপ করে বলেন যেহেতু তিনি অপুত্রক অতএব স্বর্গদ্বার দেখা তাঁর অদৃষ্টে হবে না। ঋষিগণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, হে রাজন, আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আপনার দেবতুল্য গুণবান পুত্র লাভ হবে। অতএব আপনি পুত্রের জন্য চেষ্টা করুন।

তাপসগণের বাক্য শুনে পুত্রের মুখ দর্শনের জন্যে পাণ্ডু ব্যাকুল হলেন। কিন্তু চিন্তান্বিত হয়ে ভাবতে থাকেন, কিরূপে তিনি পুত্র

মুখ দর্শন করবেন, যখন তিনি মুনির শাপে নিজে পুত্র লাভে অসমর্থ।

অতঃপর রাজা পাণ্ডু পুত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রাণী কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে কুন্তী এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। অবশেষে রাজার ব্যগ্রতায় কুন্তী বলেন যে কুমারী কালে পিতৃগৃহে দুর্বাসামুনিকে পরিচর্যা করে সন্তুষ্ট করলে, মুনি দুর্বাসা তাঁকে একটি মন্ত্র দিয়ে বলেন যে, সেই মন্ত্রের দ্বারা কুন্তী যে যে দেবতাকে আহ্বান করবেন, সেই সেই দেবতা তাঁর বশীভূত হয়ে তাঁর নিকটে আসবেন। কুন্তীর কামনা থাকুক বা না থাকুক, দেবতাদের কৃপায় তিনি পুত্র লাভ করবেন।

পাণ্ডুরাজা কুন্তীর কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে ধর্মকে আহ্বান করতে অনুরোধ করেন। কুন্তী পাণ্ডুরাজার নির্দ্দেশে দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র জপ করেন। এবং ধর্ম দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে ক্ষেত্রজ সন্তান রূপে লাভ করেন। যুধিষ্ঠিরের জন্ম মুহূর্তে আকাশবাণী হলো—এই পুত্র ধার্মিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী, বিক্রমশীল ও সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।

রামের জন্ম মুহূর্তেও এরূপ দৈববাণী হয়েছিল—

এইকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দশরথ ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥ (আদি)

Uneasy lies the head that wears a crown—Shakespear বা রাজমুকুট দুঃখের আকর। এই সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাম ও যুধিষ্ঠিরের জীবনচরিত।

উভয়েই যদি রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ না করতেন, তবে তাঁদের জীবন এত দুঃখকষ্টের কাহিনীতে পূর্ণ হতো না।

রাবণকে বধ করবার জন্যই যে রামের জন্ম কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার পূর্বাভাষ রামের বাল্যকাল হতেই কবি বার বার দিয়েছেন।

বাল্যকালে একদিন রামলক্ষ্মণ মৃগয়ায় গিয়েছেন। নিশাচর মারীচ মৃগরূপে রামের দৃষ্টি গোচর হল, সেই মৃগের পিছনে—

ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে। (আদি)

বালক রামের শক্তি দেখে :—

রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে।
এতদিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে॥ (আদি)

রাবণ বধের জন্য দেবতাদের প্রস্তুতি বা প্রার্থনা চলেছে বহুকাল হতে :—

এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে॥
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফল-মূলাহার যুদ্ধ করিবে কেমনে॥
মৃণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
খাইতে অমৃত রাম পাশরায় ক্ষুধা॥ (আদি)

সারাদিন মৃগয়াতে পরিশ্রান্ত হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন :—

মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হইল মন। (আদি)

রামের যখন সবে দ্বাদশ বৎসর বয়স (অবশ্য এই বয়স সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে), তখন বিশ্বামিত্র মুনি একদিন মহারাজ দশরথের নিকট যজ্ঞ রক্ষা করবার জন্য রামকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনির এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় পুত্রস্নেহান্ধ দশরথ

যজ্ঞ স্থানে রামকে পাঠানো হতে কোন প্রকারে বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত করতে না পেরে প্রতারণা করে ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাম লক্ষ্মণ বলে তাঁব সঙ্গে যজ্ঞ রক্ষায় পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে দশরথের প্রতারণা ধরা পড়লে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :—

শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে॥
আমার সহিতে রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ॥ (আদি)

বিশ্বামিত্রের ক্রোধে তাঁর নেত্রদ্বয় হতে যে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তদ্দ্বারা অযোধ্যা নগরীর প্রজাদের ঘরবাড়ী দগ্ধ হতে থাকে। প্রজাবা এই সংবাদ রামকে জানালে তিনি :—

মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
... ...
নিরাপরাধীর দণ্ড করা অবিচার॥
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব ধর্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষণ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলা নগর॥ (আদি)

এইভাবে বিশ্বামিত্র মুনির প্রচণ্ড ক্রোধ হতে নির্ভীক কিশোর রাম পিতা দশরথ ও অযোধ্যা নগরীকে রক্ষা করেন।

মহারাজ দশরথ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কবির উপরের আখ্যানটি কাল্পনিক নয় কি? বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে রামের পরিবর্তে ভরতকে পাঠাবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবার মত দুঃসাহস বা ছলনা করবার মত হীন মনোবৃত্তি মহারাজ দশরথে কি সম্ভব?

মুনির সঙ্গে যাত্রার প্রাক্কালে রাম মুনিব অনুমতি নিয়ে মাতার আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে গেলেন :—

শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্বাদ কর।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার॥

প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি॥ (আদি)

এখানে রামের মাতৃভক্তির পরিচয়, আত্মবিশ্বাস নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুনির সঙ্গে বালক রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞ রক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে, বিশ্বামিত্র মুনি অতি তেজ সমন্বিত বলা ও অবলা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

দশরথ নন্দন রামলক্ষ্মণ মুনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে যেতে এক অতি ঘোর অরণ্য দেখে মুনিকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ বন কার? তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঐ বনের বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তাড়কা নাম্নী এক যক্ষ পত্নী ঐ অরণ্য অধিকার করে আছে। এই বহুবলধারিণী তাড়কার মারীচ নামে এক পুত্র আছে। সেও মার মতই সমান দুর্ধর্ষ। তারপর মহর্ষি বলেন যে এই দুরাচাররতা তাড়কা অতি ভয়ঙ্করী হয়েছে এবং চাতুর্বর্ণ্যের হিতেব জন্য তাকে বধ করা কর্ত্তব্য।

রাম ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির নির্দেশে তাড়কাকে বধ করতে রাজি হলেন। কিন্তু তাড়কা নারী। তাই রাম তাকে বধ না করে পঙ্গু করে রাখবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। বিশ্বামিত্র তাড়কাকে অবধ্য মনে না করে তাকে বধ করবার জন্য রামকে নির্দেশ দেন। অতঃপর রাম-লক্ষ্মণ প্রথমে তাড়কা বধ করে তাঁদের অভিযানের সূচনা করেন।

বিশ্বামিত্র মুনি তারকা বধে তুষ্ট হয়ে বহু দিব্যাস্ত্র রামকে দান করেছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁর সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা নিঃশেষে রামকে দান করেছিলেন। বিশ্বামিত্র মুনির প্রদত্ত এই সব মন্ত্র ও অস্ত্র-শিক্ষা রামের পরবর্তী জীবনে প্রভূত উপকার সাধন করেছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বেই বিশ্বামিত্র মুনিব উদ্দেশ্য বুঝতে পেবে মহাবাজ দশরথকে বলেছিলেন :—

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে॥ (আঃ) ২১।২১

—কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসদের বিনাশে সক্ষম। কেবল তোমার পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তোমার পুত্রকে যাঞা করছেন।

যজ্ঞ রক্ষা করতে নিয়ে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্র মুনি রামের দ্বারা অনেকের কল্যাণ সাধন করেন। রামের পদস্পর্শে প্রস্তরীভূত অহল্যার শাপমুক্তি ঘটে। কৃতার্থ কৈবর্তের কাষ্ঠ নৌকা রামের কল্যাণ দৃষ্টিতে স্বর্ণ নৌকায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তারকা রাক্ষসী বধ ইত্যাদি দৈব পরিকল্পিত মহৎ কার্য সাধনের জন্যই যেন বিশ্বামিত্র মুনি বালক রামকে রাজা দশরথের নিকট হতে তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করতে গিয়ে রাম তিন কোটি রাক্ষসকে একা বধ করেন। তারকা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য :—

কোথা গেল রাম কোথা গেল বা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন রে তারকা হন্তা যেই।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই॥ (আদি)

রাম তারকা রাক্ষসী সহ তিন কোটি বধ করলেও, মারীচকে বধ করতে রামের ইচ্ছা হলো না। তাকে বাণের জোরে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। এর হেতু :—

মারীচেরে রক্ষা করে ভাবি দেবগণ।
মারীচে মারিলে নহে সীতার হরণ॥ (আদি)

এখানেও দেখি রাবণ বধের প্রস্তুতি পর্ব। সীতা হরণ না হলে রাবণ বধ সম্ভব নয়। এবং রাবণ বধ না হলে দেবগণও স্বর্গে শান্তিতে বাস করতে পারছেন না। এই কারণে রাম মাতৃহীন মারীচের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তাকে শত যোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

রামের এই অনুকম্পা অহেতুক নয়।

এইভাবে রাক্ষস বধ করে রাম-লক্ষ্মণ মুনিদের যজ্ঞস্থানে রাক্ষসদের সন্ত্রাস দূর করেন।

রামের অমিত শৌর্য বীর্যে, বিনয় স্বভাবে বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণ পরম প্রীত হয়ে রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যবহারে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞদর্শনে গমন করেন। রাজা জনকের গৃহে মহাদেব প্রদত্ত বিশালধনু দেখবার জন্যে রাজকুমারকে মহর্ষিগণ উৎসাহিত করেন। মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞশালায় রামলক্ষ্মণ ও মুনিগণ উপস্থিত হলে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় রূপ ও লাবণ্যবান রাম লক্ষ্মণকে দেখে রাজর্ষি জনক তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন ঐ দুই রূপবান যুবক রাজা দশরথের তনয়।

অতঃপর রাজর্ষি জনক তাঁর হরধনু প্রাপ্তির বিশদ বিবরণ কুমারদ্বয়কে জানিয়ে বলেন, যে এ ধনুতে গুণ যোজনা করবে তাঁর হাতেই তাঁর কন্যা সীতাকে অর্পণ করবেন। রাম অবলীলাক্রমে গুণ যোজনা করে ঐ ধনু আকর্ষণ করলেই ধনুখানি বিকট শব্দে ভেঙ্গে গেল। রাজা জনক পরম আনন্দে রামের হাতে তাঁর অযোনিজা কন্যা সীতাকে অর্পণ করার প্রস্তাব করলেন।

রামের ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় তাঁর জীবন-কোরক উদ্গমন হবার সময় হতেই পাওয়া যায়। রামের হরধনু ভঙ্গ করার পর তাঁকে সীতার পাণি গ্রহণ করতে বলায় তিনি উত্তরে বলেছিলেন:—

চারি ভাই জন্ম লইয়াছি এক দিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি॥ (আদি)

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় বিশ্বামিত্র মুনিই রাম লক্ষ্মণের জন্য সীতা-উর্মিলা ও জনক রাজার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে ভরত ও শত্রুঘ্নর জন্য চাইলেন। জনক রাজা সানন্দে

ইক্ষ্বাকুবংশের এই চার রাজপুত্রের সঙ্গে বিদেহ রাজকুমারীদের বিবাহ দিলেন।

বাল্যকালেই রামের পরাক্রমের ও আত্মবিশ্বাসের আরও পরিচয় পাওয়া যায়। হরধনু ভঙ্গ করে রাম যখন সীতাকে বিয়ে করে পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে রামের সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন :—

আমার গুরুব ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই॥ (আদি)

দশরথ পরশুরামকে অনেক কাকুতি মিনতি করায়, অবশেষে তিনি বলেন :—

জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইল গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥ (আদি)

রাম পরশুরামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেন :—

তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি কিম্বা পাতাল ভুবন॥
... ...
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ বোধ॥ (আদি)

এইখানে রামের সাহস আত্মবিশ্বাস ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পর রাজা দশরথ রামকে রাজপদে অভিষেকের কথা জানালেন। রাম এই শুভ সংবাদ জননী কৌশল্যাকে দিতে গেলেন, সেইখানে লক্ষ্মণের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। তিনি লক্ষ্মণকে বলেন :—

মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির।
তুমি আমি ভিন্ন নহি এই শরীর॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য॥ (অযো)

এখানে রামের নির্মল ভ্রাতৃপ্রেমই কেবল প্রকাশ পায়নি, তাঁর মনের উদারতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রামের অভিষেক উৎসব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করবার রাজা দশরথের অভিলাষে বিধি বাধ সাধলো। মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আযোজন ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ কৈকেয়ীর পুত্রই রাজা হবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতির দ্বারা কেকয়রাজকে তুষ্ট করে মহারাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করেছিলেন। অন্যদিকে দেবাসুর যুদ্ধে দশরথ অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পড়লে কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে রাজা দশরথ তাঁকে দুটো বর দিতে চাইলেন। কৈকেয়ী ভবিষ্যতে প্রয়োজনে বর দুটো চাইবেন বলেছিলেন।

কৈকেয়ী প্রতিশ্রুত সেই দুই বরে ভরতের অযোধ্যার রাজমুকুট লাভ ও দ্বিতীয় বরে বল্কল ধারণ করে চৌদ্দ বছরের জন্য রামের বনবাস প্রার্থনা করেন। দশরথ কৈকেয়ীর এ হেন বর প্রার্থনার কথা শুনে শোকার্ত্ত হযে বিলাপ করতে থাকেন। রাজা দশরথ সুমন্ত্রর দ্বারা রামকে ডেকে পাঠালেন।

রাম কৈকেয়ীর মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং প্রফুল্ল চিত্তে তিনি পিতা ও বিমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে পিতাকে শোকার্ত্ত দেখে বিমাতার নিকট কারণ জিজ্ঞেস করলে, কৈকেয়ী জানালেন, রাজার সত্য পালনের দায়িত্ব রামের উপরই নির্ভর করছে। সুতরাং রাম যদি পিতৃ প্রতিশ্রুতি পালনে প্রস্তুত থাকে তবে কৈকেয়ী তাঁকে দশরথের এই অবস্থার কারণ জানাবেন।

কৈকেয়ীর এইরূপ কথায় রাম ব্যথিত হয়ে বলেন:—

অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞ পতেয়মপি পাবকে ॥
ভক্ষযেযং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ ॥
তদব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্ণাভিভাষতে ॥ (অযো) ১৮।২৮-৩০

—আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি। তীব্র বিষ ভক্ষণ করতে পারি। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি। কারণ ইনি গুরু, পিতা, নৃপ এবং হিতাকাঙ্ক্ষী। অতএব বলুন রাজার কি অভিলাষ? আমি তাই করব। নিশ্চয় জানবেন বাম দুই প্রকার কথা বলে না।

তখন কৈকেয়ীর মুখে রাজা দশরথের প্রতিশ্রুত দুই বরের কথা, এবং কৈকেয়ীব প্রথম বরে ভবতের রাজ্যলাভ ও দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস প্রার্থনাব কথা রামের কাছে ব্যক্ত করেন। কৈকেয়ী অবিলম্বে বনগমনের জন্য রামকে প্রস্তুত হতে বলেন। এই নিষ্ঠুর সংবাদে ব্যথিত রাম বিমাতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে রাজি হযে জিজ্ঞেস করেন, পিতা কেন নিজ মুখে এই কথা বললেন না।

রাম কৈকেয়ীকে বলেছিলেন :

অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।

হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বযং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ॥ (অযো) ১৯।৭

—আমি আপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে সীতা, রাজ্য, প্রাণ অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য হৃষ্ট চিত্তে দান করতে পারি।

রাম সাধারণ মানুষের মত লোভ মোহ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন নন। তিনি মুক্ত পুরুষ, সাক্ষাৎ নারায়ণ। উপরোক্ত উক্তি হতে রামের নিস্পৃহ চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

রাম বনগমনের পূর্বে জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় নিতে গেলে, শোকাতুরা জননী আক্ষেপ করে বলেন :—

স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কানে॥

... ...

মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিযা পোষে।
হেন মাতৃ আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে॥

বাপের বচন রাখ লজ্ঘ মাতৃবাণী।
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥ (অযো)

মাতা কৌশল্যার এরূপ করুণ আকুতি রামের পিতৃভক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করলো।

পিতা হি পরমং তপঃ।

রাম উত্তরে জননীকে বলেছিলেন :—

পিতা অতিশয় মন্যে তোমার দেবতা॥
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত কবিলেন মায়ের মাথায়॥
পিতার আজ্ঞায় অষ্টবক্রের গোবধ।
সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতৃ সত্যতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর॥
পিতৃসত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম বৃথাই জীবন॥
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে।
করিহ তাঁহার সেবা তুমি রাত্রি দিনে॥ (অযো)

রামের বনবাসের খবর শুনে লক্ষ্মণ যখন বিমাতা কৈকেয়ী ও পিতা দশরথের উপর ক্ষুব্ধ হলেন, তখন রাম তাঁকে শান্ত করবার জন্য বার বার বলেন :—

বিমাতাব দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজী॥ (অযো)

পুনরায় তিনি লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে বলেছেন :—

বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দ্দশা॥
যে দিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ মনে॥

দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
দুঃখ সুখ দেখ ভাই ললাটে লিখন ॥ (অযো)

লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্য রাম আরও বললেন, বিমাতা কৈকেয়ী তাঁকে নিজ পুত্রের মতই স্নেহ করতেন।

কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি ত্বযা ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥

(অযো) ২২।১৬

—যদি কৈকেয়ীর এই মনোভাব কৃতান্ত (দৈব) নির্দিষ্ট না হতো, তবে আমাকে ব্যথা দেবার এমন দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁর কিরূপে জন্মাতো?

কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ ॥
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতোহি বিপর্য্যয়ঃ ॥ (অযো)

২২।১৯-২০

—দৈবই যদি কারণ না হতো, তবে সৎ স্বভাবা গুণবতী রাজপুত্রী কিরূপে গ্রাম্য নারীর ন্যায় তাঁর স্বামীর সমক্ষে আমাকে পীডাদায়ক বাক্য বললেন? যা চিন্তার অগোচর, যার প্রভাব কোন প্রাণীতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব, এবং দৈবের জন্যই আমাতে ও কৈকেয়ীতে এইরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়েছে।

রাম কৈকেয়ীর দৃষ্টান্ত দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন কর্মফল ভিন্ন যার সম্বন্ধে আমাদেব কোন জ্ঞান নেই, সেই দৈবেব সঙ্গে কে যুদ্ধ করবে? রাম এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণকে আরও বলেছিলেন :—

ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাসি দৈবং হি তথা প্রভাবম্ ॥ (অযো) ২২।৩০

—ভ্রাতঃ আমার রাজ্য লাভে এইরূপ বিঘ্ন হওয়ায় কনিষ্ঠ মাতা

কৈকেয়ী ও পিতা দশরথকে দোষী বলে আশঙ্কা করো না। যেহেতু তাঁরা উভয়েই দৈব নিযুক্ত হয়ে এই কার্য করেছেন। তুমি তো জানতে পেরেছো দৈব কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন। এইরূপ ঘটনা বিপর্যয়ের জন্য রাম দৈবকেই দায়ী করেন।

এই ক্ষেত্রে রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়েই অদৃষ্টবাদী।

That which is not allotted the hand cannot reach; and what is allotted you will find wherever you may be—Saadi এই উক্তিটি রাম-ভরত ও যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনের জীবনে কি সুন্দব ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

লক্ষ্মণ ও সীতাব সঙ্গে রাম বনগমনের পূর্বে পিতার নিকট বিদায় নিতে গেলে দশবথও তাঁর সঙ্গে বনগমন করবার অভিলাষ প্রকাশ করলে, রাম তাঁকে বিরত করেন। পুনরায় দশরথ তাঁকে অন্ততঃ একটি রাত্রি তাঁব সঙ্গে থেকে যেতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন :—

এক রাত্রি লাগি কেন সত্য-উলঙ্ঘন ॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্বন্ধ।
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥
... ...
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার ॥ (অযো)

এই প্রসঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণ আরও করুণ ও হৃদয়গ্রাহী। রাম পিতৃসত্য পালন সম্বন্ধে বলেছেন—

তদদ্য নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্বকামান বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্
বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা ॥ (অযো) ৩৪।৫৮

—দশরথ এক রাত্রি বাস করে বনগমন করতে বললে প্রত্যুত্তরে রাম বলেন, এই অখণ্ড রাজ্য চাই না, সর্বকাম্য এই পৃথিবীও চাই না। এমন কি প্রিয়তমা জানকীকেও চাই না। আমি সর্বান্তঃকরণে এটাই কামনা করি যে আপনার ব্রত বা প্রতিজ্ঞা সত্য হোক।

পিতৃসত্য পালনে রামের এই যে অসাধারণ নিষ্ঠা তা কেবল রাম চরিত্রেই সম্ভব। এমন পিতৃভক্তি বিরল। সন্তানের প্রতি পিতার অবিচারের প্রশ্ন না তুলে, কোন ক্ষোভ প্রকাশ না করে, যে সন্তান রাজসুখ ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে বিপদ সঙ্কুল অরণ্যে দীর্ঘকালের জন্য এভাবে বনগমনে রাজী হয়, এমন চরিত্র দুলর্ভ, অতুলনীয়।

রাজা দশবথ রাম বনগমনের সময় তাঁর সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, সৈন্য সামন্ত ও ধনরত্ন দিতে চাইলে রাম পিতাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন :—

রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জাবোওমম্। (অযো) ৩৭।৩

—শ্রেষ্ঠ হস্তীকে দান করার পব হস্তী বন্ধনেব রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের কি সার্থকতা আছে?

রাজা দশরথের এই অভিলাষ এরূপভাবে প্রত্যাখানে, ধন ঐশ্বর্যের প্রতি রামের একান্ত নির্লিপ্ততা বা অনাসক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যৎ রাজা, রাজাব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বিমাতার নির্দেশে দীন বেশেই চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমনে বদ্ধ পরিকব।

যখন রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়চিত্ত তখন অনুজ লক্ষ্মণ ও সহধর্মিনী সীতা তাঁব অনুগমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি উভয়কে নানা প্রকাবে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সীতা বা লক্ষ্মণ কেহই তাঁর নিষেধ মানতে রাজি হলেন না। বরং উভযেই রামের সঙ্গে অনুগমনে দৃঢ় সংকল্প। অগত্যা রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে তাঁর বনগমনের সঙ্গী রূপে অনুগমনের জন্য পিতা দশরথের অনুমতি প্রার্থনা কবেন। দশবথ করুণ বিলাপ করতে করতে সীতা ও লক্ষ্মণকে রামের অনুগমন করতে অনুমতি দিলেন।

জননী কৌশল্যার প্রতিও রামের অচলা ভক্তি ও আকর্ষণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বনগমনের প্রাক্কালে করুণ কণ্ঠে রাম দশরথকে তাঁর মাতা কৌশল্যার তত্ত্বাবধান করতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন—

মায়েরে স'পেন রাম নৃপতি পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালিহ মাতায়॥ (অযো)

বাল্মীকি রামায়ণে বনগমনের পূর্বে রাম দশরথকে বলেছেন, মহারাজ, আমার জননী যশস্বিনী কৌশল্যা দেবী বৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁর স্বভাব সঙ্কীর্ণ নয়। আমার বনগমন বার্ত্তা শুনেও তিনি আপনার নিন্দা করছেন না। আমার জননী কখনও কোন দুঃখ পাননি, এখন আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন। অতএব আপনি তাঁকে যথোচিত মর্যাদা দান করুন, যাতে পুত্রশোক তাঁকে স্পর্শ না করে। তিনি আমার জন্য চিন্তা করবেন। তিনি আপনার উপব নির্ভরশীল। আপনি আমার জননীর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবেন, যাতে আমার বনগমনে পুত্রশোকে কাতরা মাতার প্রাণ বিয়োগ না ঘটে।

বন গমনের পূর্বে বাম দশরথের আহ্বানে সমবেত রাজা দশরথের তিনশ পঞ্চাশ জন পত্নীকে প্রণাম করে, তাঁর অজ্ঞাতে তাঁদের কারোর কাছে কোন প্রকার অপবাধ করে থাকলে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

অন্যদিকে বিদায়কালে রাম জননী কৌশল্যাকে প্রণাম করে বলেন :—

অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম।
ক্ষয়োহপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ (অযো) ৩৯।৩৪

—মা আমার বনবাসে দুঃখিত হয়ে আপনি পিতাকে কুদৃষ্টিতে দেখবেন না। বনবাসের সময শীঘ্রই উত্তীর্ণ হবে। নিদ্রা হতে উঠেই আপনি দেখবেন বন্ধু পবিবৃত হয়ে আমি ফিরেছি।

রাম কেবল পিতাকে তাঁর অবর্ত্তমানে মাতাব প্রতি কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ কবিয়ে দেননি, জননীকেও পিতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক

করে দিলেন।

বিদায়কালে শোকাকুল অযোধ্যবাসীর উদ্দেশ্যে রাম বলেছিলেন, আমার প্রতি তোমরা যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি দেখিয়েছ, ভরতের প্রতিও সেইরূপ দেখাবে। ভরত ধার্মিক, জ্ঞানী, কোমল স্বভাব ও শক্তিশালী। ভরত বয়সে প্রবীণ না হলেও জ্ঞানে বিশেষভাবে প্রবীণ। বলবান ও বহু সদ্ গুণান্বিত হয়েও ভরত অতি কোমল স্বভাব। তিনি তোমাদের উপযুক্ত রাজা হবেন। ভরত রাজোচিত সর্বগুণ-সম্পন্ন। আমাপেক্ষা অধিক গুণ তাঁর আছে। তিনিই যুবরাজ হবার যোগ্য। মহারাজ দশরথ যাতে আমার শোকে অভিভূত না হয়, তোমরা সেইরূপ ব্যবহার করবে।

যে ভ্রাতার জন্য রাম রাজ্যসুখ বিসর্জন দিয়ে বল্কল পরিধান করে বনগমন করছেন, সেই ভ্রাতার গুণগান এবং তাঁর প্রতি প্রজাদের স্নেহ প্রীতি যাচ্না বা যে পিতার জন্য বিনা দোষে তিনি স্বাপদ সঙ্কুল বনে নানা বিপদেব মুখে নানা ক্লেশ ভোগ করতে চলেছেন তাঁর প্রতি প্রজাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার প্রয়াসে রামের লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা রামকে অযোধ্যায় ফিরাতে ব্যর্থকাম হযে পুর-বাসিদের সঙ্গে পদব্রজে তাঁর অনুগমন করেন। এই ঘটনা রামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

পুরাবাসিদের কোন প্রকারে তাঁর অনুগমনে নিবৃত্ত কবতে না পেরে পুরবাসিগণ যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পথিমধ্যে নিদ্রামগ্ন, তখন তিনি লক্ষ্মণ, সীতাসহ সুমন্ত্রকে নিয়ে যাত্রা করেন। পুরবাসিদের বিভ্রান্ত করবার জন্য উত্তরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হযে পরে দক্ষিণ দিকে যাবার সুমন্ত্রকে নির্দেশ দেন।

নিষাধিপতি গুহকের আতিথেয় গ্রহণ এবং তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করে উদারচিত্ত রাম পৃথিবীতে এক শাশ্বত সত্য স্থাপন করেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

সুমন্ত্রকে বিদায় দেবার সময় রাম বলেন—

ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্তসে।
তথা মাতৃষু বর্তেথাঃ সর্বাস্বেবাবিশেষতঃ॥
যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চ বিশেষতঃ।
তথৈব দেবী কৌশল্যা মম মাতা বিশেষতঃ॥ (অযো) ৫২।৩৪-৩৫

—তুমি ভরতকে আমার এই বক্তব্য বলো—তুমি রাজা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, কোনরকম বিশেষ না করে সমস্ত মাতৃগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করবে, কৈকেয়ী যেমন তোমার মাতা, সুমিত্রাও সেইরূপ তোমার মাতা, আর আমার জননী কৌশল্যাও তেমনি তোমার মা।

রাম সুমন্ত্রকে আরও বলেন,—মহারাজ দশরথ যেন শোকে কাতর হয়ে কষ্ট না পান সে বিষয়ে অবহিত থেকো। মহারাজ দশরথ ও মাতাদের বলো বনবাসান্তে তাঁরা আমাদের পুনঃ পুনঃ দেখতে পাবেন।

তিনদিন পর রাম সুমন্ত্রকে রথ সহ বিদায় দেবার প্রাক্কালে বলেন ঃ—

প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরত আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে॥
... ...
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করো আর॥
রাত্রিদিন সেবা যেন করেন পিতার।
... ...
পরিহার জানাইবে কৈকেয়ী গোচর।
তাঁর কিছু দোষ নাই কর্ম্মফল মোর॥
পিতার চরণে জানাইহ সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥ (অযো)

ভ্রাতা ভরত, মাতা, বিমাতা, পিতা সকলকেই স্মরণ করে রাম প্রত্যেকের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্যের কথা প্রকাশ করলেন। বিনা দোষে রাম বনে এসেছেন এজন্য কৈকেয়ীর প্রতি কোনরকম বিদ্বেষ ভাব কেউ যেন পোষণ না করে, নিজের অদৃষ্টকে এজন্য দায়ী করে তাঁর প্রতি যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

বনবাসের তৃতীয় দিবসের মধ্যে তাঁরা একমাত্র জল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেননি। বৎসদেশে পৌঁছে তাঁরা বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু—এই চার প্রকার পশু বধ করে সেই মাংস দ্বারা তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। গুহকের সাহায্যে রাম গঙ্গা নদী পার হলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে রামের মধ্যে কৈকেয়ীর প্রতি ভিন্নমুখী মনোভাব স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। বনবাসের তৃতীয় দিবসে তিনি আক্ষেপ করে লক্ষ্মণকে বলেছেন :—

সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্॥ (অযো) ৩১।১৩

—অশ্বপতি কন্যা কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য পেয়ে দুঃখিনী সপত্নীদের প্রতি শোভনীয় ব্যবহার করবেন না।

সা হি দেবী মহারাজং কৈকেয়ী রাজ্যকারণাৎ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্॥ (অযো) ৫৩।৩৭

—কৈকেয়ী ভরতকে আগত দেখে রাজ্য লাভের জন্য মহারাজ দশরথের প্রাণহানি না করেন, এই আশঙ্কা করি।

অন্যত্র রাম লক্ষ্মণকে বলছেন :—

মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
কৈকেয়ী সৌম্যসংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ॥
অপীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে॥ (অযো) ৫৩।১৪-১৫

—আমি মনে করি যে দশরথের বিনাশের জন্য, আমার নির্বাসনের

জন্য ও ভরতের রাজ্য প্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে এসেছেন। আমার আশঙ্কা এই যে সৌভাগ্য মদে মত্ত হয়ে কৈকেয়ী আমার জন্যে এক্ষণে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে হয়ত কষ্ট দিচ্ছেন।

অন্যত্র কৈকেয়ী সম্বন্ধে রামের মনে অধিকতর হীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে:—

ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।

পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্॥ (অযো) ৫৩।১৮

—নীচকার্যরতা কৈকেয়ী বিদ্বেষবশতঃ অন্যায়কার্য করতে পারেন, এমন কি তিনি তোমার মাতাকে ও আমার মাতাকে বিষও দিতে পারেন।

রাম যে বিপুল শক্তির অধিকারী তা প্রকাশ করতেও তিনি কার্পণ্য করেননি। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ক্রুদ্ধ হলে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে পারেন। কিন্তু ধর্ম ভয়ে ভীত তিনি তা করবেন না।

উপরোক্ত কথোপকথনের সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় সজল দেখা যায়। তিনি স্বয়ং নারায়ণ হলেও সাধারণ মানুষের মত শোক, ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা, মান, অভিমান প্রভৃতি ভাবপ্রবণতা তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করতো।

বনবাসের চতুর্থ দিনে তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন ও তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁদের সেই স্থানেই বাস করতে বলেন। কিন্তু সেই স্থান অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, অযোধ্যাবাসীরা প্রায়ই এই আশ্রমে আসতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি মুনির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

ভরদ্বাজ মুনির পরামর্শে তাঁরা সেখান হতে পঞ্চম দিবসে কাঠের ভেলায় যমুনার নিকটবর্ত্তী চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন। সেই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের নির্বাসনের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল।

বনবাসের ষষ্ঠ দিবসে রাম লক্ষ্মণ সীতাসহ বাল্মীকি আশ্রমে গিয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করেন। মুনি আনন্দিত হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।

এইস্থানে বহুদিন বাস করার সম্ভাবনা থাকায় তিনি লক্ষ্মণকে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ কবতে বলেন, এবং বাস্তু শান্তির ব্যবস্থা করতে বলেন। লক্ষ্মণ কাঠ সংগ্রহ করে এক মনোরম পর্ণ কুটীর প্রস্তুত করলেন।

লক্ষ্মণ মৃগ বধ করে সেই মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করে রক্ত শূন্য করে রামকে দিলেন। রাম স্নান করে মন্ত্র পাঠ ও জপ করে যথাবিধি হোম, দেবপূজা ও বাস্তু শান্তির পর শুভমুহূর্ত্তে গৃহে প্রবেশ করলেন।

অরণ্যে থাকাকালীন তাঁরা ফলমূল, মধু ও মৃগয়ালব্ধ মৃগমাংস আহার করতেন। অগ্নিদগ্ধ মাংসই তাঁরা ভক্ষণ করতেন।

অযোধ্যা ত্যাগের পাঁচ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর একদিন গগনস্পর্শী ধূলি উত্থিত হতে দেখে এবং জন মানবের কোলাহল শ্রবণ ক'রে রাম লক্ষ্মণকে নিকটস্থ শাল বৃক্ষে উঠে কারণ নির্ণয় করতে বলেন। লক্ষ্মণ হাতী, অশ্ব, ধ্বজাযুক্ত রথ দেখে অনুমান করেন যে ভরত তাঁদের বধ করতে আসছেন। তাই লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভরতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় রাম লক্ষ্মণকে বলেন, ভরত কেন তাঁদের বধ করবে? হয়ত সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে দুঃখিত চিত্তে ভরত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে। তিনি আরও বলেন, হে সুমিত্রানন্দন, আপৎকালে পুত্রেরা পিতাকে বা ভ্রাতা প্রাণাধিক ভ্রাতাকে কি হত্যা করতে পারে? তবে—

যদি রাজ্যস্য হেতোস্তমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমাস্মৈ প্রদীয়তাম্॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে॥ (অযো) ৯৭।১৭-১৮

—যদি রাজ্যের জন্যই তুমি এইরূপ বলে থাক, তাহলে ভরতের সঙ্গে দেখা হলেই বলবো যে লক্ষ্মণকে রাজ্য দাও। লক্ষ্মণ, আমি এই কথা বললে ভরত নিশ্চয়ই ইহাতে সম্মত হবে।

লক্ষ্মণের প্রতি রামের এই ব্যঙ্গোক্তি রামের পক্ষে শোভনীয় হয়নি। তিনি লক্ষ্মণের সন্দেহ নিরসনের জন্য যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঝাতে পারতেন। যে ভ্রাতা তাঁরই জন্য সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে বনে তাঁর অনুগমন করেছেন, তাঁর সামান্য একটি উক্তির জন্য তাঁর প্রতি এমন কঠিন ব্যঙ্গ বামেব পক্ষে কি উচিত হয়েছিল ?

জটাধারী কৃশ বিবর্ণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখে রাম তাঁদের আলিঙ্গন কবে তাঁদের বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পিতার ও অযোধ্যার সকলের কুশল জিজ্ঞাসার পর, রাম তাঁকে রাজনৈতিক ব্যাপারে বহু কথা বলেন। ভরত রামকে জানালেন যে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে কাতর হয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন। এ সংবাদে রাম সংজ্ঞা হারালেন। লক্ষ্মণ ও সীতা শোকে কাতর হন। এ সময়ে বশিষ্ঠ সমভিব্যবহারে জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা রামের সঙ্গে মিলিত হন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তাঁদের প্রণাম করলেন।

পিতৃ বিয়োগের বার্তা শ্রবণ করে শোকাতুর রাম ইঙ্গুদীপিণ্ড দ্বারা পিতৃ তর্পণ করেন।

ভরত কৈকেয়ীব নিন্দা করে তাঁকে (রামকে) অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করে সিংহাসন গ্রহণ করতে বললে, রাম তাতে অসম্মতি জানিযে বলেন—আমি তোমাব অণুমাত্রও দোষ দেখছি না। তুমি বাল্য চপলতা বশতঃ জননীর নিন্দা করতে পার না।

নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতবতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥ (অযো) ১০৫-১৫

—জীব স্বভাবতই পরাধীন। সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করতে পারে না। সর্বগ্রাসী কাল তাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা পরিচালিত করছে।

এ প্রসঙ্গে রাম ভরতকে নানা শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

বিবাহের পূর্বে পিতা দশরথ কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্যদানেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভরতের মাতামহের নিকট হতে তাঁর কন্যাকে পত্নী রূপে লাভ করে ছিলেন—এ কথা রাম ভরতকে জানালেন। তাছাড়া জননী কৈকেয়ীর নিকট পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি বনে এসেছেন তা জানালেন। অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজসিংহাসন গ্রহণ করার অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করে, রাম বলেন যে পিতা দশরথের কাছে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, কোন কিছুর বিনিময়ে. তিনি সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন না।

এ কাবণে তাঁর মনে যে কোন প্রকার ক্ষোভ নেই তা প্রমাণিত হয়, যখন তিনি উপহাসচ্ছলে ভরতকে বলেছিলেন ঃ—

ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নবাণাং।

বন্যানামহংপি রাজরাণ্মৃগানাম্॥ (অযো) ১০৭।১৭

—ভরত, তুমি স্বয়ং মানুষের রাজা হও, বন্য মৃগদের আমি একচ্ছত্র রাজা হই। আনন্দিত মনে তুমি শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং আমিও দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কবি।

বশিষ্ঠ মুনি, অযোধ্যাবাসী অন্যান্য মুনি ঋষিরা বা ভবত কোন প্রকারেই রামকে তাঁব বনবাস সিদ্ধান্ত হতে বিচলিত করতে না পারায় অবশেষে ভরত ভূমিতে কুশ বিছিয়ে ধর্ণা দিতে বসলেন।

ভবতের এই ধর্ণা বা ঘেরাও হতে এটাই প্রতীয়মান হয়, বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ণা বা ঘেরাও এর হিড়িক পড়েছে, ত্রেতা যুগে ভরতই তার সূত্রপাত করেন। রাম ভরতকে জানালেন এইরূপ ধর্ণা দেওয়া ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিহিত, ক্ষত্রিয়ের জন্য নয। এই প্রকারে রাম ভরতকে ধর্ণা হতে নিবৃত্ত কবেন। অতঃপর ভবত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য চালাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাম তাতেও বাধা দেন। কেন না এ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁর পক্ষে কপটতা করা হবে।

রাম ভরতকে বিদায় দেবার সময় বলেন :—

মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মাং রোষং কুরু তাং প্রতি।

(অযো) ১১২।২৭

—তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করো, তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর না।

যে জননী কৈকেয়ীর ভয়ে রাম এতকাল ভীত ছিলেন, এমন কি তিনি কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারেন এমন সন্দেহও করেছিলেন, সেই জননী কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের আক্রোশ প্রকাশ পাওয়ায়, তিনি কৈকেয়ীর জন্যই সমধিক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই জন্য তিনি কৈকেয়ীর সম্বন্ধে ভরতকে সতর্ক করে দিলেন।

ভরত কোন প্রকাবেই রামকে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত করতে না পারায় অবশেষে বামের পাদুকাদ্বয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে চতুর্দ্দশ বৎসর বামেব প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ পর রামকে দেখতে না পেলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন বলে রাম সমীপে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

ভরতের প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাম চিত্রকূটের বাস ত্যাগ কবে অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করেন। সেইখানে অত্রি মুনি ও তাঁর স্ত্রী অনুসূয়া তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। অত্রি মুনির আশ্রমে মুনি ও তাঁর পত্নীব নিবিড় স্নেহের আশ্রয়ে রাত্রি যাপন করে, পরদিন রাম অন্য অবণ্যে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন মুনিরা অরণ্যে রাক্ষসদের উপদ্রবের কথা তাঁকে জানিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করেন।

ভরতের প্রতি রামের উক্তি—তিনি অরণ্যেব একচ্ছত্র রাজা—এই উক্তিটি দ্ব্যর্থ বোধক। যথার্থই বাম অরণ্যেব রাজা হয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে বহু মুনিঋষি এসে বললেন, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান, পৃথিবীর বক্ষক। তোমার যশ ও বিক্রম ত্রিলোক খ্যাত।

এই অরণ্যে বহু বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁরা সর্বদা রাক্ষসদের দ্বারা নিহত হচ্ছেন। তুমি তাঁদের শব পম্পা, মন্দাকিনী তীরে অবলোকন করবে। চিত্রকূটে রাক্ষসরা অত্যন্ত অত্যাচার করছে। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না, সেইজন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

উত্তরে রাম বললেন ঃ—

পিতুস্তু নির্দ্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ॥

ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া।

তস্য মেঽহং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ ॥ (অরণ্য) ৬।২৩-২৪

—পিতাব নির্দেশে আমি এই বনে প্রবেশ কবেছি। আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি সাধনের জন্য বনে প্রেরিত হয়েছি। অতএব আপনাদের সেবা করবার সুযোগ লাভ কবে আমার এই বনবাস সার্থক হবে।

সীতা রামকে বলেছিলেন ঃ—

ক্ষত্রিয়াণাং তু বীবাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।

... ...

পুনর্গতা ত্বযোধ্যাযাং ক্ষত্রধর্ম চবিষ্যসি (অরণ্য) ৯।২৬-২৮

—ক্ষত্রিয় বীবদেব কর্ত্তব্য বনবাসী তপস্বীদের বিপন্ন হলে রক্ষা করা...তুমি অযোধ্যায ফিরে গিয়ে ক্ষাত্রধর্ম চর্চা কব।

ঋষিদের বক্ষাব নিমিত্ত অকারণে রাক্ষসবধে রামের অঙ্গীকার সীতা সমর্থন করেননি। অবণ্যবাসী রামেব পক্ষে এই হিংসা পরিত্যজ্য—এ সত্য স্মবণ কবিয়ে সীতা স্বামীকে বলেছিলেন—তপোবনে বাস কবে তপোবনেব ধর্ম অবশ্য তাঁব (বামের) পালনীয়।

প্রত্যুত্তবে বাম সীতাকে বলেছিলেন দণ্ডকাবণ্যের মুনিবা আর্ত্ত হযে তাঁর শবণাপন্ন হযেছেন, তিনিও তাঁদেব রক্ষাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আমি সর্বদা সত্যনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ ও তোমাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণদের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা লঙ্ঘন আমাব

অসাধ্য। সত্যের জন্য তিনি সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন।

এই সঙ্কল্পের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে অরণ্যে তপস্বীর চীর বল্কল ধারণ করে বাস করলেও, ক্ষাত্র ধর্ম তিনি ত্যাগ করেননি। পরন্তু অরণ্যবাসীদের রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে দ্বিধা করেননি। সুতরাং পরোক্ষে তিনি যথার্থই বনের রাজধিরাজ হয়ে রাজধর্ম পালন করেছিলেন।

পরদিন সকালে মুনিগণের নিকট হতে বিদায় নিয়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই স্থানে তাঁরা এক নরখাদক রাক্ষসের দেখা পেলেন। সেই রাক্ষস ভীষণ শব্দে আচম্বিতে সীতাকে ক্রোড়ে তুলে নিল। এবং বলল এই সুন্দরী আমার ভার্যা হবে। আর আমি তোমাদের রক্তপান করবো। রাক্ষস সীতাকে কোলে নিয়েছে দেখে রামের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলে কৈকেয়ীকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। বীর পরাক্রম রামের এই করুণ অবস্থা দেখে লক্ষ্মণ বললেন, শরাঘাতে আমি এই রাক্ষসকে বধ করবো। তখন বিরাধ রাক্ষস রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে, রাম আত্ম পরিচয় দিয়ে শরাঘাতে ঐ রাক্ষসকে বধ করবার চেষ্টা করেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রামের প্রতীতি জন্মায় যে ঐ রাক্ষস তপঃসিদ্ধ। অতএব অস্ত্রাঘাত নিষ্ফল। গর্তে পুতে তাকে মারতে হবে। তখন বিরাধ রাক্ষস আত্মপরিচয় দিয়ে বলে যে, যেহেতু রাম তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছে, সেইজন্য সে শাপমুক্ত হয়েছে। বিরাধ রাক্ষস রামকে মুনি শরভঙ্গের কাছে যেতে বলেন, তাতে তাঁর মঙ্গল হবে। রাম লক্ষ্মণ এক প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে ঐ রাক্ষসের দেহ সমাহিত করেন।

বিরাধ রাক্ষসের নির্দেশ মত রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন। তাঁরা রথোপরি অপেক্ষমাণ এক দিব্য পুরুষকে দেখতে পান, এবং জানলেন যে ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষ স্বয়ং

ইন্দ্র। ইন্দ্রের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলে মুনিপ্রবর বলেন যে ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন। শরভঙ্গ মুনি রামের দর্শনার্থে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রামকে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যেতে নির্দেশ দেন। এবং নিজে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে মুক্তি লাভ করেন।

শরভঙ্গ মুনিব নির্দেশে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গেলেন। মুনি পরম সমাদবে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। সেই আশ্রমে পরম সুখে এক রাত্রি যাপন করে, রাম পুণ্যবান মুনি ঋষিদের দর্শনের জন্য দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। সুতীক্ষ্ণ মুনিও রামকে দর্শন করে দেহত্যাগ করবেন বলে রামের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন।

বিভিন্ন আশ্রম পর্যটন করে, দশ বৎসর অতিবাহিত কবে, তাঁরা অগস্ত্য মুনির আশ্রম দর্শন করবার অভিলাষে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গেলেন। অগস্ত্য মুনি রামকে বহু অস্ত্র দান করেন, যা পরবর্ত্তী জীবনে বামেব প্রভূত উপকার সাধন কবেছিল। অগস্ত্য মুনির কাছে রাম এমন একটি স্থানের সন্ধান করেন, যেখানে জল অনায়াসলভ্য এবং যেখানে বহু কানন আছে।

অগস্ত্য মুনির আশ্রম ত্যাগ করে তাঁরা পঞ্চবটী বনে আসেন। পথে মহাকায় গৃধ্র জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি দশরথ সখা বলে আত্মপরিচয় দেন, এবং পঞ্চবটীবনে বাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে সীতাকে রক্ষা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বামের বনে আগমনে অনেকেই উপকৃত হয়েছিল। শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব তুম্বুরু বিরাধ রাক্ষস হয়ে রাক্ষস বংশে জন্ম গ্রহণ কবে, এবং রামের দ্বাবা হত হযে শাপমুক্ত হযে পুনরায গন্ধর্ব দেহ লাভ কবে। গৌতম বংশীয় মহর্ষি শবভঙ্গ মুনি বামকে দর্শন করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিযে মুক্তি পান। সুতীক্ষ্ণ রামকে দর্শন করে দেহত্যাগ করবেন বলে রামের জন্য অধীর প্রতীক্ষায ছিলেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেখে মনে হয়, কেবলমাত্র রাবণ বধের জন্যই রামের জন্ম হয়নি, এইসব শাপভ্রষ্টদের শাপমুক্ত করবার জন্যও তাঁকে মর্ত্যে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এরূপে মুনি ঋষিব বিভিন্ন আশ্রম পর্যটন করে, কোনও আশ্রমে কয়েকদিন, কোথাও বা কয়েক মাস, কোথাও বা বৎসরেক কাল বাস কবেন। এবং সর্বত্র মুনি ঋষিদের কাছ থেকে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রাপ্ত হন। এইভাবে পরম শান্তিতে তাঁর চৌদ্দবৎসর বনবাসের দশ বৎসর কাল কেটে যায়। তাঁর সহধর্মিনী সীতা এবং ভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ রামের স্বাচ্ছ্যন্দ বিধানে সতত জাগ্রত থাকতেন। যুধিষ্ঠিরের বনবাস জীবন ও বামচন্দ্রের বনবাস জীবনে এক প্রকাণ্ড পার্থক্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

যুধিষ্ঠিরের বনবাস জীবন দুঃখকণ্টকে পরিপূর্ণ। তারই কৃত-কর্মের জন্য তাঁর নির্দোষ ভাইগণ ও নিরাপরাধী স্ত্রীকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করতে হয়। ফলে সময় সময় যুধিষ্ঠিরেব বিরুদ্ধে তাঁদের অনুযোগের গুঞ্জন পাঠকগণ শুনেছেন। এরূপ বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী।

অবণ্যকাণ্ডে রাম-লক্ষ্মণ বহু রাক্ষস বধ কবেন। বহু মুনি ঋষির সংস্রব ও সঙ্গলাভ করেছেন। তাঁদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, কোন্ বন বা কোন্ আশ্রম তাঁদের বাসের পক্ষে সুখের ও নিরাপদ হবে। যখন শরভঙ্গ রামকে অনুরোধ করে বলেন যে তিনি বহুলোক আয়ত্ত করেছেন। রাম যেন তাঁর অর্জিত সেই লোক সমুহ গ্রহণ করেন।

উত্তবে রাম বলেন—

অহমেবাহবিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে।

আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে॥ (অব) ৫।৩৪

—মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি নিজে আমাব তপঃ প্রভাবে সমস্ত লোক অর্জন কববো। এখন আপনি এ বন মধ্যে আমার বাসোপযোগী একটি স্থান

বলে দিন।

বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের যত মুনি দর্শন লাভ ঘটেছে, তিনি কেবল তাঁদের নানা প্রশ্নই করে গেছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে সুষ্ঠুভাবে তাঁরা বনবাসব্রত উদ্‌যাপন করতে পারবেন।

পঞ্চবটীতে থাকাকালীন লক্ষ্মণ ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন,—প্রবাদ আছে সন্তান মাতৃ স্বভাব পায়। ভরত তার ব্যতিক্রম। রাজা দশরথ যাঁর স্বামী ভরত যাঁর পুত্র, সেই কৈকেয়ী কি করে ক্রূরমতি হলেন?

প্রত্যুত্তরে রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন :—

ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।

তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু॥ (অরণ্য) ১৬।৩৭

—কোনদিন সেই মধ্যমা জননীর (অর্থাৎ কৈকেয়ীর) নিন্দা করা উচিত নয়। যদি কোন কথা বলতে হয়, তবে তুমি ইক্ষ্বাকুকুলনাথ, ভরতের কথা বল।

রামের লক্ষ্মণকে এইভাবে ভ্রুকুটি করা কি উচিত? যখন তিনি নিজেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে বার বার কৈকেয়ীর সমালোচনা করতে পরাঙ্মুখ হননি।

পঞ্চবটী বনে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সুখে কালাতিপাত করছিলেন। হেমন্তের এক সুন্দর প্রভাতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় যখন ব্যাপৃত, তখন এক রাক্ষসী বিচরণ করতে করতে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলো। এই রাক্ষসী রাক্ষস-রাজ রাবণের ভগ্নি শূর্পনখা। রাক্ষসী আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলে, রাজা রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ তার ভাই। খর ও দূষণও তার অন্য ভ্রাতৃদ্বয়। রামকে লক্ষ্য করে রাক্ষসী বলে, 'আমি তোমাকে দেখে মোহিত। তুমি আমাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারবে।' সঙ্গে সঙ্গে শূর্পণখা সীতা ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করবে বলে রামকে ভয় দেখালো।

স্মিত বদনে রাম সীতাকে দেখিয়ে বলেন—ইনি আমার স্ত্রী। উপহাসচ্ছলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে বলেন—এই প্রিয়দর্শন চরিত্রবান যুবক অকৃতদার এবং তোমার উপযুক্ত। তুমি তাঁর ভজনা কর।

রাম যখন শূর্পণখাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সে লক্ষ্মণকে তার প্রেম নিবেদন করে। লক্ষ্মণও তাকে উপহাস করে বলেন, তুমি রামেরেই কনিষ্ঠা পত্নী হও। শূর্পণখা রামকে পাবার উদ্দেশ্যে সীতার দিকে ছুটে গেল। সীতার ভয় বিহ্বল অবস্থা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলেন, এই রাক্ষসীকে বিকৃতাঙ্গ করে দাও, বধ করো না। রামের আদেশে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করে দিলেন।

নাসাকর্ণ ছিন্ন অবস্থায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে রাক্ষসী শূর্পণখা জনস্থান নামক বনে বহু রাক্ষস পরিবৃত তার ভ্রাতা খরের নিকটে রক্তাক্ত দেহে গিয়ে অচেতন প্রায় অবস্থায় ভূতলে পতিত হলো। সে খরের নিকট তার নাসাকর্ণ ছেদনের সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করলো।

শূর্পণখার দুর্দশার বৃত্তান্ত শ্রবণ করে খর অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বধ করবার জন্য চতুর্দ্দশ রাক্ষস সৈন্য প্রেরণ করে। রাম ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস সৈন্যকে অনায়াসে বধ করেন। পুনরায় শূর্পণখা খরের নিকট এসে রামের অপরিমিত শৌর্য বীর্যের কথা জানিয়ে খরকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে উত্তেজিত করে। এক বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে খর ও দূষণ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হলো।

মহাভয়ঙ্কর ও অশুভজনক নানা উৎপাত লক্ষ্য করে রাম লক্ষ্মণকে সীতাকে নিয়ে কোন দুর্গম পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে অনুরোধ করেন। কারণ তিনি নিজেই রাক্ষসকুলকে নিধন করবেন। অজস্র সৈন্যসহ দূষণ রামের হাতে নিহত হলো। তারপর—

গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে বাণে। (অরণ্য)

এইরূপে খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি অতি প্রতাপশালী রাক্ষসসহ বহু সহস্র রাক্ষস রাম একা বধ করেন। খর দূষণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাক্ষসদের হত্যা করবার সময় রাম যে বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মহাভারতে এ প্রকার যুদ্ধে বা কোন যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের অমিতশক্তি বা সাহসিকতার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

অতঃপর অকম্পন নামক এক রাক্ষস জনস্থান হতে লঙ্কা নগরীতে গিয়ে লঙ্কাধিপতি রাবণকে খব, দূষণ প্রভৃতি বহু সহস্র রাক্ষস নিধনের খবর দেয়। অনন্যসাধারণ বিক্রমশালী দশরথ পুত্র বাম খর ও দূষণকে বধ করেছে এ সংবাদ পেয়ে রাবণ রাম লক্ষ্মণকে বধ করবে বলে আস্ফালন করতে থাকেন। অকম্পন রাক্ষসরাজ রাবণকে সাবধান করে বলে পাপী ব্যক্তি যেমন স্বর্গে যেতে পারে না, তদ্রূপ রাক্ষসরাজও রামকে পরাজিত করতে পারবেন না।

অকম্পন রামকে বধ করবার একটি মাত্র কৌশলের কথা রাবণকে বললো। বামের সীতা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছে। তিনি স্ত্রীরত্ন। দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়। রামের সেই স্ত্রীরত্নকে যদি অপহরণ করা যায়, একমাত্র তবেই রামকে বধ করা সম্ভব হবে।

অকম্পনের বাক্য সমুচিত বলে রাবণ অভিমত প্রকাশ করেন এবং সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন কববেন বলে আশ্বাস দেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রাবণ তারকানন্দন মারীচেব আশ্রমে গেলেন এবং রাম জনস্থানের কত ক্ষতি সাধন করেছেন তা ব্যক্ত করে সীতাকে হরণ করার অভিলাষ প্রকাশ করেন।

মারীচ রামের শৌর্য সম্বন্ধে পূর্বেই সম্যক জ্ঞাত ছিল। তাই রাবণের অভিপ্রায় শুনে মারীচ রামের শৌর্য বীর্যের কথা রাবণকে বলে এবং তাঁর এই অভিপ্রায় ত্যাগ কববার জন্য অনুরোধ করে বলে ঃ—

অবোধ রাবণ এ কি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥

প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥ (অরণ্য)

বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে ঃ—

কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ।
দৃষ্টশ্চেত্ত্বং রণে তেন তদন্তমুপজীবিতম্॥ (অরণ্য) ৩৭।২১

—রাক্ষসাধিপ, এই ব্যর্থ চেষ্টা করে আপনার কি লাভ হবে? রাম আপনাকে রণক্ষেত্রে দেখলেই আপনার আয়ুষ্কাল শেষ হবে।

মারীচ রাবণকে সাবধান করে বলে যে রাবণের রামের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়। তিনি যেন তাঁর রাণীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। মারীচের কথা শুনে রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরে গেলেন।

অনন্তর খর ও দূষণকে নিহত দেখে শূর্পণখা মেঘের ন্যায় ভীষণ শব্দে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করল। এবং যথেচ্ছভাবে রাবণকে তিরস্কার করতে থাকে। মন্ত্রিগণের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ শূর্পণখার কর্কশ বাক্যে ক্রুদ্ধ হয়ে রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন, তাঁদের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

শূর্পণখা রামের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করে এবং সীতার অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনাও করে। সেই সুন্দরী সীতাকে ভার্যারূপে পাইতে চেষ্টা করবার জন্যে রাবণকে পরামর্শ দেয়।

শূর্পণখার কথা শুনে রাবণ পুনরায় মারীচের নিকট উপস্থিত হলেন এবং রামের যাবতীয় অপরাধের কথা মারীচের নিকট বলে সীতাপহরণে রাবণকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। মারীচ পুনরায় রাবণকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে এবং এরূপ দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করে। মারীচ স্পষ্টভাবে বলে সে নিজে বিনষ্ট হবে। রাবণ সীতাহরণে সবান্ধবে বিনষ্ট হবেন, কেন না—

গতায়ুষো নরা
হিতা ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥ (অরণ্য) ৪১।২০

—যার আয়ু নিঃশেষ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি বন্ধুদের হিত কথা

গ্রহণ করে না।

রাবণ মারীচের কোন হিত ও যুক্তিযুক্ত কথা গ্রাহ্য করলেন না এবং সুবর্ণ মায়ামৃগরূপ ধরে সীতাকে প্রলুব্ধ করে যত্র তত্র মারীচকে বিচরণ করতে বলেন। অন্যথা তিনিই মারীচকে বধ করবেন বলে ভীতি প্রদর্শন করেন। অবশেষে মারীচকে রাবণের ভয়ে মায়ামৃগ রূপ গ্রহণ করতে হল।

পুষ্প চয়নরতা সীতা মাযামৃগর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রামকে ঐ মৃগটিকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে আবদার ধরলেন। লক্ষ্মণ প্রথমেই স্বর্ণমৃগ মারীচের মায়া রূপ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তৎ সত্ত্বেও সীতার এই মৃগের জন্য প্রবল স্পৃহা দেখে লক্ষ্মণের উপর সীতার রক্ষার ভার দিয়ে রাম হরিণের পিছনে ছুটলেন এবং শীঘ্রই ঐ মৃগের চর্ম নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন বলেন।

রামের মত বিচক্ষণ জ্ঞানী লোকের এইরূপ বুদ্ধিভ্রংশ নিয়তির খেলা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। জীবন্ত মৃগ যে কখনও এমন রত্ন খচিত হতে পারে না—তা তিনি ভাল রূপেই জানতেন।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালে দ্যুত ক্রীড়ার প্রতি আসক্তিতে, এর পরিণাম ভয়াবহ জেনেও যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লেন। এই দুই মহাকাব্যের দুই নায়কের চরিত্রে একই প্রকারের বুদ্ধিভ্রম প্রকাশ দেখতে পাই। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দৈবই রাম ও যুধিষ্ঠিরের মতিভ্রম ঘটিয়ে নিয়তির নির্দ্দিষ্ট বিপদসাগরে টেনে নিয়েছিলেন।

দৈবং ফলতি সর্বত্রং ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম।

রামের শরাহত মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে 'হা সীতা', 'হা লক্ষ্মণ' ডাকতে থাকে। তা শুনে সীতা লক্ষ্মণকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামের সাহায্যার্থে যেতে বাধ্য করেন।

মারীচকে বধ করে ফেরবার পথে রাম লক্ষ্মণকে দেখে রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তুমি সীতাকে একা রেখে এখানে এসেছো। তোমার

এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তুমি সীতাকে বনমধ্যে ত্যাগ করে খুব অন্যায় কাজ করেছো। রাম কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন—

তমুবাচ কিমর্থং ত্বমাগতোঽপাস্য মৈথিলীম্।

যদা সা তব বিশ্বাসাদ্ বনে বিরহিতা ময়া॥ (অরণ্য) ৫৯।২

—যখন তোমার উপর বিশ্বাস করেই আমি বনমধ্যে মৈথিলীকে রেখে এসেছি, তখন তাঁকে পরিত্যাগ করে তুমি কেন এসেছো?

রাম স্বয়ং নারায়ণ। নররূপ গ্রহণ করে তিনি যে নারায়ণ একথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। নতুবা তিনি অন্তর্যামী নারায়ণ হয়ে, লক্ষ্মণ কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছেন এই সন্দেহে তাঁর প্রতি কঠোর ভাষণ কখনো সম্ভব হত না। মনুষ্যদেহী রাম তাঁর পূর্ব স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং ইহাই তাঁর সুবুদ্ধি আচ্ছন্ন হবার কারণ।

সীতাও লক্ষ্মণের চরিত্রে অযথা সন্দেহ করে, যে পরুষভাষা তাঁর প্রতি ব্যবহার করেছিলেন এবং লক্ষ্মণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে রামের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন তাও তাঁর দেবী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিশূন্য।

রামসীতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন। উভয়ে অন্তর্যামী। কিন্তু নিয়তি তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধিকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, সাধারণ মানুষের থেকেও তাঁদের আচরণ সময় সময় নিকৃষ্ট হতে দেখা যায়।

রাম লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করে সীতাকে দেখতে না পেয়ে, রাম সীতার শোকে অধীর হয়ে পড়লেন।

রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজ্যলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার যে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥ (অরণ্য)

যখনই রাম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই বিমাতার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে বলে আক্ষেপ করেছেন বার বার। এটা 'অনুমিত' হয় যে রাম অদৃষ্টবাদী হলেও তা মৌখিক মাত্র। কার্যতঃ তাঁর দুর্ভোগের ও

দুর্ভাগ্যের জন্য সর্বদা দায়ী করেছেন বিমাতা কৈকেয়ীকে।

সীতার বিরহে রাম বিলাপ করতে করতে নদনদী পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গমকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। ভ্রান্ত ও উন্মত্তের ন্যায় রাম বনমধ্যে বিচরণ করতে করতে আম্র, কদম্ব, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। কিন্তু কেহ তাঁকে সীতার সন্ধান দিতে সক্ষম হলো না।

কখনো রাম কল্পনা করছেন বনে রাক্ষসরা সীতাকে ভক্ষণ করেছে। আবার মনে করছেন সীতা বেঁচে আছেন, এরূপে অস্থির চিত্তে রাম

বনানি নদীঃ শৈলানি গিরিপ্রস্রবনানি চ।

কাননানি চ বেগেন ভ্রমত্য পরিসংস্থিত॥ (অরণ্য) ৬০।৩৭

—বহু পর্বত, নদী, প্রস্রবণ, কানন ও বনমধ্যে অন্বেষণ করতে লাগলেন। তথাপি তিনি ভগ্ন মনোরথ না হয়ে তাঁর অনুসন্ধানে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে থাকেন।

রাম লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধান না পাওয়ায় রাম অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েন। লক্ষ্মণ নানাভাবে রামকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্মণের কোন সান্ত্বনা বাক্য রামের বিরহব্যথা শান্ত করল না।

অতঃপর পর্বতশিখর সদৃশ পক্ষীশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে রাম মনে করলেন জটায়ুই সীতাকে গ্রাস করেছে। তাই তিনি জটায়ুকে বধ করবার জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করলে জটায়ু তাঁকে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে জানালেন। জটায়ু আরও বললেন রাবণ সীতাকে হরণ করেছে দেখে তিনি প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে রাবণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। বৃদ্ধ জটায়ুকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছে। রামের নিকট সীতার সংবাদ দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে জটায়ু প্রাণ ত্যাগ করেন।

জটায়ুর মৃত্যুর পর রাম তাঁর জন্য বিলাপ করতে থাকেন এবং

পরিশেষে পিতৃবন্ধুর প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করেন এবং গৃধ্ররাজের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও তর্পণ করেন।

রামের মত পরম পুরুষের কি এতটা চিত্ত বৈকল্য শোভনীয় যার জন্য জটায়ু প্রকৃত দোষী কিনা তার অনুসন্ধান না করেই তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। পরক্ষণেই জটায়ুর জন্য আক্ষেপ করে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন :—

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ ॥ (অরণ্য) ৬৮।২৫

—হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ, এই গৃধ্ররাজ আমার জন্য নিহত হওয়ায় আমার যেমন দুঃখ হচ্ছে, সীতাহরণ দরুণ আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না।

এখানে রামের মধ্যে সাধারণ মানুষের অব্যবস্থিত চিত্ত দেখি। উপরি উক্তিটি যেন অতিশয়োক্তি। রাম চরিত্রে কখনো কখনো জনক নন্দিনীর প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে, যা সম্পূর্ণ অহেতুক।

অন্যদিকে সীতাশোকে ব্যাকুল হয়ে রাম বিলাপ করে বলেন—

তারা না হরিতে পারে তিমির আঁধার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার ॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥ (অরণ্য)

কোথাও সীতার কোন সন্ধান না পেয়ে, সীতা, জীবিত কি মৃত সঠিক নির্ণয় করতে না পেরে, নদী, পর্বত, স্থাবর, জঙ্গম কেইই সীতার কোন সন্ধান না দিতে পারাতে রাম যেন সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন এবং ত্রিপুরনিধনকারী রুদ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। লক্ষ্মণ অনেক প্রকারে রামকে সান্ত্বনা দিযে পরিশেষে বলেন—

কিং তে সর্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষর্ষভ।
তমেব তু রিপুং পাপং বিজ্ঞযোদ্ধর্তুমর্হসি॥ (অরণ্য) ৬৬।২১

—হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করবার তোমার কি প্রয়োজন? পাপাচারী সেই শত্রুকে চিনে তাকে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার কর।

অরণ্যের মধ্যে সীতার অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁরা কবন্ধ রাক্ষসের সম্মুখীন হন্। দুই ভাই ঐ রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত হলে রাম তার ডান হাত ও লক্ষ্মণ তার বাম হাত কেটে দিলে, সে তারস্বরে চীৎকার করে ভূপতিত হলো। রাম লক্ষ্মণের পরিচয় পেয়ে কবন্ধ তার পূর্ব-জন্মের কাহিনী প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান জীবন হতে মুক্তির জন্য রাম তাঁর বাহুচ্ছেদন করে বিজন অরণ্যে তাঁর দেহ দাহ করবেন, তখন সে পুনরায় মনোহর কান্তি লাভ করবে।

রাম তার দেহে অগ্নি সংযোগ করলে, সেই চিতা হতে এক দিব্য কান্তি পুরুষ উঠে রামকে বালী ও সুগ্রীবের সংবাদ দিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করতে বলেন। কারণ সুগ্রীবই সীতা উদ্ধারে রামকে সহায়তা করবেন। কবন্ধ রামকে বলেন যে ঋষ্যমূক পর্বতের এক দুপ্রবেশ্য গুহায় সুগ্রীব তাঁর সুহচরদের নিয়ে অবস্থান করছেন। কবন্ধ রামকে শোক ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন।

তিনি রামকে আরও বলেন যে রামের দর্শনের প্রতীক্ষায় তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী মতঙ্গ মুনির আশ্রমে অপেক্ষা করছেন। কারণ রামের দর্শন লাভে তিনি স্বর্গারোহন করবেন। রাম তথায় যান। রামকে দর্শন করার পর শবরী চিতায়-আত্মাহুতি দিযে স্বর্গে গমন করেন।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবর অভিমুখে যাত্রা করেন। পম্পা সরোবরের মনোহর শোভা দর্শনে বিরহী রামের বিরহ ব্যথা অধিকতর বৃদ্ধি পেলো, তিনি লক্ষ্মণকে বলেন, সীতাহীন হয়ে তিনি কি প্রকারে জীবন ধারণ করবেন। লক্ষ্মণ তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেন। সীতা শোকে বিহ্বল রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে পম্পার শোভা

দেখতে দেখতে সুগ্রীবের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

অপরপক্ষে ধনুর্ধারী দুই বীরকে দেখে বালির চর মনে করে সুগ্রীব তীক্ষ্ণধি হনূমানকে তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য পাঠালেন। হনূমান ছলনা করে বানররূপ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে রাম লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হলেন। এবং মধুর বাক্যে রাম লক্ষ্মণকে নানা মনোহর বচনে আকৃষ্ট করে তিনি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণকে বলেন সুগ্রীবের অমাত্য এসেছেন, তুমি সুমধুর বাক্যে তাঁর প্রশ্নোত্তব দাও। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁদের বনাগমন হতে আরম্ভ করে সীতা অপহরণ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বিশদরূপে কপিবর হনূমানের নিকট ব্যক্ত করেন এবং সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহযোগিতার প্রয়োজন জানালেন। লক্ষ্মণের কাছে যাবতীয় বিষয় অবগত হয়ে কপি প্রবর রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। হনূমান রাম লক্ষ্মণকে পুনরায় মধুর বাক্যে সুগ্রীবের নিকট যেতে অনুরোধ করেন। তাঁরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলে, কপিবর সন্ন্যাসীর রূপ ত্যাগ করে বানর রূপ গ্রহণ করে দুই বীর ভ্রাতাকে পৃষ্ঠদেশে নিয়ে ঋষ্যমুক পর্বতে উপস্থিত হলেন।

হনূমানের নিকট রামের সব বৃত্তান্ত শুনে সুগ্রীব নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। তারপর ঃ—

অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে।
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী॥ (কিঃ কাঃ)

দুই বন্ধু পরস্পর এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে হৃত স্ত্রী উদ্ধার করে দেবেন। প্রতিদানে সুগ্রীব বানর সেনার সহায়তায় সীতা উদ্ধার কার্য্যে রামকে সাহায্য করবেন। সুগ্রীবের নিকট রাম আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ—

জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক।
সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যা শোক॥

কলত্রে গৃহীর সুখ কলত্রে সংহার।
কলত্র হইতে হয় পুত্র পরিবার ॥
গয়া শ্রাদ্ধ করে পুত্র বংশের উদ্ধার।
পুত্র দ্বারা পারত্রিক ঐহিক নিস্তার ॥
... ...
তথাপি কলত্র শোক পাসরা না যায় ॥ (কিঃ কাঃ)

সীতার বিরহ রামকে কত গভীর ভাবে ক্লিষ্ট করেছে তার স্পষ্ট আভাস উপরোক্ত উক্তি হতে পাওয়া যায়। এ সময় সুগ্রীব সীতার পরিত্যক্ত অলঙ্কার ও বসনাদি দেখালে রামের শোক পুনঃ প্রবল হলে রাম রাক্ষস বধের প্রতিজ্ঞা করলেন।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি সুগ্রীবকে নির্বাসন দিয়েছেন এবং তাঁর স্ত্রীকে হরণ করেছেন। সুগ্রীব এই বৃত্তান্ত রামকে জানালে, রাম প্রতিশ্রুতি দিলেন যে বালিকে বধ করে সুগ্রীবের স্ত্রীকে উদ্ধার করে দেবেন।

রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠিয়ে বালির সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করান। পরাজিত হয়ে সুগ্রীব মতঙ্গ আশ্রমে পলায়ন করেন। রাম পুনরায় তাঁকে যুদ্ধার্থে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠান। রাম লক্ষ্মণও কিষ্কিন্ধ্যায় আসলেন। সুগ্রীব বালিকে মিত্রতা স্থাপনে উপদেশ দিলে বালি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বালি যখন সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে রত, তখন রাম অন্যায় যুদ্ধে বালিকে বধ করেন। ইহাতে বীর বালি ক্ষুব্ধ হয়ে রামের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ—

নাহং ত্বামভিজানামি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্ ॥
হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ॥

(কিঃ কঃ) ১৭।২৩-২৫

—ধর্মের কপট আবরণে, আমি তোমাকে ভালরূপে চিনতে পারিনি। কাকুৎস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ করেছ, এই কুৎসিত

কর্ম করে সাধুসমাজে তুমি কি বলবে?

মুমূর্ষু বালি রামকে ভর্ৎসনা করে বলে :—

সর্বলোকে বলে রাম ধর্ম অবতার।
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহাব॥
... ...
সম্মুখ সমরে যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥
সম্মুখ সংগ্রামে বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম বধিলে আমাকে হয়ে চোর॥ (কিঃ কাঃ)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি কুঞ্জরঃ" উক্তির কুঞ্জর শব্দটি এমন অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল যাতে সেই শব্দটি আচার্য দ্রোণের শ্রবণ পথে না পৌঁছয়। উদ্দেশ্য ছিল পুত্রশোকে তিনি যেন অস্ত্র ত্যাগ করেন। এই ষড়যন্ত্র সফলও হয়েছিল।

এই মহারথীদ্বয়ের (রাম ও যুধিষ্ঠির) এই কলঙ্ক সাত সমুদ্রের সমস্ত জলেও ধুয়ে মুছে যাবে না। যতদিন এই দুই মহাকাব্য ভারতভূখণ্ডে সমাদৃত হবে, ততদিন এ কলঙ্ক জ্বলজ্বল করে দেদীপ্যমান থাকবে।

প্রত্যুত্তরে রাম যুক্তি দেখিয়েছেন :—

তদেতৎকারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্॥ (কিঃ কাঃ)১৮।১৮

—কেন তোমাকে বধ করেছি তার কারণ শোন। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতার বর্ত্তমানে তার জায়াকে গ্রহণ করেছ।

পশুজাতির মধ্যে যে এ ধরণের আচবণ অধর্ম নয়, তা বোধ হয় রামেব অজ্ঞাত ছিল না। এই যুক্তি দ্বারা রাম নিজের গর্হিত কাজকে কতটুকু সমর্থন করতে পেরেছেন তা পাঠক সমাজের বিবেচ্য।

এই কারণেই ভক্ত কৃত্তিবাসও রামের এইরূপ অন্যায় সমরে নিজেকে যেন বিপন্ন বোধ করেছেন। তিনি বলেছেন :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্মিক রামেরে কেন হইল প্রমাদ ॥ (কিঃ কাঃ)

রামের এই কলঙ্ক যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। দ্বাপর যুগে মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব অর্জুনের মুখ দিয়ে রামের বালি বধের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

যুধিষ্ঠির ছলনার দ্বারা অশ্বত্থামা নামক হস্তীর মৃত্যু সংবাদের মাধ্যমে দ্রোণাচার্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়ে তাঁর হত্যার কারণ হওয়ার দরুণ অর্জুন সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন :—

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্য সচরাচর।
রামে বালি বধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥

(দ্রোঃ) ১৯৫।৩৫

—বালিকে বধ করার জন্য রামের কুকীর্তি যেমন ত্রিলোকে চিরকাল ব্যাপ্ত রয়েছে, তেমনি অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটাবার তোমার অপকীর্তি ও চিরদিনই জ্বলন্ত থাকবে।

কৃত্তিবাস রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকি আশ্রমে প্রবেশ করলে, লব কুশের সঙ্গে যুদ্ধে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন সমস্ত সৈন্যসহ নিহত হলে রাম যখন নিজে সেই অশ্ব উদ্ধারের জন্য যান, তখন রামকে উপহাস করে লবকুশ বলেন :—

সর্বলোকে বলে তোমা ধার্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম ॥ (উঃ কাঃ)

ভবভূতির উত্তররাম চরিতেও অশ্বমেধের অশ্ব রক্ষক লক্ষ্মণের পুত্রের সঙ্গে লবের বিবাদ হয়। তার মুখে রামের বীরত্বের কাহিনীব উত্তরে লব উপহাস করে বলেছিলেন :—

ইন্দ্রপুত্র বালিকে বধ করতে রাম যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা সকলেরই জানা আছে।

অবশেষে বালিকে সান্ত্বনা দিয়ে রাম বলেছেন :—

মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালি কেন করহ সন্তাপ॥ (কি কাঃ)

যে অপরাধের জন্য রাম বালিকে বধ করেছিলেন, সুগ্রীবও সেই একই অপরাধে অপরাধী। তারার সঙ্গে যে সুগ্রীবের অবৈধ সম্পর্ক ছিল, তা অঙ্গদের উক্তি হতেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে রাম নীরব ছিলেন।

রামের মত বীর যোদ্ধা বালিকে এই ভাবে অন্যায় যুদ্ধে বধ করাকে কেহই কখনও সমর্থন করেননি।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের সময় আমন্ত্রিত হয়েও রাম রাজভবনে যেতে অস্বীকার করে সুগ্রীবকে বলেন :—

শ্রীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ॥
... ...
রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই কর অঙ্গদেরে কর যুবরাজ॥
মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার॥ (কিঃ কাঃ)

বালি বধের জন্য রামের এই যে লজ্জা বা অনুতাপ, তা হতেই বোঝা যায় আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য যদিও রাম বালিকে নানা সান্ত্বনা বাক্য বলেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন অন্যায় ভাবে তাকে হত্যা করা কতটা গর্হিত হয়েছে। এই কারণেই তিনি সুগ্রীবকে বালিপুত্র অঙ্গদ ও বালির স্ত্রীর প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাধ্বী সীতাকে নির্বাসন দেওয়া কৃত্তিবাস কবির মন কোন প্রকারেই সমর্থন করেনি। তাই তিনি রামের এই অপযশকে বালি

পত্নী তারার ও রাক্ষসীদের অভিশাপের আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছেন। তারা স্বামীর মৃত্যুর পর রামকে বলেছে :—

আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে তব পাশে।
... ...
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন। (কিঃ কাঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে তারা দেবীর এ রকম কোন অভিশাপ পাওয়া যায় না। তারা সহমৃতা হতে চাইলে রাম বলেন :—

নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্মসাধনায়।
নিয়তিঃ সর্বভূতানাং নিয়োগেম্বিহ কারণম্॥ (কিঃ কাঃ) ২৫।৪

—এই জগতে অদৃষ্টই সকল ঘটনার কারণ। নিয়তিই সর্বপ্রাণীর কার্যের নিযুক্তির কারণ এবং নিয়তিই সমুদয় কর্মেরও সাধক।

অন্যায় যুদ্ধে তারার স্বামীকে বধ করে অদৃষ্টকেই কৃতকর্মের জন্য দায়ী রামের মত বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

সুগ্রীব রাজ্য পেয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ মাল্যবান নামক এক মনোহর গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ষা ঋতু সমাগমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়কে সীতার বিরহে উদ্বেল করে তুলেছে। আক্ষেপ করে রাম বলেন :—

দুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি॥
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমিত মরিব ভাই জানকীর শোকে॥
সজল জলদ শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার পার্শ্বে ছিলেন তেমন॥
... ...

পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতারে দেখি শয়ন আহার॥
কান্দেন সর্বদা রাম করিয়া হুতাশ। (কিঃ কাঃ)

রামের এই খেদ সকল দরদী মনকে স্পর্শ করে। বিরহে রামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি অন্যত্র লক্ষ্মণকে বলছেন ঃ—

বর্ষার চারমাস যেন আমার শতবর্ষ বলে মনে হচ্ছে।

বিরহী রাম সীতার শোকে অভিভূত হয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন ঃ—

মানুষের শোক ক্রমশঃ হ্রাস পায়, কিন্তু তাঁর শোক দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাতাসকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন ঃ—

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্টা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শচন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ (যুঃ) ৫।৬

—হে বায়ু, আমার প্রিয়া যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও। তাঁকে স্পর্শ করে আমাকেও স্পর্শ কর। উত্তপ্ত আঁখি চাঁদ দেখলে যেমন শীতল হয়, তেমনি প্রিয়তমা স্পর্শকারী তোমার স্পর্শে আমার দেহও শীতল হবে।

রামের এই কাকুতি কালিদাসের যক্ষের কাকুতির মতই অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী। ব্যথাতুর রামের বিরহের একটা সুন্দর চিত্র যেন এখানে ফুটে উঠেছে। সীতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের নিদর্শন এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ॥
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমা।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে॥ (কিঃ) ২৮।৫৮-৫৯

—লক্ষ্মণ, আমার স্ত্রী অপহৃত হয়েছে, আমি রাজ্যচ্যুত, এই জন্যে বর্ষার জলবেগে ক্লেদযুক্ত নদীগুলির মত আমি অবসন্ন। আমার শোক বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্ষাও অতি ভীষণ, এ জন্যে মহাশত্রু রাবণ অজেয় বলে মনে হচ্ছে।

যুধিষ্ঠিরের জীবনে কোথাও পত্নী প্রেমের এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। দ্রৌপদী সারাজীবন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সুতরাং বিরহ ব্যথা প্রকাশ করবার সুযোগও তাঁর জীবনে আসেনি।

বর্ষা গত হয়েছে, শরৎ ঋতু এসেছে। কিন্তু সুগ্রীব তখন রাজ্য ও স্ত্রী লাভ করে সুখে মত্ত, সীতা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই করেননি। রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট যেতে আদেশ করেন এবং কিভাবে সুগ্রীবকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সে সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দিলেন। পবিশেষে লক্ষ্মণ যেন সুগ্রীবকে স্মরণ করিয়ে দেন—

এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্ ॥
(কিঃ কাঃ) ৩০।৮২

—আমি এক বাণে একমাত্র বালিকে নিহত করেছি, কিন্তু তুমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হলে তোমাকে সবান্ধবে বিনষ্ট করব।

এই কথা শুনে সুগ্রীব যদি তার কর্ত্তব্য কার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে কাল ব্যয় না করে, সে শুভ কার্য যেন আরম্ভ করে।

সুগ্রীবের আচরণে লক্ষ্মণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। লক্ষ্মণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য সুগ্রীবকে তখনই বধ করে অঙ্গদের সাহায্যে সীতার উদ্ধার কার্য সমাপ্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে মিত্রবধ রূপ পাপ কাজ যেন না করে। সুগ্রীবের সঙ্গে পূর্ব প্রীতি স্থাপন কর। রূঢ় বাক্য না বলে প্রণয়-পূর্ণ বচন বলে সুগ্রীবকে স্মরণ করিয়ে দাও, বহুকাল অতীত হয়েছে, তবুও সে মৌন কেন?

এভাবে উপদিষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ কবেন। দ্বারদেশে বালিপুত্র অঙ্গদকে দেখতে পেয়ে তার নিকটবর্ত্তী হয়ে লক্ষ্মণ বলেন সুগ্রীবকে যেন তাঁর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন কবা হয়। এবং আরও যেন বলা হয় যে, রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতার বিপদে সন্তপ্ত হয়ে

আপনার দ্বারদেশে অবস্থান করছে। যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে আপনি তাঁর আজ্ঞা পালন করুন। বৎস অঙ্গদ, তাঁর প্রত্যুত্তর নিয়ে শীঘ্রই প্রত্যাগমন কর। অঙ্গদের দ্বারা সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে আমন্ত্রিত হয়ে, ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ তথায় গমন করলে, তাঁকে শান্ত করবার জন্যে সুগ্রীব তারাকে পাঠালেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের ধিক্কারে সুগ্রীব লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। লক্ষ্মণের অনুরোধে সুগ্রীব রাম সমীপে উপস্থিত হলেন। শোকাতুর রামের মধ্যে যেন দীপ্ত তেজ আবার ফুটে উঠেছে, এবং তার ফল স্বরূপ সুগ্রীবের মোহ কেটে গেল এবং সীতা উদ্ধারের জন্য তিনিও তৎপর হলেন। সুগ্রীব রামকে বানর সৈন্য সংগ্রহের তথ্যাদি পরিবেশন করেন। রামের আজ্ঞানুসারে সুগ্রীব বানরদের সীতান্বেষণে দিকে দিকে প্রেরণ করেন। গতি, বেগ, বল ও লঘুত্ব এই সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত পবন নন্দন হনুমানকে সীতান্বেষণে প্রেরণ করেন।

রাম হনুমানের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে, কার্যসাধনক্ষম মনে করে সীতার অভিজ্ঞানের জন্য তাঁর স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করেন। হনুমান সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে গগন পথে উঠে দক্ষিণ দিকে সীতার অন্বেষণ আরম্ভ করলেন। মহেন্দ্র পর্বত হতে শত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে, অনেক অন্বেষণের পর চেড়ী পরিবৃতা সীতাকে হনুমান অশোকবনে দেখতে পান।

হনুমান সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ দেন, এবং তিনি যে প্রকৃতই রামের দূত তা প্রমাণ করবার জন্য রামের অঙ্গুরীয় সীতাকে অর্পণ করেন। রাম সীতার বিরহে অতীব কাতর হয়েছেন, তিনি সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করছেন ইত্যাদি খবর দিলেন। পবন নন্দন যে সীতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তার প্রমাণ স্বরূপ সীতার নিকট হতে কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা করেন। সীতা তাঁকে চূড়ামণি প্রদান করেন।

হনুমান সীতার চূড়ামণি নিয়ে, লঙ্কার নানাবিধ ক্ষতি সাধন

করে, লঙ্কাধিপ রাবণকে স্বচক্ষে দেখে, সীতাকে রামের নিকট প্রত্যাপর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পুনরায় সাগর অতিক্রম করে, রামের নিকট ফিরে গেলেন।

সীতার কুশলবার্ত্তা পেয়ে এবং হনুমান সীতাকে দেখেছেন এ সংবাদে রাম লক্ষ্মণ আনন্দিত হলেন। সীতার চূড়ামণি বক্ষে ধারণ করে রাম নানাভাবে বিলাপ করতে থাকেন। শোকার্ত্ত রামকে সুগ্রীব নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে রামের ক্রোধ উদ্দীপনে চেষ্টা করলেন।

হনুমান ও সুগ্রীবের উপদেশে নতুন জীবন ও তেজ লাভ করে রাম সেইদিনই সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রার অভিলাষ প্রকাশ করেন। ঐদিন শুভদিন ও নানা শুভ লক্ষণ তাঁর বিজয়ের ও ইষ্ট সিদ্ধির ইঙ্গিত করছে।

তারপর সহস্র সহস্র বানরসেনা, বানররাজ সুগ্রীব ও হনুমান সহ রাম লক্ষ্মণ মহেন্দ্র পর্বতের সমীপে উপনীত হলেন। পর্বতচূড়া হতে দুস্তর সাগর রামের দৃষ্টিগোচর হলো। সেই বিশাল সাগর উত্তীর্ণ হবার কোন উপায় স্থির করবার জন্য সমুদ্রতীরে সুগ্রীবকে সেনা সন্নিবেশের আদেশ দিলেন।

বানরসৈন্যরা ঐ সমুদ্রতীরে সন্নিবিষ্ট হলে রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বিলাপ করে বলেন—

শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্দ্ধতে॥
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্য হ্যতিবর্ত্ততে॥
বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্টা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ (যুঃ) ৫।৪-৬

—কাল অতিক্রম করলে, শোকও লাঘব হয়, প্রিয়ার অদর্শন জনিত আমার শোক দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রিয়া দূরে আছে বলে আমার দুঃখ নয়, বা আমার প্রিয়াকে রাবণ হরণ করেছে এজন্য

আমি দুঃখিত নই। নির্দিষ্ট জীবনকাল অতীত হচ্ছে, এজন্য আমার দুঃখ। বায়ু, আমার স্ত্রী যেখানে আছে, সেখানে তুমি যাও। তাঁকে স্পর্শ করে, আমাকে স্পর্শ কর। তাপক্লিষ্ট নয়ন যেমন চন্দ্র দর্শনে শীতল হয়, প্রিয়া স্পর্শকারী তোমার স্পর্শ আমার দেহ শীতল করবে।

স্বল্পকালের মধ্যে পবননন্দন হনূমানের লঙ্কা নগরীকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ায় লঙ্কাধিপ রাবণ লজ্জিত হয়ে পরামর্শের জন্য তাঁর মন্ত্রীদের আহ্বান করেন। মন্ত্রীরা রামের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয় সুনিশ্চিত ইত্যাদি অভিমত প্রকাশ করে রাবণকে উৎসাহিত করে।

রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ, রাম অজেয়, অতএব সীতাকে প্রত্যর্পণ করার পরামর্শ দিলে, রাবণ তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে তাঁকে বিদায় দিলেন। তবুও বিভীষণ রাবণকে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ তাঁকে তিরস্কার করে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেন।

ভ্রাতা রাবণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে বিভীষণ রামের আশ্রয় ভিক্ষা করলে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর প্রধান রামকে সাবধান করে বলেছিল বিভীষণ হয়ত রাবণের চর, বিশ্বাস উৎপাদন করে সে আমাদের বধ করতে এসেছে। কিন্তু পবননন্দন হনূমানের অভিমত অনুরূপ ছিল না। উত্তরে রাম বলেছিলেন :—

মিত্র ভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন্।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্ ॥ (যুঃ) ১৮।৩

—(বিভীষণ) মিত্রভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাঁকে কোন প্রকারে ত্যাগ করতে পারি না। তাঁর যদি কোন দোষ থাকে, তথাপি দোষীকে আশ্রয় দেওয়া সৎ পুরুষের পক্ষে নিন্দনীয় নয়।

রাম বিভীষণকে আশ্রয় দেবার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়ে অবশেষে বানর প্রধানদেব বলেছেন :—

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥ (যুঃ) ১৮।১৫

—সংসারে সব ভ্রাতাই ভরতের মত নয়। পিতার সব পুত্রই আমার মত নয়, আর সব বন্ধুই তোমার (সুগ্রীব) মত নয়।

অন্যত্র তিনি বলেছেন :—

পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্।
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যমিচ্ছন্ হরিগণেশ্বরঃ॥ (সুঃ) ১৮।২৩

—হে বানরদের ঈশ্বর, আমি ইচ্ছা করলে ক্ষণ কালের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করতে পারি।

এখানে রামের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। রামের মত পুরুষের এই আত্মশ্লাঘা কি শোভনীয়? আত্মপ্রশংসায় এরূপ মুখর হওয়া তাঁর মত চরিত্রের পক্ষে যেমন কল্পনাতীত, তেমনি বিস্ময়কর। তবে অতিরিক্ত ক্রোধে ও শোকে তাঁর এই ভাবপ্রবণতার প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে রাম সুগ্রীবকে বলেছেন :—

কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট যদি না করে পালন॥
পুরাণের কথা কহি কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম অধিষ্ঠান॥
... ...
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাস॥
... ...
সেইত পুণ্যেত রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্বনাশ॥
বিভীষণ থাক্ যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত করিব পালন॥ (সুঃ কাঃ)

রাম প্রবল প্রতাপশালী হলেও উদারতাও তাঁর মধ্যে সম বিদ্যমান।

হনুমানের সুপারিশ বিভীষণ সম্বন্ধে সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মালো। সুগ্রীবের অনুরোধে রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হলেন। রামের আশ্রয় নিয়ে বিভীষণ রামের নিকট রাবণের শক্তির পরিচয় দেন এবং রাবণকে বধ করবেন প্রতিজ্ঞা করেন।

বিভীষণের পরামর্শে রাম সমুদ্র দেবের দর্শনের জন্য উপবাস করে কুশাস্তরণে সাগর কূলে উপবিষ্ট হলেন। তিন দিন অতিবাহিত হলো, তবু সমুদ্রদেবের দর্শন পাওয়া গেল না। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ বাণ নিক্ষেপে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। তখন বিপন্ন সমুদ্রদেব রাম সমীপে এসে বললেন, বিশ্বকর্মার পুত্র বানর নল সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করলে, রাম সসৈন্যে দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হতে পারবেন।

নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন।
দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন॥ (সুঃ কাঃ)

নল সমুদ্রের উপর শত যোজন সেতু নির্ম্মাণ করলে, রাম বানরদের সঙ্গে সমুদ্রের পরপারে শিবির স্থাপন করেন।

রাবণের মন্ত্রী শুক ও সাবণ বানরের রূপ নিয়ে গুপ্তভাবে বানর সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলে বিভীষণ তাদের ধরে হত্যা করতে উদ্যত হলে রাম বলেন :—

ক্ষান্ত হও চর হত্যা নহে রাজধর্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন কর্ম॥ (লঃ কাঃ)

রাক্ষসরাজ রাবণের মত তস্করের চরের প্রতি ও রাম রাজধর্ম প্রকাশে কার্পণ্য করেন নি। বনবাসী রাম রাজধর্ম বিস্মৃত হননি। তাই চরকে বধ করা তিনি অনুমোদন করেন নি। শুধু তা নয়, বরং তিনি চরদ্বয়কে বললেন, তোমাদের যদি আরও কিছু দেখবার বাকী থাকে, তাও দেখে যাও। অথবা বিভীষণ পুনর্বার তোমাদের সমস্ত দেখাবেন। রাম চরদ্বয়কে আরও বলেন—তোমাদের প্রভু, রাবণকে বলবে যে যে শক্তি গর্বে তিনি আমার পত্নীকে হরণ করেছেন,

এবার যেন সেই শক্তি প্রদর্শন করেন। আগামী কালই আমার শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আমার শরের দ্বারা তোরণ শোভিত ও প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসবৃন্দ ধ্বংস হবে।

বন্ধু বিভীষণের নিকট হতে লঙ্কার রক্ষণ ব্যবস্থা অবগত হয়ে, রাম তাঁর সেনাপতিদের নিযুক্ত করেন। এবং সদলে সুবেল পর্বত অধিরোহণ করে রাত্রি যাপন করেন।

প্রথমতঃ রাম অঙ্গদকে রাবণের কাছে দূত রূপে পাঠিয়েছিলেন। অঙ্গদ মারফত তিনি রাবণকে বলে পাঠালেন ঃ—

যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্শিতঃ।
দণ্ড ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ॥ (যুঃ কাঃ) ৪১।৬৪

—যিনি অপরাধীদের দণ্ডদাতা, তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে তুমি তাঁকে কষ্ট দিয়েছো। তার দণ্ড দানের জন্য আমি লঙ্কার দ্বারে দণ্ডধারণ করে অবস্থান করছি।

রাম নিজেকে যে 'দণ্ডদাতা' বলেছেন—কথাটা খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। তিনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। তাই অপরাধীকে শাস্তি বিধানের জন্য তাঁর নররূপ গ্রহণ করা, আবার তিনি অযোধ্যার ভবিষ্যৎ রাজা, —বর্ত্তমানে তিনি অরণ্যের রাজা। অতএব ক্ষেত্র নির্বিশেষে দণ্ড-দানের তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত।

তিনি বলিপুত্র অঙ্গদকে দিয়ে আরও বলে পাঠালেন যে তুমি যদি মৈথেলীকে নিযে আমার শরণাপন্ন না হও, তবে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা লঙ্কাকে রাক্ষস শূন্য করবো এবং আমার বন্ধু বিভীষণকে লঙ্কাধিপতি করবো।

অঙ্গদ লঙ্কায় গমন করলেন। কিন্তু কোন প্রকারে রাবণকে সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত করাতে না পেরে রামের শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন ঃ—

শ্রীরাম সাগর পারে, নাহিক নিস্তার আর।
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥

রাজা হয়ে পরদার, হরিলি যে দুরাচার,
বোধ নাহি হয় তোর ঘটে।
... ...
রাখরে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান,
ভজ গিয়া রামের চরণ।
... ...
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিতে। (লঃ কাঃ)

তথাপি রাবণকে রামের সঙ্গে মিত্রতা করতে সম্মত করাতে অক্ষম হলে তারানন্দন অঙ্গদ স্বীয় বিক্রম দেখিয়ে নানাভাবে রাক্ষসদের দুঃখের হেতু হলো। এবং বানর দলের আনন্দ উৎপাদন করলো। অঙ্গদ অক্ষত দেহে রামের নিকট ফিরে আসে। অঙ্গদ প্রত্যাবর্তন করলে বানরগণ লঙ্কা আক্রমণ করে। বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্র মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হয়ে গেল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাক্ষসগণ পরাজিত হলো। অঙ্গদ ইন্দ্রজিতকে পরাজিত করে। রাম ও লক্ষ্মণ বিষধর সর্প সদৃশ বাণসমূহের দ্বারা অনেক রাক্ষসকে বধ করেন।

বালিপুত্র অঙ্গদের নিকট পরাজিত হয়ে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলো। অতঃপর ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্যভাবে নাগময় শরে রাম লক্ষ্মণকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেন। তারপর ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করেন। এভাবে নাগপাশে আবদ্ধ হলে রামলক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ পায়। ফলে বানর সৈন্যদলে এক শোক প্রবাহ বয়ে যায়। রামলক্ষ্মণের শরীরে অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান ছিল না যা বাণেব দ্বারা বিদ্ধ হয়নি।

তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়নৌ রুধিরোক্ষিতৌ।
শরবেষ্টিতসর্বাঙ্গবার্তৌ পরমপীড়িতৌ॥ (যুঃ কাঃ) ৪৫।১৯

—বীরদ্বয় সমরাঙ্গনে বীর শয্যায় শায়িত, শোণিতস্নাত, সর্বশরীরে শরবেষ্টিত হয়ে অতিশয় পীড়িত ও আর্ত্ত হলেন।

রাম নাগপাশে বদ্ধ হলেও স্বীয় শক্তিমত্তা ও দেহের দৃঢ়তার জন্য লক্ষ্মণের পূর্বেই জ্ঞান ফিরে পেলেন। কিন্তু প্রাণাধিক ভ্রাতার দুরাবস্থা ও মলিন বদন দেখে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। বিভীষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিলে, প্রত্যুত্তরে শোকাতুর হয়ে রাম বলেন :—

শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্যলোকে বিচিন্বতা।
ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ॥ (যুঃ কাঃ) ৪৯।৬

—মর্ত্যলোকে অনুসন্ধান করলে সীতার ন্যায় রমণী মিলতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের মত সহচর ও যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভ্রাতা পাওয়া যাবে না।

ভ্রাতৃশোকে অধীর হয়ে রাম বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে রাজকার্য করতে বলেন এবং হনূমানকে বলেন :—

অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনূমান।
সমাচার করিও সবার বিদ্যমান॥
... ...
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
... ...
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি।
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি॥ (লঃ কাঃ)

দেবতাদের কাছে রাম লক্ষ্মণের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে গরুড় সে স্থানে উপস্থিত হলো। গরুড়ের স্পর্শে উভয় ভ্রাতা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁদের ক্ষত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এবং পূর্ব সৌন্দর্য ও কান্তি ফিরে এল। তখন রাম গরুড়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন :—

কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
বসানো বিরজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ (যুঃ কাঃ) ৫০।৪৪

অতি রূপবান, দিব্য পুষ্পমাল্য ও দিব্য অঙ্গরাগসম্পন্ন নির্মল বস্ত্রধারী এবং দিব্য আভরণ বিভূষিত আপনি কে?

রাম স্বয়ং নারায়ণ। সর্বজ্ঞ হয়েও গরুড়কে এই প্রশ্ন করায় অনুমিত হয় মানব রাম তাঁর দৈব স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিলেন। নতুবা এই প্রশ্নের কি কোন প্রয়োজন ছিল? যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর কাছে গরুড়ের পরিচয় অজ্ঞাত থাকতে পারে না, গরুড় যে তাঁরই বাহন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু অন্য রকম বর্ণনা দেখা যায়। সুস্থ হয়ে—

শ্রীরাম বলেন পক্ষী কৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষিবর বাঞ্ছা যে তোমার॥ (লঃ কাঃ)

উত্তরে গরুড় বলেন—

বাঞ্ছা আছে এই মনে।
ত্রিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে॥
... ...
শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥
না বলিহ কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ॥ (লঃ কাঃ)

অবশেষে নাছোড়বান্দা ভক্ত গরুড়—

পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপ ধরে।
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে॥ (লঃ কাঃ)

রাম নারায়ণ রূপে দর্শন দিলেন তাঁর পরম ভক্তরে।

ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত প্রভৃতি এক এক করে সব রথী মহারথীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। প্রহস্ত হত হলে লঙ্কাধিপতি রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রহারে সুগ্রীব ও নীল মূর্ছিত

হয়। লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ অবশেষে লক্ষ্মণের প্রতি স্বয়ম্ভূ প্রদত্ত ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। যদিও লক্ষ্মণ তা প্রতিহত করলেন, তথাপি সেই অস্ত্র তাঁর বক্ষে পড়ল এবং তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। হনুমান রাবণের বক্ষে প্রচণ্ড এক মুষ্টি প্রহার করলেন। রাবণ সেই আঘাতে জ্ঞান হারালেন। তখন হনুমান লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলে রামের নিকট নিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে রাবণ জ্ঞান ফিরে পেলেন। লক্ষ্মণও সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাবণ পুনরায় বানরসেনা ধ্বংস করছেন দেখে রাম স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং রাবণকে পরাস্ত করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত রাবণকে বলেন :—

তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥
...তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥ (যুঃ কাঃ) ৫৯।১৪২-১৪৩

—আজ ভীষণ যুদ্ধ করায় তুমি পরিশ্রান্ত, সেইজন্য শরাঘাতে তোমাকে বধ করবো না।
তুমি আজ বিশ্রাম কর, পুনরায় রথ, ধনুর্বাণ ও সৈন্যাদি সহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে আমার শক্তি দেখতে পাবে।

পরাজিত রাবণ লজ্জিতচিত্তে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। শক্তিশালী দুর্ধর্ষ শত্রুকে এমনভাবে ক্ষমা একমাত্র রামের পক্ষেই সম্ভব। এখানে রামের মহানুভবতার সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। পরাক্রান্ত শত্রুকে এমন অসহায় অবস্থায় পেয়েও তাকে নির্মূল না করে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সুযোগ করে দেওয়া একমাত্র রামের মত মহাবীরের পক্ষেই সম্ভব।

রাক্ষস বীররা এক এক করে নিহত হওয়ায়, রাবণ অগতির গতি কুম্ভকর্ণকে তাঁর নিদ্রাকাল অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই জাগিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান। কুম্ভকর্ণ বহু বানরসেনা নিহত করলে, রাম কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে তাঁকেও নিহত করেন।

রাবণের পুত্রগণ, ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য প্রখ্যাত রাক্ষস বীবগণ লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির হাতে নিহত হয়। রাক্ষস প্রধানগণের মৃত্যুতে রাবণ যখন শোকে কাতর ও চিন্তিত, তখন তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেন। ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণকে বলেন যে সেদিনই রাম লক্ষ্মণ তাঁর শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ধরাশায়ী হবেন। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইন্দ্রজিৎ আস্ফালন করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে। রাবণও পুত্রকে আশীর্বাদ করে বলেন—তুমি বাসব বিজয়ী। তুমি নিশ্চয় রাঘবকে জয় কববে।

ইন্দ্রজিৎ পিতার আশীর্বাদ এবং ব্রহ্মমন্ত্রে নিজের অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে অভিমন্ত্রিত করে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলে। ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্র প্রয়োগ করছিলেন এবং ব্রহ্মার বরে আকাশে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করছিলেন। ফলে তাঁর শরাঘাতে প্রধান প্রধান বানরবীরগণ সমরে পতিত হচ্ছিল। বানর সেনাদের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করে রাম লক্ষ্মণকে বলেন যে ব্রহ্মার আশীর্বাদে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থেকে মহাস্ত্র দ্বারা আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছে। তাঁকে বধ করা সম্ভব নয়। পরন্তু তাঁদেরও (রাম লক্ষ্মণ) অচৈতন্য অবস্থায় হর্ষরোষ শূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ জয়লাভ করেছে মনে করে লঙ্কায় ফিরে যাবে। ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে রাম লক্ষ্মণ অভিভূত হলেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁদের বিষণ্ণ দেখে বিজয় আনন্দে লঙ্কাপুবী মধ্যে প্রবেশ করে পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন।

এদিকে রাম লক্ষ্মণকে এরূপ নিস্তেজ ও অবসন্ন দেখে বানর প্রধানগণ ও সৈন্যগণ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। বিভীষণ বানরদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ব্রহ্মার মান রক্ষার্থে রাম লক্ষ্মণ এইভাবে অভিভূত হযে পড়েছেন। তখন জাম্ববান পবন পুত্র হনুমানকে হিমালয়ে দিব্য ওষধির সন্ধান দিয়ে তা সংগ্রহ করতে পাঠান। হনুমান সমগ্র ওষধি শৃঙ্গ আহরণ করে লঙ্কায় ফিরে আসেন। এবং এই দিব্য

প্রয়োগে রাম লক্ষ্মণ ও সমস্ত বানরগণ পুনরায় সুস্থ হলেন।

গন্ধেন তাসাং প্রবরৌষধৌনাং
সুপ্তা নিশান্তেষ্বিব সম্প্রবুদ্ধাঃ॥ (যুঃ কাঃ) ৭৪।৭৪

—সেই দিব্য ওষধির গন্ধে মুহূর্তের মধ্যে সব আর্ত ও বাণক্লিষ্টরা ব্যথাশূন্য হয়ে উঠল, যেন নিশান্তে ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হয়েছে।

রাম লক্ষ্মণ, বানর প্রধান ও বানরসৈন্তরা পুনঃ উজ্জীবিত হয়ে পুনরায় রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক রাক্ষসবীরকে ও কুম্ভকে অঙ্গদ ও সুগ্রীব নিহত করেন। হনুমান নিহত করেন নিকুম্ভকে। নিকুম্ভের নিধনে রাবণ মকরাক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মকরাক্ষকে রাম বধ করেন।

মকরাক্ষ নিহত হয়েছে এই দুঃসংবাদে রাবণ ক্রোধে অধীর হয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় ইন্দ্রজিতকে রণাঙ্গনে পাঠান। তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করে লঙ্কাপুরী হতে বের হয়ে রাক্ষস মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে বলেন—কপট সন্ন্যাসীদ্বয়কে আজ যুদ্ধে বধ করে পিতা রাবণকে বিজয়বার্ত্তা দেবো।

অতঃপর ইন্দ্রজিৎ রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। যেহেতু ইন্দ্রজিৎ অন্তরাল হতে যুদ্ধ করছিলেন, সেজন্য কেউ তাঁকে বা তাঁর রথ দেখতে পায়নি বা তাঁর অশ্বখুরের ধ্বনি শ্রবণ করতে পারেনি।

রাম লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের শরে পরিবেষ্টিত হচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের শর ইন্দ্রজিতকে স্পর্শ করতে পারছিল না। ইন্দ্রজিতের অদৃশ্য বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয়ে শত শত বানর সেনা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল দেখে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে রাক্ষসদের বধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, রাম লক্ষ্মণকে বলেন—

নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি॥ (যুঃ কাঃ) ৮০।৩৮

—এক রাক্ষসের অপরাধে পৃথিবীকে রাক্ষসহীন করা উচিত না।

রাম এইভাবে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করেন। রাম লোকপালক ও

লোকরক্ষক। তিনি এরূপ নিষ্ঠুর কাজে কখনও উৎসাহ দিতে পারেন না। তিনি লোকোত্তর পুরুষ বলেই যুদ্ধ ক্ষেত্রেও বিচার বিবেচনা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সাধারণ লোক ও বীরদের কাছে—

Nothing is unfair in love and war.

কিন্তু নরনারায়ণ রামের পক্ষে এরূপ আচরণ সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে রাম বললেন—

যদ্যেব ভূমিং বিশতে দিবং বা
রসাতলং বাপি নভস্তলং বা।
এবং বিগূঢ়োঽপি মমাস্ত্রদগ্ধঃ
পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসুঃ॥ (যুঃ কাঃ) ৮০।৪২

রাম ইন্দ্রজিতকে উদ্দেশ করে বলেন—যদি মর্ত্ত্য, রসাতল বা আকাশে প্রবেশ কর বা লুক্কায়িত হও, তবু আমার অস্ত্রে দগ্ধ হয়ে ভূতলশায়ী হবে।

রাবণি রাঘবের অভিপ্রায় জানতে পেরে তাঁকে নিবীর্য ও নিষ্ক্রিয় করবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে মায়া সীতার এক মূর্তি হনূমান ও অন্যান্য বানরদের সম্মুখে শাণিত খড়্গে হত্যা করলেন।

রাম হনূমানের মুখে ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করেছেন শুনে শোকে ছিন্নমুল বৃক্ষের ন্যায় মুর্ছিত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। শোকাভিভূত রাম লক্ষ্মণকে বলেন—

ভার্য্যাশোক নহে ভাই কভু বিস্মরণ॥
স্ত্রী পুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে ভাইরে ভার্য্যার বড় শোক॥
দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ॥ (লঃ কাঃ)

সীতার প্রতি রামের অকৃত্রিম প্রেমের উজ্জ্বল ছবি ফুটেছে এই

উক্তিতে।

শোকগ্রস্ত রামকে আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—স্থাবর জঙ্গমের মত ধর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই মনে হয় ধর্ম নেই। যদি ধর্ম থাকতো, তবে তোমার মত ধার্মিক এভাবে দুঃখ ভোগ করবে কেন? যদি অধর্মের দ্বারা দুঃখ ও ধর্মের দ্বারা সুখ হতো, তবে রাবণ নরকে যেতো এবং তোমারও এমন দুঃখ হতো না। যারা সর্বদা অধর্ম আচরণ করে, তাদের সম্পন্ন ও যারা ধর্মপথে বিচরণ করে, তাদের বিপন্ন দেখে ধর্ম ও অধর্ম দুই-ই নিরর্থক বলে মনে হয়। লক্ষ্মণ আরও অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মনোজ্ঞ কথার দ্বারা রামের মোহকে কাটাতে চেষ্টা করেন এবং লঙ্কাপুরী ধ্বংসের ব্রত গ্রহণ করেন।

মহাভারতে দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের কাছে ঠিক এইভাবে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করেছিলেন।

বিভীষণ রামের কাছে ইন্দ্রজিতের মায়া রহস্য প্রকাশ করলে, সীতা জীবিত বলে রাম বিশ্বাস করেন। তারপর ইন্দ্রজিতকে কিরূপে পরাজিত ও বধ করা সম্ভব হবে বন্ধু বিভীষণ রামের নিকট তা ব্যক্ত করেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতকে বধ করবার জন্য পাঠালেন।

ইন্দ্রজিৎকে বধ করে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও অন্যান্য বীররা রামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিরূপাক্ষ প্রমুখ রাক্ষসবীররা হত হলে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি দ্রুত গতিতে রামের দিকে ধাবিত হলেন। রামও যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে ছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হল।

রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের ক্ষোভ হতে তাঁর ভ্রাতা বিভীষণকে রক্ষা করছেন দেখে রাবণ মহা ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ

করেন। রামের 'এই শক্তি ব্যর্থ ও বিফল হোক' প্রার্থনা সত্বেও, ঐ শক্তি শেল মহাবেগে লক্ষ্মণের বুকে পতিত হয়। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন।

রাম ভ্রাতৃস্নেহে কিয়ৎকাল বিষণ্ণ ও বাষ্পকুল হন্। মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করে ক্রুদ্ধ হয়ে রাম বলেন—এখন বিষাদের সময় নয়।

ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি।

তিনি যখন ধনু আকর্ষণ করেন, তখন রাবণ মর্মভেদী শর দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকেন। রাম তখন লক্ষ্মণের রক্ষার দায়িত্ব বানর প্রধানদের উপর দিয়ে রাবণকে বধ করতে গেলেন। রামের প্রচণ্ড আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে রাবণ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে রাবণ পলায়ন করলে পর রাম ভূতলে পতিত হয়ে লক্ষ্মণকে ছটফট করতে দেখে শোকাবিষ্ট হলেন এবং সুষেণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ মারা যায়, তবে তাঁর জীবনে কি লাভ? রাজ্যেরই বা কি প্রয়োজন?

রাম আক্ষেপ করে বলেন :—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

(যুঃ কাঃ) ১০১।১৫

—প্রতি দেশেই স্ত্রী বা বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায় এমন দেশ দেখি না।

কথং বক্ষাম্যহং ত্বাম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম॥
... ...
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্॥
ভরতং কিং নু বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নঞ্চ মহাবলম্।
সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্॥ (যুঃ কাঃ)
১০১।১৬-১৮

—পুত্র বৎসলা সুমিত্রার নিকট কিরূপে লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদ দেবো?

জননী কৌশল্যা, মাতা কৈকয়ীকে বা কি বলে সান্ত্বনা দেবো? ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকে বা কি বলবো? তারা যখন জিজ্ঞেস করবে লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে লক্ষ্মণকে না নিযে কি করে ফিরলেন? কি উত্তর দেওয়ার আছে?

এইভাবে রাম অনুজ লক্ষ্মণের জন্য শোক করতে থাকলেন। এখানে রামের ভ্রাতৃপ্রেমের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন কবি। লক্ষ্মণ রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, কিন্তু নিত্য সহচর। লক্ষ্মণের জন্য রামের এ প্রকার অকৃত্রিম শোক তাঁর মহত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হনূমানকে ওষধি আনতে পাঠানো হলো। কিন্তু হনূমান ওষধি চিনতে না পেরে গিরিশৃঙ্গ নিয়েই ফিরে আসলেন। সুষেণ দিব্য ওষধি উৎপাটন করে লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রদান করেন। সেই ওষধির আঘ্রাণে লক্ষ্মণ আরোগ্যলাভ করেন। তখন রাম বাষ্পাকুল নয়নে স্নেহেব ভাইকে আলিঙ্গন করে রাবণকে বধ করবেন প্রতিজ্ঞা করেন, লক্ষ্মণ রাবণ বধে রামকে উৎসাহিত কবেন।

আবার রাম রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হলো, রাবণ রথোপরি থেকে যুদ্ধ করছিলেন, রাম মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন। দেবগণ এই অসামঞ্জস্য যুদ্ধ লক্ষ্য করেন। তাঁদের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রথ নিয়ে সারথি মাতলিকে রামের নিকট পাঠালেন। নানা দিব্যাস্ত্র ও তার সঙ্গে পাঠালেন। রাম সেই রথে আরোহণ কবেন এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রামের বাণে মৃতপ্রায় রাবণকে নিয়ে সারথি পলায়ন করলো।

যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্য্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা॥ (যুঃ কাঃ) ১০৩।২৮

—রামের বাণে হতজ্ঞান রাবণ বাণক্ষেপন ও ধনু কর্ষণে অপারগ, তখন রাম আর কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ করেননি।

এখানেও রামের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। বার বার

শত্রুকে নিস্তেজ ও হৃতবল হতে দেখেও তাঁর প্রতি চরম আঘাত হেনে, তাঁকে একেবারে নিঃশেষ করবার সুযোগ এভাবে ত্যাগ করবার দৃষ্টান্ত বোধ হয় একমাত্র রাম চরিত্রেই সম্ভব।

রামের এই উদারতা কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নেই। ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি মহারথীদের অন্যায় যুদ্ধেই বধ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির চরিত্র রাম চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এরূপ পশ্চাদপসরণের জন্য রাবণ সারথিকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সারথি নিজেব দোষ সমর্থন করে নানা যুক্তি দেখিয়ে রাবণকে সন্তুষ্ট করে পুনঃ রাবণকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

অতঃপর রাম রাবণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। রামের বাণের প্রচণ্ড আঘাতে ধরণী সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল। রাম তখন রাবণকে বলেন ঃ—

শূরোঽহমিতি চাত্মনমবগচ্ছসি দুর্মতে।
নৈব লজ্জাস্তি তে সীতাং চৌরবদ্ ব্যপকর্ষতঃ॥
যদি মৎ সন্নিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাত্ত্বয়া বলাৎ।
ভ্রাতরং তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ॥ (যুঃ কাঃ)
১০৩।১৭-১৮

—হে পাপাশয়, চোরের মত সীতাকে হরণ করে তুমি যে বীর বলে আত্মশ্লাঘা করছ, তাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না? যদি আমার সামনে তুমি বলপূর্বক সীতাকে হরণ করতে, তা হলে সেই দণ্ডেই আমার বাণে নিহত হয়ে পবলোকগত ভ্রাতা খরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের বাণে কাতর হয়ে রাবণ করযোড়ে রামের স্তব কবতে থাকায় ঃ—

রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে॥

কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না করিবে আর।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর॥ (লঃ কাঃ)

দেবগণ রামকে মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের শত্রু রাক্ষসদের নিধনের জন্য। কিন্তু রাক্ষসভক্তের স্তবস্তুতিতে রাম বার বার বিচলিত হয়ে তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ম হতে বিচ্যুত হচ্ছিলেন। মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শেষ রক্ষা করেছেন।

যুদ্ধ দেখতে দেখতে দেব, দানব যক্ষ প্রভৃতির সাত রাত কেটে গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ যুদ্ধেব বিরতি ছিল না। ইন্দ্রের সারথি মাতলি রামকে বলেন, আজ রাবণ বধ হবে। আপনি রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। রাম অব্যর্থ সেই মহাস্ত্র:কে বেদবিহিত নিয়মে অভিমন্ত্রিত করে বলপূর্বক ক্ষেপণ করেন। সেই অতি বেগবান শর রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ কবে তাঁর প্রাণ হরণ কবে। এই ভাবে রাম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন ও সব সুহৃদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কৃত্তিবাসী রামাযণে রামের ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণ আহত হয়ে ভূপতিত হলেন। রাবণের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখে রাম লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলেন :—

রাজার বংশতে জন্ম লভি দুই ভাই।
চিরদিন বনবাস ভ্রমিয়া বেড়াই॥

... ...

রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥

... ...

নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ্য ব্যবহার॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম যাব কার কাছে।

... ...

রাজকীর্ত্তি কর্ম্মে রাবণ পরম পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি॥ (লঃ কাঃ)

রাক্ষস শত্রু থেকে রাজনীতি শিক্ষার এই যে আগ্রহ উদার চিত্ত রাম চরিত্রের এটা একটা সুন্দর দিক। কিন্তু রামের মত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে কি রাজনীতি শিক্ষার জন্য রাক্ষসের সাহায্যের একান্তই প্রয়োজন ছিল? তিনি সর্বজ্ঞ নারায়ণ। কবি রামের ঔদার্যের পরিচয় দেবার জন্যই বোধ হয় এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এটা কৃত্তিবাস কবির কল্পনা মাত্র।

রাবণের থেকে রাজনীতি শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে রাম বলেছেন:—

অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয়॥ (লঃ কাঃ)

এইখানে রাম ও যুধিষ্ঠির চরিত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। ভীষ্ম যখন শরশয্যায়, তখন যুধিষ্ঠিরও শত্রু পক্ষীয় যোদ্ধা ভীষ্মের থেকে রাজনীতি শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

রাবণ বধের পর রাম বন্ধু বিভীষণকে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে আদেশ দেন। অগ্রজের মৃত্যুতে বিভীষণ করুণ বিলাপ করতে থাকলে রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, যদিও এই নিশাচর অধার্মিক, দুষ্কর্মরত এবং স্বেচ্ছাচারী, তথাপি রণভূমিতে চিরকাল তেজ, বল ও শৌর্য দেখিয়েছেন। ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। সুতরাং এঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। তাঁর অন্তিম কর্মের উদ্যোগ কর:—

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপেষ্য যথা তব॥ (যুঃ কাঃ) ১০৯।২৫

—মৃত্যুর পর সব শত্রুভাব অবসান হয়। আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ইনি যেমন তোমার স্বজন, আমারও তেমনি। তুমি এঁর

সংকারের জন্য উদ্যোগী হও।

এমন ভাবে শত্রুর গুণগান করবার মত উদারতা একমাত্র রাম চরিত্রেই সম্ভব। অপর পক্ষে মুমূর্ষু শত্রুর প্রতি কঠোর উক্তি করতে যুধিষ্ঠির কখনও দ্বিধা বোধ করেননি।

রামই Man wars not with the dead—প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করেন।

রামের আদেশানুসারে বিভীষণ শাস্ত্র সম্মতভাবে রাবণের দাহকার্য সম্পন্ন করেন। রাবণকে নিহত করে রঘুনন্দন রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তারপর হনুমানকে নির্দেশ দিলেন বিভীষণের অনুমতি নিয়ে লঙ্কায় গিয়ে সীতার নিকট জয়বার্ত্তা পরিবেশন করতে। এবং সীতার সংবাদ নিয়ে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করতে। হনুমান যথাযথ ভাবে রামের আজ্ঞা পালন করেন।

হনুমানের নিকট সীতার অভিলাষের কথা জানতে পেরে রাম বিভীষণকে বলেন, সীতাকে স্নান করিয়ে, দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য ভুষণে ভূষিতা করে শীঘ্র যেন তাঁর নিকট উপস্থিত করানো হয়। বিভীষণ সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে রামের আদেশ তাঁকে জানালেন। সীতা প্রথমে কিছু আপত্তি করেন, পরে বিভীষণের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে উত্তম বসন ভূষণে সুশোভিত হয়ে প্রস্তুত হলেন। বিভীষণ তাঁকে শিবিকায় আরোহণ করিয়ে আনয়ন করেন। শিবিকায় সীতাকে আনবার সময় বেত্রহস্ত উষ্ণীষধারী ও অঙ্গ বস্ত্রধারী ব্যক্তিরা সমবেত দর্শকদের সরাতে লাগলে রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেন—

রাজার গৃহিনী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি॥
কেনবা ঘেরেছ দোলা আমিত না জানি।
কেনবা করিছ তুমি এত হানাহানি॥

ঘুচাও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্জাট॥
যারে উদ্ধারিলাম দেখুক সর্বলোকে।
সতী যে হইবে সে রাখিবে আপনাকে॥ (লঃ কাঃ)

তারপর রাম সীতাকে শিবিকা পরিত্যাগ করে পদব্রজে আসতে নির্দেশ দিলেন। রামের এই আচরণে লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। সীতাও যেন লজ্জায় স্বীয় গাত্র মধ্যে প্রবেশ করলেন।

উদ্ধারের পূর্ব পর্যন্ত সীতার জন্য রামের প্রবল শোক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সীতা উদ্ধারের পর মুহূর্তেই সীতার প্রতি রামের ব্যবহার খুবই অসঙ্গত। এরূপ আচরণের হেতু কি তা সকলকে বোঝাবার জন্য রাম সীতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :—

থাকিতে রাক্ষস ঘরে না হৈত উদ্ধার।
ত্রিভুবন অপযশ গাইত আমার॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে। (লঃ কাঃ)

রাম বলছেন :—

সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥ (যুঃ কাঃ)
১১৫।১৫-১৬

—সুহৃদগণের পরাক্রম দ্বারা যে যুদ্ধে জয়ী হয়েছি, এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি।

প্রাপ্তচারিত্র সন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা। (যুঃ কাঃ) ১১৫।১৭
... ...
রাবণাঙ্ক পরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা। (যুঃ কাঃ) ১১৫।১৮
... ...

শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে। (যুঃ কাঃ) ১১৫।২১

... ...

নিবেশয মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ॥ (যুঃ কাঃ) ১১৫।২৪

—তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপিস্থত হয়েছে। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ। সে তোমাকে কুদৃষ্টিতে দেখেছে। এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি, তবে তো নিজের মহৎ বংশকে কলঙ্কিত করা হয়। যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধাব করেছি, তা সিদ্ধ হয়েছে। এখন তোমার প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, রাক্ষস কিংবা বিভীষণ যাঁকে ইচ্ছা তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পার।

তুমি অনেকদিন রাবণ গৃহে বাস করেছিলে, সুতরাং সে তোমার এমন দিব্যরূপ দর্শনে তোমাকে যে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা মনে হয় না।

বানরকুল, রাক্ষসকুল ও নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সম্মুখে নিরাপরাধী স্ত্রীকে এমন কটূক্তি সমর্থন যোগ্য নয। এই প্রকার আচরণে রাম নিজেকে ও নিজের বংশকে সকলের উপর স্থান দিতে গিয়ে সীতাকে অন্যায়ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে রাম স্বয়ং এবং তার ইক্ষাকু বংশকেই সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেযেছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে প্রাণপ্রিয়া পত্নী সীতার বিরহব্যথাবিধুর হযে সমীরণকে প্রিয়তমার সংবাদ আহরণের জন্য রাম কাতর নিবেদন জানিয়েছিলেন। সেই প্রেমাস্পদকে সম্মুখে পেযে সর্বজনসমক্ষে এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করা খুবই বেদনাদাযক।

ভক্ত কৃত্তিবাস কবি রামচন্দ্রের এরূপ চিত্ত বৈকল্যের সমর্থনে সদ্য বিধবা রাক্ষসীদের অভিসম্পাতই সীতার প্রতি রামের রূঢ় আচরণের কারণ নির্ণয় করেছেন, যেমন দুর্বাসা মুনির শাপে রাজা

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতি অকারণে রূঢ় হয়েছিলেন ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

দীর্ঘকাল অশোকবনে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করে দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত স্বামী সকাশে যখন সীতা আসলেন, তখন তাঁকে দেখেই রাম রুদ্র রূপ ধারণ করে যেভাবে তাঁকে অপমানিত করেছিলেন, তার নিষ্ঠুরতা ও তীব্রতা পাঠক সমাজকে ব্যথিত করেছে।

রামের এরূপ আচরণে সীতা লজ্জিত ও ব্যথিত হয়ে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, স্বামীর এরূপ অপবাদের চিতাই একমাত্র ওষুধ। চিতা প্রস্তুত কর। সীতা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলে বানর ও রাক্ষসগণ হাহা করে উঠে।

ভক্ত কৃত্তিবাস কবিও রাম চরিত্রের এই ত্রুটিকে নিছক বংশ মর্যাদার কারণ, পাঠকদের মধ্যে এ প্রতীতি জন্মাবার উদ্দেশ্যে সীতা যখন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন, তখন রাম মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে বললেন :—

কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল।
সাগরে তুলিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
... ...
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনক কুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুখ। (লঃ কাঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের এই খেদোক্তি কবি কল্পিত। রাম চরিত্র পাঠকবর্গকে যে ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা সীতার প্রতি রামের অশোভন ব্যবহার ও কটূক্তি দ্বারা অনেক পরিমাণে ম্লান হয়েছে। তাই বোধ করি রামের দোষ কিয়ৎ পরিমাণে স্খালনের জন্যই রামকে এভাবে বিলাপ করতে দেখিয়ে কবি বলতে চাইছেন যে সীতার প্রতি রামের এই দুর্ব্যবহার যেন বাহ্যিক।

প্রকৃতপক্ষে সীতা মহামহীয়সী রূপে রাম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

বাল্মীকি রামায়ণে সীতা এভাবে অগ্নিতে প্রবেশ করলে, বানর ও রাক্ষসগণ দুঃখে শোকার্ত্ত হয়ে পড়লে, রাম চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তখন সেই স্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ উপস্থিত হলেন। দেবগণ রামকে সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে বারণ করেন। তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, রাম সর্বজ্ঞ হয়েও অনলে প্রবেশোন্মুখ সীতাকে উপেক্ষা করেছেন এবং নিজে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু হয়েও এ সব বুঝতে পারছেন না। দেবগণ তাঁর স্তুতি করতে লাগলে, রাম বলেন তিনি দশরথপুত্র রাম নামক মনুষ্য মাত্র। সত্যিকার তিনি কে তা দেবগণের নিকট জানতে চাইলেন। তখন ব্রহ্মা বলেন, তিনিই নারায়ণ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী দেবাদিদেব বিষ্ণু, অক্ষয় ব্রহ্ম, চতুর্ভুজ বিষ্বক্‌সেন শ্রীহরি। এইভাবে ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা রাম যে ভগবান তা প্রকাশ করেন।

অগ্নিদেব কোলে করে যখন সীতাকে রামকে দিলেন তখন রাম অগ্নিদেবকে বলেন সীতার পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিলোকবাসীর বিশ্বাসের জন্য অগ্নিতে প্রবেশকারিণী সীতাকে তিনি নিবৃত্ত করেন নাই। তিনি আরও বলেন, সীতাকে বিশুদ্ধ রূপে পরীক্ষার দ্বারা গ্রহণ না করলে, হয়ত সকলে তাঁকে নিতান্ত কামুক বলবে।

রাম নিজেই অগ্নিদেবের নিকট স্বীকার করেছেন সূর্যের প্রভা যেমন সূর্য হতে অভিন্ন, সেরূপ সীতা ও তিনি অভিন্ন। লোক যেমন কীর্ত্তি ত্যাগ করতে পারে না, সেরূপ তিনিও সীতাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

মহাভারতে যদিও অর্জুনের মুখে রামের বালিবধের সমালোচনা ব্যাসদেব করিয়েছেন। কিন্তু সীতার প্রতি রামের এই রূঢ় আচরণ ও ভাষণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কবিকে নীরব দেখি।

যেভাবে নিজের স্ত্রীকে রাম সর্বসমক্ষে অপমান করেছেন, তা

অর্থহীন ও ন্যায় বিচাবে ক্ষমার অযোগ্য। রামের এই কলঙ্ক মোচন কবা দুষ্কর। বামের সমস্ত মহানুভবতা সমস্ত উদারতা তাঁর চরিত্রে যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী সীতার প্রতি অকারণে এরূপ অশোভন ব্যবহারে ম্লান হয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি এমন অবিচার বা যত্র তত্র কথায় কথায় সীতাকে অক্লেশে ত্যাগ করতে বা দান করতে পারা—এই ধরণের প্রগলভ উক্তির দ্বারা রাম স্বীয় ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বটে। কিন্তু এইসব উক্তির দ্বারা সর্বসমক্ষে স্ত্রীর প্রতি তাঁর উদাসীনতা বা লঘু মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতাকে হেয় করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে সীতাব প্রতি রামের এই ধরণের আচরণ যদিও গর্হিত, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে সীতার প্রতি তাঁর এই রূঢ়তার অর্থ নির্ণয় করা যায়।

রাবণের গৃহে বন্দী সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম অন্যায়ভাবে বালিবধ করেন। কারণ বালিবধ না কবলে সুগ্রীবের সাহায্য পাওরা যাবে না। তারপর দুস্তর সাগর বন্ধন করেন। রাম রাবণেব যুদ্ধে হাজাব হাজাব বানরসেনা নিহত হলে, তাদের রক্তে ধরাতল সিক্ত হয়। রাম স্বয়ং, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি যাঁরা তাঁর সহায়তা করেছিলেন, সকলেই রাবণ ও রাক্ষসকুলের হাতে কত না লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। এত কষ্ট, শ্রম, বক্ত ক্ষরণ করে যখন যুদ্ধ জয় করে বিজয়ের অভিজ্ঞান কবতলগত হলো, তখন সেই বহু ঈপ্সিত ও কঠিন শ্রমলব্ধ বিজয়লক্ষ্মীকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত কবা যেমন সাধাবণেব বিস্ময় জাগায়, তেমনি যিনি এরূপ আচরণ করতে সক্ষম তাঁর দেবোপম চরিত্র সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে। রামেব এ ধবণের আচরণ নানাজনের বিরূপ সমালোচনার বিষয় বস্তু হয়েছে সন্দেহ নেই।

আপাতদৃষ্টিতে সীতাব প্রতি রামের এরূপ ব্যবহার খুবই

নির্মম, হৃদয়হীন। কারণ সীতা অগ্নির চেয়েও পবিত্র। এরূপ সতীসাধ্বী স্ত্রী সীতাকে একমাত্র দুর্ধর্ষ কামার্তের ঘরে একাকী দীর্ঘ দিন বন্দী থাকার জন্য, তাঁর চরিত্রে সন্দেহ করে কেবল সন্দেহের উপর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা বেদনাদায়ক। কারণ ত্রিভুবনবাসী জানে সীতা নিষ্কলঙ্ক ও নিরপরাধী। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও রাম যদি সীতাকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতেন, তবে তাঁর প্রখ্যাত বংশের গৌরব নষ্ট হতো। তাঁর দেব চরিত্রে এক কলঙ্ক রেখা ফুটে উঠতো।

সীতা কখনো রামকে রূঢ় কথা বলেননি। রাম যখন তাঁকে যত্র ইচ্ছা তত্র যেতে পারেন বলে সীতার অবমাননা করেন, তখন কবি সীতার মুখে রামের আচরণের প্রতিবাদ করে বলেছেন—নিম্নশ্রেণীর পুরুষ, নিম্ন শ্রেণীর নারীর প্রতি যেমন কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, তুমিও আমাকে তেমনি রূঢ়, শ্রুতিকটু বাক্য শোনাচ্ছ।

যখন অগ্নিদেব ক্রোড়ে করে সীতার অক্ষতদেহ নিয়ে রাম সমীপে উপস্থিত হলেন, তখন রাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন—

অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা॥
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকী সবিশোধ্যহি॥
অনন্যহৃদয়াং সীতাং সচ্চিত্ত পরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্ম
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥ (যুঃ কাঃ)

১১৮।১৩-১৬

—এই কল্যাণি সবলোকের মধ্যে অধিক পবিত্রা তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাবণের অন্তঃপুরে বাস করেছেন।

তিনি বিশুদ্ধ এ প্রমাণ না করে যদি তাঁকে গ্রহণ করতাম, তবে লোকে দশরথপুত্র রামকে নিতান্ত কামুক ও অর্বাচীন বলে নিন্দা করতো। জনকনন্দিনী সীতা যে অনন্যহৃদয়া এবং আমাতেই একান্ত অনুরাগিনী তা আমার জ্ঞাত। যেমন সমুদ্র বেলাভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না, সেরূপ রাবণও নিজের তপোবলে নিজেকে রক্ষা করা সীতাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

এ স্বীকৃতি কেবল অগ্নিদেবের কাছে নয়, এ স্বীকৃতি পাঠকবর্গের কাছেও যেন দেওয়া হয়েছে। রামের এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কি নিষ্ঠুর বলা যায়? না তাঁকে মানবোত্তর বলে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানানো উচিত?

সীতার অগ্নি প্রবেশের সময় পিতা দশরথও উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেন। রাজা দশরথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আশীর্বাদ করেন। কৈকেয়ীর দেওয়া দুঃখ তাঁকে তখনো বিদ্ধ করছে বলেন। রাম কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করেন। রাজা দশরথ সম্মত হন। তিনি রামকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করতে আদেশ করেন। অতঃপর রাম ইন্দ্রর নিকট হতে বর পেয়ে তাঁর যেসব মিত্র রণে হত হয়েছিল, তাদেব পুনরুজ্জীবিত করেন।

কিছুদিন বিভীষণের সঙ্গে কাটিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ তাঁর ভ্রাতা ভরতকে দেখবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, গুহক প্রভৃতি সুহৃদগণ তাঁর দর্শন লাভেব জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। তিনি বিভীষণের নিকট বিদায় চাইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ তাঁর তেজস্বী বিমান পুষ্পককে আহ্বান করেন।

অতঃপব রাম বিভীষণকে বানরবৃন্দকে ধনরত্নাদি প্রদানে আপ্যায়িত করবার জন্য অনুরোধ করেন। এর দ্বারা বানরযূথ-পতিগণ সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হবেন, এবং সকলেই বিভীষণের অনুগত

হবেন। রামের অনুরোধে বিভীষণ সকল বানরকেই ধনরত্ন দিয়ে সম্মানিত করেন।

রামও ইহাতে পরিতৃপ্ত হয়ে লজ্জাবনতমুখী সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে পরাক্রমশালী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করেন। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরবৃন্দকে রাম তাঁদের অভিলষিত স্থানে যাবার অনুমতি দিলেন। রামের এই আদেশ পেয়ে শ্রেষ্ঠ বানরবৃন্দ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ রামের সঙ্গে অযোধ্যা-নগরে যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। রাম তাঁদের এই অভিপ্রায় জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁদের সকলকে বিমানে আরোহণ করবার জন্য আহ্বান করেন। রামের এ আদেশ পেয়ে বানরগণের সঙ্গে সুগ্রীব ও সপারিষদ বিভীষণ সেই পুষ্পক রথে আরোহণ করলে সেই রথ রঘুনন্দনের অনুমতি পেয়ে উড়ে চললো।

আকাশ পথে চলতে চলতে রাম সীতাদেবীকে ত্রিকূট শিখরে অবস্থিত লঙ্কা নগরী দর্শন করতে বলেন, রক্তাপ্লুত রণভূমির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ যে সব স্থানে হত হয়েছিল, তিনি ঐ সব স্থান সীতাকে দেখালেন। তারপর কিষ্কিন্ধ্যা নগরী তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, রাম কোথায় বালিকে নিহত করেন সে স্থান সীতাকে দেখান। তখন সীতা তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের মহিষীগণ ও বানরদের পত্নীদেরও অযোধ্যায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাম সীতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তারার আজ্ঞা পেয়ে বানর রমনীগণ সুসজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বিমানে আরোহণ করে।

বিমান দ্রুত চলতে থাকে ও ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে আসলে রাম সুগ্রীবের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হয়ে বালিবধ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে সীতাকে বলেন। যে স্থানে খর, দূষণ, ত্রিশিরাকে বিনাশ করা হয়েছিল, রাম সেস্থানও সীতাকে দেখান। পথে পঞ্চবটি আশ্রমের

সেই পর্ণশালা যেখান থেকে রাবণ সীতাকে চুরি করেছিল, রাম পুনরায় তাতে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

এভাবে যে সব আশ্রমে তাঁরা বাস করেছেন, সে সব আশ্রম আবার তাঁরা দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। অতঃপর তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রাম মুনিকে প্রণাম করে রাজ্যের মাতৃবৃন্দের ও প্রজাগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। ভরদ্বাজমুনি রামকে জানান তাঁর গৃহে সকলেই কুশলে আছেন। মুনি আরও জানান যে রাম বনবাসকালে যে সব দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন বা ব্রাহ্মণ ও মুনিদের জন্য যে সব সৎ কাজ করেছেন, সীতাহরণ ও উদ্ধার প্রভৃতি সব ঘটনাই তাঁর জানা আছে। তিনি রামকে বর দিতে চাইলেন। রাম এ বর প্রার্থনা করলেন যে অযোধ্যা যাবার পথে বৃক্ষগুলি যেন অকালে ফলসমৃদ্ধ হয় ও মধুক্ষরণ করে। মুনি সেই বরই দিলেন। অযোধ্যা যাবার তিন যোজন পথের বৃক্ষগুলি ফলে পরিপূর্ণ, তরুলতা পুষ্পিত হলো ও শুষ্ক বৃক্ষগুলিও মধুক্ষরী হলো। বানররা মনের আনন্দে ফল ও মধু খেয়ে অযোধ্যার পথে যেতে থাকে।

অযোধ্যা নগর দর্শনে রাম হনূমানকে ভরতেব মনোভাব জানবার জন্যে তাঁর কাছে পাঠালেন। রাম বললেন:

সর্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কস্য নাবর্ত্তযেন্মনঃ॥ (যুঃ কাঃ) ১২৫।১৬

—হস্তী, অশ্ব, রথসমূহ সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ এবং পিতৃ পিতামহ ক্রমে প্রাপ্ত রাজ্য পেলে কার না মনের পরিবর্ত্তন ঘটে।

কিছু পূর্বে রাম ভবদ্বাজমুনির থেকে জানতে পেরেছিলেন যে ভরত জটা বল্কল পরে রামের আজ্ঞানুসাবে তাঁব পাদুকা যুগল সামনে রেখে রামেব প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন কবছেন ও বামের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করছেন। অতএব সুসমৃদ্ধ রাজ্য সম্পদ প্রাপ্ত

ভরতের মনের অবস্থা জানবার কোন প্রয়োজনই রামের ছিল না।

হনুমান মানুষের বেশে ভরত সমীপে উপস্থিত হলেন। নানা কথার পর রামের বনবাস কালে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে, রাম অযোধ্যার পথে এ সংবাদ হনুমান ভরতকে জানালেন। হনুমানের মুখে এই সংবাদ পেয়ে ভরত খুবই আনন্দিত হলেন। এবং বহুকাল পরে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো বললেন।

তারপর ভরত প্রজাগণ ও হনুমানের সঙ্গে রামকে স্বাগত জানাবার জন্য নন্দিগ্রামে গেলেন। রামের সঙ্গে তাঁদের পুনর্মিলন হলো। শত্রুঘ্নও রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রণাম করলেন। অতঃপর রাম জননী কৌশল্যাকে প্রথমে ও পরে মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে প্রণাম করেন। তারপর তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামের প্রত্যাবর্ত্তনে সমগ্র অযোধ্যাপুরী আনন্দ সাগরে মগ্ন হলো।

অনন্তর ভরত রামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই রাজ্য আমার জন্য ত্যাগ করে তুমি আমার মাতার মান রেখেছিলে। তুমি আমাকে যেমন এ রাজ্য দিয়েছিলে, আমিও সেরূপ তোমাকে তা প্রত্যর্পণ করলাম। প্রজারা তোমার অভিষেক দেখে আনন্দিত হোক।

বহু আড়ম্বরের সঙ্গে রামের অভিষেক সমাপ্ত হলো। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান ও অন্যান্য বানরযূথপতিগণ বহুপ্রকারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করে রাম লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভরত বয়োজেষ্ঠ্য, সুতরাং তাঁকে অতিক্রম করে নিজে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে লক্ষ্মণ অস্বীকার করেন। তখন ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।

এখানে রামের এরূপ পক্ষপাতিত্ব অসঙ্গত ও অশোভনীয়। রাম বার বার ভরতের প্রতি অবিচার করেছেন। হয়ত লক্ষ্মণ তাঁর আবাল্যের সহচর ও সুখে দুঃখে সমভাগী, তাই লক্ষ্মণের প্রতি

রামের সহজাত একটা দুর্বলতা ছিল। সেই জন্যই লক্ষ্মণের প্রতি রামের এই পক্ষপাতিত্ব।

শত্রুঘ্ন লবণ রাক্ষস বধ করতে যাবার প্রাক্কালে রাম তাঁকে অভিষিক্ত করতে চাইলেন, তখন শত্রুঘ্ন বলেছিলেন :—

অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর।

কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠষু কনীয়ানভিষিচ্যতে॥ (উঃ কাঃ) ৬৩।২

—হে নরপতি কাকুৎস্থ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরূপে অভিষিক্ত হবে? আমি ঐরূপ অভিষেককে অধর্ম বলে মনে করি।

এবারেও রাম ভরতের প্রতি অবিচাব করেছেন। ভবতের ন্যায়নিষ্ঠা, ত্যাগ ও মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও, রামের ভরতের প্রতি এ ধরণের আচরণ খুবই দৃষ্টিকটু। হয়ত বনবাসের জন্য রামের অন্তরে ভরতের প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব নিহিত ছিল—যার বহিঃ প্রকাশ ভরতের প্রতি বার বার অবিচারের মাধ্যমে। মানুষ রামের পক্ষে ভরতের প্রতি এই অন্যায় আচরণ হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু লোকোত্তর রামেব পক্ষে এই অবিচার কি নিন্দনীয় নয়?

বিদ্যাসাগরের ভাষায় রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে বাজ্যশাসন ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করতে থাকেন। বামের রাজত্ব কালে দেশ সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

একদিন রাম সখা ও পারিষদবর্গ নিয়ে হাস্য পরিহাসে মগ্ন ছিলেন। তাঁর বন্ধুবা নানা প্রকার আলোচনা কবছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বাম একজনকে জিজ্ঞেস কবলেন—

কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিষয়েষু চ।

—ভদ্র, বর্ত্তমানে নগরে কোন বিষয়ে বিশেষ চর্চা হচ্ছে?

পৌব ও জনপদবাসীগণ আমার বা জানকীর বা ভরত, লক্ষ্মণ বা

শত্রুঘ্ন সম্বন্ধীয় কোন কোন কথা আলোচনা করে থাকে।

ভদ্র বললেন, সকলেই আপনার ভূয়সী প্রশংসা করছে। আপনার রাজত্বে জনগণ সুখে সমৃদ্ধিতে বাস করছে। দেশে রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু নেই। কিন্তু ভদ্র করযোড়ে বলেন :—

হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতা মাহৃতা রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥ (উঃ কাঃ) ৪৩।১৬

—রঘুনন্দন যুদ্ধে রাবণকে বধ করে সীতাকে হরণ করার জন্য রাবণের উপর ক্রুদ্ধ না হয়ে পুনরায় সীতাকে আপন প্রাসাদে এনেছেন। রাবণের দ্বারা অপহৃত সীতাকে রাম কি করে গ্রহণ করলেন, তা বুঝতে পারি না। রাজার অনুকরণে আমাদেরও স্ত্রীদের এই অপরাধ সহ্য করতে হবে। হে নরশ্রেষ্ঠ, প্রজাদের মুখে এই রকম আলোচনা হচ্ছে।

বন্ধুর এই উক্তিতে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি অন্যান্য বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেন, এ রকম সমালোচনা কি সত্যিই শোনা যাচ্ছে। সকলে অবনত মস্তকে স্বীকার করেন যে ভদ্রের কথা সত্য।

কবি কৃত্তিবাস এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট ছবি ফুটিয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে, রাম একদিন সরোবরে স্নান করতে গেলে, এক ধোপা শ্বশুর ও তার জামাতার ঝগড়া শ্রবণ করেন। ঝগড়ার ছলে জামাতা শ্বশুরকে বলছে :—

থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতায় প্রহর নিশি কেহ নাহি সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥
রাম হেন নাহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীন জাতি ॥

... ...

ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়।
রাম বলেন ভদ্রের বচন মিথ্যা নয় ॥ (উঃ কাঃ)

বন্ধুগণকে বিদায় দিয়ে রাম তাঁর তিন ভ্রাতাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা রাম সমীপে উপস্থিত হয়ে রামকে কাঁদতে দেখলেন। তারপর বিষণ্ণ মুখে রাম ভ্রাতাদের নিকট প্রজাদের মুখে সীতা সম্বন্ধীয় নিন্দাবাদের কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে লোক নিন্দা ভয়ে তিনি নিজের জীবন বা ভ্রাতাদের ত্যাগ করতে পারেন। সীতা ত তুচ্ছ।

পূর্বদিন গর্ভবতী সীতা তপোবন দেখবার অভিলাষ প্রকাশ করলে, রাম তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন পরদিন সকালে সীতাকে রাজ্যের বাইরে তমসা নদীর তীরে বাল্মিকীর পূণ্য আশ্রমে ত্যাগ করে আসতে।

সীতার ঐ অবস্থায় বিনা দোষে কেবলমাত্র প্রজার তুষ্টির জন্য তাঁকে ত্যাগ করা কি রামের উচিত হয়েছে? স্বয়ং অগ্নিদেব, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, স্বয়ং মহারাজা দশরথ সীতার সতীত্ব সন্দেহাতীত বলে অভিমত প্রকাশ করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র লোকাপবাদ স্তব্ধ করতে সীতার নির্বাসন কি বাঞ্ছনীয়?

তাছাড়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘকাল তিনি সীতার সঙ্গে একান্তে বসবাস করেছেন। সুতরাং সীতার চরিত্র ও ব্যবহার তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তবু কেবল মাত্র নিজের যশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সীতার ন্যায় পত্নীকে ত্যাগ করা কি রামের মত আদর্শ পুরুষের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত?

সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পরিত্যাগ করে ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্মণ যখন ফিরছিলেন, তখন পথে সুমন্ত্র তাঁকে জানালেন যে পূর্বজন্মে বিষ্ণু ভৃগুমুনির অভিশাপে রাম রূপে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে বহু বর্ষব্যাপী স্ত্রী বিরহ ব্যথা ভোগ করবেন এই অভিশাপ দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা মহর্ষি দুর্বাসা মহারাজ দশরথকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন। তাই রামের সীতা বর্জন ভৃগুমুনির অভিশাপের প্রতিফল।

অতএব সীতার নির্বাসনও প্রারব্ধ কর্মফল, আকস্মিক ঘটনা নয়। দৈবের নিবন্ধ মাত্র। কৃতকর্মের ফল অবশ্যি তাঁকে ভোগ করতে হবে। সুতরাং সীতার নির্বাসনের জন্য রামকে তত দায়ী করা যায় না, যতটা করা উচিত তাঁর ভাগ্যকে। তিনি যেন ভাগ্যের হাতে ক্রীড়ণক, তার অমোঘ নির্দেশে চালিত হচ্ছেন। নিয়তির নির্দেশ কত নির্মম।

সীতা নির্বাসনের ব্যাপারে রাম ভ্রাতাদের প্রতিবাদ করতে বারণ করেন। অযোধ্যানগরীতে তাঁর গুরুস্থানীয় কোন শুভার্থীর সঙ্গে কোন পরামর্শ কবেননি। জননীদের অভিমত গ্রহণ করেননি। তিনি একাই এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—প্রজারঞ্জনের জন্য জানকীর নির্বাসন।

সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে পরিত্যাগ করে লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রামের গৃহদ্বারে এসে দেখলেন রাম

"দীনমাসীনং" ও "নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং"

—দীন ভাবাপন্ন ও লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ।

লক্ষ্মণের সান্ত্বনার পর রাম বলেন—

চত্বারো দিবসা সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ অকুর্বাণস্য।

—লক্ষ্মণ, চারদিন পৌরজনদের কোন কার্য করা হয়নি। কার্যার্থী নরনারীর তত্ত্বাবধান করতে তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন।

এ প্রসঙ্গে রাম রাজা নৃগ, মহর্ষি নিমি, উর্বশী, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও যযাতির উপাখ্যান দ্বারা রাজকর্মে অবহেলায় রাজাদের কি অপবাধ হয় তা লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে দিলেন।

লক্ষ্মণ দ্বার হতে ফিরে গিয়ে রামকে জানালেন যে তাঁর রাজ্যে কারো কোন প্রকার অভিযোগ নেই, তাই কোন অভিযোগকারী পুরুষ বা নারী আসেনি।

রাম রাজ্যে পশুপক্ষীরাও রামের নিকট বিচার প্রার্থী হতো। যুধিষ্ঠিরও পশু পক্ষী আদি যোনিব প্রাণিগণের উপর দয়ার্দ্র ছিলেন।

যখন রাম প্রজাপালনের নিয়ত ব্যাপৃত, বসন্তকালের এক বিমল প্রভাতে যমুনাতীরবাসী শতমুনি ঋষি রামের নিকট এসে জানালেন বাবণের ভাগ্নে লবণ রাক্ষস ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করেছে। রুদ্রদত্ত শূলের প্রভাবে লবণ অজেয়। যেহেতু রাম রাবণকে বধ করেছেন, তাই তাঁরা লবণকে দমন করবার জন্য রামের শরণাপন্ন হয়েছেন। ঋষিগণের নিকট লবণাসুবের আচার ব্যবহারের কথা জেনে নিয়ে শত্রুঘ্ন এই অসুরকে বধ করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন কবলেন। রাম লবণকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠালেন। শত্রুঘ্ন লবণকে সংহার করেন। রাম পূর্বাহ্নেই শত্রুঘ্নকে বলে দিয়েছিলেন কিরূপে লবণাসুরকে শূলশূন্য অবস্থায় পাওয়া যাবে।

একদিন এক ব্রাহ্মণ তাঁর চৌদ্দ বৎসরের মৃত পুত্রকে কোলে করে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে বলেন॥—

না করেন রাজ্য চর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর॥

... ...

অকালে মরিলে পুত্র রামরাজ্যে বসি॥
পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা॥
অধর্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥ (উঃ কাঃ)

রাম ব্যথিত ও সন্তপ্ত হয়ে স্বীয় মন্ত্রীদের, মুনিদের এবং ভ্রাতাদের আহ্বান করে তাঁদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তখন নারদ বললেন:—

অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালে দ্বিজের পুত্র মরে॥

তিনি রামকে শাস্ত্রের কথা শুনিয়ে বলেন—

সত্য যুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার ॥
ত্রেতা যুগে তপস্যা ক্ষত্রিয় অধিকার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার ॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি। (উঃ কাঃ)

এ নিয়ম ব্যতিক্রম করে ত্রেতা যুগে এক শূদ্র তপস্যা করছে এ রাজ্যে।

রাম বহু অন্বেষণ করে অবশেষে দেখলেন ঃ—

এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে ॥ (উঃ কাঃ)

রাম তাঁব পরিচয় জানতে চাইলেন ঃ—

তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বুক নাম ধরি আমি শুন মহামতি ॥
করিব কঠোর তপ দুর্লভ সংসারে
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ (উঃ কাঃ)

রাম তখন তার মস্তক ছেদন করেন। শম্বুক বধে দেবতারা তুষ্ট হলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে রামকে বর দিতে চাইলেন।

বাম বলেন দ্বিজপুত্র প্রাণ ফিরে পায়।

উত্তরে ব্রহ্মা বলেন ঃ—

শূদ্রকাটা গেল দ্বিজ বাঁচিল আপনি ॥
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন ॥
দৃষ্টে সৃষ্টিনাশ কর নিমেষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য মায়া বুঝে কোন জন ॥ (উঃ কাঃ)

কবি কৃত্তিবাস এইখানে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে রাম যে নররূপী নারায়ণ তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে ঃ—

জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥
যস্মিন্মুহূর্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত ॥ (উঃ কাঃ) ৭৬।১৪-১৫

—যে মুহূর্তে শূদ্রকে বধ করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ পুত্র জীবন লাভ করে তার বন্ধুদের সঙ্গে সমবেত হয়েছে।

দেবতাগণ রামের মঙ্গল কামনা করে অগস্ত্য মুনিকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে তাঁরা রামকেও সেই মহামুনিকে দেখতে যেতে অনুরোধ করেন। দেবতাদের কথা মত রামও ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে দেখবার জন্যে গিয়ে অগস্ত্য মুনির আতিথ্য গ্রহণ করেন। অগস্ত্য মুনি রামকে বিশ্বকর্মার তৈরী দিব্য আভরণ উপহার দিলেন। রাম তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। ঋষি অগস্ত্য নানা যুক্তি দিয়ে তা গ্রহণ করতে রামকে রাজি করান।

মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রম হতে প্রত্যাগমন করে রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাম ভ্রাতাদের এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানতে চাইলেন।

পরাক্রান্ত রাজারা বশ্যতা স্বীকার না করলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এতে অনেক রাজবংশ নষ্ট হবার সম্ভাবনায় ভরত রামকে এই যজ্ঞ করা হতে নিবৃত্ত করলেন।

বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ।
তস্মাচ্ছৃণোমি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল॥ (উঃ কাঃ)
৮৩।২০

—হে লক্ষ্মণাগ্রজ, শুভ বাক্য বালকেরা বললেও তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। তোমাব যুক্তিযুক্ত কথা আমি গ্রহণ করলাম।

রাম ও ভরতের কথাবার্ত্তা শেষ হলে, লক্ষ্মণ বলেন অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আছে—যা পাপনাশক, শোধক ও কষ্টসাধ্য। অতএব ঐ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার জন্য বামকে তিনি অনুবোধ করেন। লক্ষ্মণেব প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হযে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে সমর্থ বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতিকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের নিকট অশ্বমেধ যজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা শুনে রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতিকে

অশ্বমেধ যজ্ঞের আনন্দ উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করতে আদেশ দেন। রাম ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষি, রাজা প্রভৃতির নিকট দিকে দিকে এই যজ্ঞের আমন্ত্রণ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। ভরত জননীদের অন্তঃপুরবাসী রমণীদের (ভ্রাতাদের স্ত্রীদের) ও অন্যান্যদের সঙ্গে যজ্ঞে দীক্ষিত হবার জন্য সীতার কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তি নিয়ে নৈমিষারণ্য মধ্যে গোমতী নদীতটে যজ্ঞভূমির দিকে পূর্বে গমন করলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষার জন্য একশত মন স্বর্ণ দিয়ে সীতার এই কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছিল। এই মূর্ত্তি দর্শন করে কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম বিলাপ করতে থাকেন—

সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথ কে দিবে উত্তর॥
এক দৃষ্টে চাহেন সীতার সোনামুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ॥
সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি।
সোনার সীতা দেখিয়া বঞ্চিল সাত রাতি॥
সাত রাত্রি বঞ্চিয়া রাম আইল বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর॥ (উঃ কাঃ)

কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে রামের এইরূপ কোন বিলাপ নেই। কবি কৃত্তিবাস রামকে অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব রূপে চিত্রিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণ ও কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে একটি বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কবি কৃত্তিবাস বলেছেন রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে রাম ও তাঁর তিন ভাইয়ের সঙ্গে লবকুশের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে লবকুশের হাতে রাম ও তাঁর তিন বীর ভ্রাতা নিহত হন এবং হনুমান ও জাম্বুমান বন্দী হন। সীতা জানতে পেরে হনুমান ও জাম্বুমানকে মুক্তি দেন। বাল্মীকি মুনি রাম ও তিন ভ্রাতাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু এই উপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না।

মহাসমারোহে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হলো। মুনিঋষি, বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণ, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুগণ ও নৃপতিগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের আনন্দোৎসব দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিও আমন্ত্রিত হয়ে সীতার যমজ সন্তান লবকুশকে সঙ্গে নিয়ে সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। বাল্মীকির নির্দেশে লবকুশ রাজপথে ও রাজভবনে উদাত্তকণ্ঠে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান করেন। মহর্ষি বাল্মীকি লবকুশকে আরও বলেন যে যদি মহারাজ রামচন্দ্র তাদের গান গাইবার জন্য আহ্বান করেন তবে তাঁকে অবজ্ঞা না করে যথাযোগ্য গান গাইবে। মহারাজ যদি তোমাদের প্রশ্ন করেন তোমরা কার পুত্র, তবে তোমরা উত্তরে জানাবে, তোমরা বাল্মীকির শিষ্য।

রাত্রি প্রভাত হলে লবকুশ প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করে মহর্ষি যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমন সম্যক রামায়ণ গাইতে থাকেন। রাম, সমবেত মুনিঋষি ও নৃপতিগণ পরম আগ্রহে বালক-দ্বয়ের রামায়ণ গান শুনতে থাকেন। রাম বিংশতি সর্গ পর্যন্ত শ্রবণ করে ভ্রাতা ভরতকে কুমারদ্বয়কে স্বর্ণ মুদ্রা ও তাদের অভিলাষ মত দ্রব্যাদি দিয়ে পুরস্কৃত করতে আদেশ দেন। রামের আজ্ঞানুসারে ভরত বালকদ্বয়কে সুবর্ণ মুদ্রা ইত্যাদি দিতে গেলে, তাঁরা কিছুই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এবং আরও বলেন যে তাঁরা বনবাসী, অতএব এ সব সোনা নিয়ে তাঁরা কি করবেন? বালকদের এ রকম জবাব শুনে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। রামও উৎসুক হয়ে বালকদ্বয়কে রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জিজ্ঞেস করেন, এই মহাকাব্যের রচয়িতা সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন করেন। বালকদ্বয় রামায়ণের রচনা সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর দিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি এই মহাকাব্যের রচয়িতা বলে রামকে জানান। রামচন্দ্র মহর্ষিগণ, ভূপতিগণ, বানরগণের সঙ্গে বহুদিন ধরে এই শুভ সঙ্গীত শোনেন। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে লবকুশ যে সীতার

পুত্র তা অবগত হন।

অতঃপর রাম মহর্ষি বাল্মীকিকে বলে পাঠালেন ঃ—

যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।

করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম (উত্তর) ৯৫।৪

—(সীতা) যদি শুদ্ধাচারী ও নিষ্পাপ হন, তবে মহামুনির অনুমতি নিয়ে নিজের বিশুদ্ধির পরীক্ষা দিন।

পরীক্ষা লইয়া সীতা আন মম ঘরে। (উঃ কাঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম পুনরায় সীতার সতীত্বের পরীক্ষা নেবেন শুনে কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা জননীত্রয় তাঁকে বলেন ঃ—

কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার ॥

... ...

সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি।

নাহিক সীতার পাপ জানে সর্বপ্রাণী ॥

সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাস ॥ (উঃ কাঃ)

প্রত্যুত্তরে রাম জননীদের বলেন ঃ—

পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥

... ...

রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।

স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ॥ (উঃ কাঃ)

এখানেও দেখা যাচ্ছে লোকাপবাদের ভয়ে ভীত রাম সর্বসমক্ষে স্ত্রীকে পুনরায় সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে নিজের বিশুদ্ধিতার প্রমাণ দিতে বলছেন। তিনি বাবংবার প্রজাদের তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন।

স্ত্রীর অনাচারে সংসার নষ্ট হবে—এই উক্তিটি সীতার সম্বন্ধে কখনো প্রযোজ্য নয়। সীতার সতীত্বের সাক্ষী লক্ষ্মণ। তদুপরি বাল্মীকি মুনিও বলেছেন ঃ—

সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি।

... ...

মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে ॥

... ...

ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥ (উঃ কাঃ)

রাম নিজেও জানেন লবকুশ তাঁর যমজ সন্তান। সীতা দেবতাদের সামনে পূর্বেই তাঁর নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিয়েছেন। এর পরও পুনরায় সীতাকে তাঁর সতীত্বের প্রমাণ দিতে বলা, কেবলমাত্র প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য—আপাতদৃষ্টিতে রামের মহৎ চরিত্রে এইটি এক কলঙ্ক বিন্দু। রাম স্বয়ং নারায়ণ হয়েও সাধারণ মানুষের মত অপবাদের ভয়ে ভীত। আত্মতুষ্টি বা তাঁর বংশের মর্যাদার জন্য যা সত্য তা উপেক্ষা করে, তিনি দ্বিতীয়বার সীতাকে নিগ্রহ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যদিও তেজোদীপ্ত কণ্ঠে মহর্ষি বাল্মীকি বলেছিলেন যে আচারে ব্যবহারে সীতা শুদ্ধা, নিষ্পাপ, পতিকেই দেবতা বলে জ্ঞান করেন, যমজ লবকুশ রামেরই সন্তান—তিনি কখনও মিথ্যা ভাষণ করেছেন বলে তাঁর স্মরণ নেই ইত্যাদি।

মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥ (উত্তর) ৯৬।২১-২২

—যদি সীতা নিষ্পাপ হন, তবে আমি কায়মনোবাক্যে যে পাপ কর্ম করিনি, সেই পাপহীন কর্মের ফল ভোগ করব। আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা সীতা শুদ্ধ ও পবিত্র জানতে পেরে বনের মধ্যে এক ঝর্ণার নিকট সীতাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম।

ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি নিজের সমস্ত পুণ্য পণ রেখে নিশ্চিতভাবে বলেন যে সীতার মত সাধ্বী দ্বিতীয়া আব নেই। সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাল্মীকি মুনি রামকে বলে পাঠালেন

যে তাঁর (রাম) অনুমতি পেলে সীতা তাঁর বিশুদ্ধিতার প্রমাণ দেবেন।

মহর্ষি বাল্মীকিও সীতার বিশুদ্ধিতার প্রমাণ দানের স্বপক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ রাজপদ ও রাজকর্তব্য বড় কঠোর। প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান কর্তব্য। তার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে পদমর্যাদা ও বংশ গৌরব। এ সমস্ত অমূল্য সম্পদকে কলঙ্ক-মুক্ত রাখতে হলে রাম যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা অতি নির্মম হলেও তা-ই যুক্তিযুক্ত। এই কারণেই বোধহয় রামের এই আচরণের মহর্ষি বাল্মীকিও কোনরূপ সমালোচনা করেন নি।

এ প্রসঙ্গে বর্ত্তমান যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পিতার মৃত্যুর পর অষ্টম এডওয়ার্ড গ্রেট বৃটেনের সিংহাসন পেলেন। কিন্তু সিংহাসন পাবার পূর্ব হতে, মিসেস সিমসন নাম্নী এক সুন্দরীর সঙ্গে তিনি গভীর সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সৌহার্দ্য প্রেমে পরিণত হলো। কিন্তু সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যের আচার ও প্রথামত এবং রাজবংশের কৃষ্টির ও মর্যাদার জন্য ও লোকোপবাদ ভয়েও ইংলণ্ডেশ্বর একজন সাধারণ ঘরের মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রেম গ্রেট বৃটেনের মত রাজ্যের রাজমুকুট হতে প্রবল হলো। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড অবলীলা ক্রমে ইংলণ্ডের রাজমুকুট ত্যাগ করে তাঁর প্রণয়িনীকে বিবাহ করেন।

রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড ইচ্ছা করলে রাজ্যের বহুকালের প্রথাকে বা রাজবংশের সব মর্যাদাকে উপেক্ষা করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর প্রণয়িনীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তা রাজোচিত কর্ম হত না। কারণ রাজারা ভূতলে ভগবানের, ধর্মের প্রতিনিধি। ব্যভিচারী ব্যতীত পদমর্যাদা কুল গৌরব তুচ্ছ বা ক্ষুণ্ণ করে কোন রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকে না বা রাজ্যশাসন করে না। রাজসুখ, রাজ্যভোগ, রাজসম্মান যেমন আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু রাজকর্ত্তব্য বড়ই নির্মম, অতিশয় কঠোর।

There is no right without a parallel duty, no liberty without the supremacy of law, no high destiny without earnest perseverence, no greatness without self denial—Lieber. রাম এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ বর্জনের ঘটনাও রামানুসৃত একই সমাজনীতি বা ধর্ম-নীতি। অনুজ লক্ষ্মণ যিনি অশনে ব্যসনে বনে রণে রামের নিত্য সহচর—যাঁর স্থান সীতার পরে বা রাম যাঁকে একাত্মা মনে করতেন—এমন লক্ষ্মণকে সত্য রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে ত্যাগ করা তাঁর ধর্মাচরণের একনিষ্ঠতার অন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁরা মহত্তর শ্রেণীভুক্ত তাঁদের জীবনে দেশকাল ব্যতিরেকে কর্ত্তব্য সাধনে এ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়।

রোম ও গ্রীক মহাকাব্যেও রাজ্যের জন্য ধর্মের জন্য এ প্রকার নির্মম কর্ত্তব্যসাধন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাকবি Virgilএর Aeneid কাব্যের নায়ক Æneasএর জন্য তাঁর প্রেমিক Didoর আত্মহত্যা বা রাজ্যের জন্য রাজা Agamemnonএর কন্যা Iphigeniaকে বলি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা অবিচলিত হৃদয়ে রাজধর্ম পালনের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গ্রীক রাজা Agamemnon দেবী Artemisএর আদরের হরিণকে বধ করেন। দেবীকে পরিতুষ্ট করবার জন্যে তিনি মানত করেন যে আগামী বারমাসের মধ্যে তিনি অতি সুন্দর যে জিনিষটি লাভ করবেন, তা তিনি দেবীর পরিতুষ্টির জন্য বলি দেবেন। এই নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁর অতি সুন্দরী প্রথমা কন্যা Iphigenia জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু রাজা তাঁর মানত রক্ষা করলেন না। তাঁর রাজ্যের রণতরী ট্রয় অভিমুখে যাচ্ছিল। Calchas রাজাকে বলেন যদি রাজা তাঁর মানত রক্ষা না করেন, তবে রণতরী প্রতিকূল বাতাসের জন্য অগ্রসর হতে পারবে না। তখন রাজা Agamemnon তাঁর যুবতী কন্যা Iphigeniaকে বলি দেবার জন্য যূপের কাছে নিলে

দেবী Artemis বলিকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই স্থানে এক হরিণীকে রেখে যান। রাজ্য রক্ষার জন্য Agamemnon তাঁর স্নেহের কন্যাকে এ ভাবে বলি দিলেন।

অনুরূপ ভাবে প্রথম কন্‌সাল্‌ Brutus Junius তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁর দুই পুত্রের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর পুত্রদ্বয় নির্বাসিত Tarquinকে তাঁর সিংহাসন প্রত্যর্পণ করার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

The public father who the private quelled
And on the dread tribunal sternly sat.—Thomson

পুত্রদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড দিতে Brutus এর বুক কখনো কাঁপেনি। এ সব মহৎ ব্যক্তিরা নিষ্কম্প ও নিষ্করুণ ভাবে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করেন বলেই সকলে তাঁদের শ্রদ্ধা করে এবং সর্বসাধারণের উর্দ্ধে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করে।

সীতা বা লক্ষ্মণের প্রতি রামের এই নির্মম আচরণও তাঁর অন্যতম রাজধর্ম।

মহর্ষি বাল্মীকির কথা শুনে রাম সীতাকে দেখে জোড়হাতে বললেন, জানি এ যমজ পুত্রদ্বয় কুশলব আমার পুত্র (জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ), তবু মৈথিলী জগতের সামনে নিজ বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে আমার প্রিয় হও। (শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥ (উত্তর) ৯৭।৫)

রাম এই কথা বললে কাষায়বসন পরিহিতা সীতা সকলকে সমাগত দেখে অধোমুখে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কৃতাঞ্জলি পুটে বলতে লাগলেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণো বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ (উত্তর) ৯৭।১৪-১৫

—আমি রাম ভিন্ন অন্য কাউকে কখনও চিন্তা করিনি,—এ কথা যদি সত্য হয় তবে বসুন্ধরা স্বীয় গর্ভে আমাকে স্থান দাও। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষণ রামের অর্চনা করে থাকি, তবে বসুন্ধরা তোমার গর্ভে আমাকে গ্রহণ কর।

ধরিত্রীদেবী সীতার শপথ শ্রবণ করে এক দিব্য সিংহাসনে সীতাকে বসিয়ে পাতালে প্রবেশ করেন। যজ্ঞ স্থানে সমাগত সকলেই হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন হলেন। মুহূর্ত্তকালের জন্য সমস্ত জগৎ মোহাচ্ছন্ন হলো।

এইভাবে সীতার দ্বিতীয় পরীক্ষাকালে ধরণী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁর দুহিতাকে গ্রহণ করে পাতালে প্রবেশ করেন। এইভাবে সীতার অন্তর্দ্ধানের পর রামের অবস্থাঃ—

অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকেন পরময়াস্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ॥ (উত্তর) ৯৯।৪

—বৈদেহীর অদর্শনে রাম জগৎকে শূন্য দেখতে লাগলেন, শোকে তাঁর অন্তর ব্যথিত তাঁর হৃদয় হতে শান্তি অন্তর্হিত হলো।

রাম যজ্ঞের দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করে কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকলেন, ও তারপর অশ্রুজলে শোকে আকুল হয়ে বললেন, অভূতপূর্ব শোকে তিনি অভিভূত হয়েছেন। কারণ তাঁর চোখের সামনে সীতা লক্ষ্মীর মত অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লঙ্কায় অবরুদ্ধ থাকাকালীন, তিনি সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। এখন কি তা সম্ভব নয়? রাজর্ষি জনক হল কর্ষণের সময় সীতাকে পেয়েছিলেন। অতএব ধরিত্রী তাঁর শ্বশ্রূ। তাই তিনি ধরিত্রীর নিকট প্রার্থনা করলেন হয় সীতাকে ফিরিয়ে দিতে, নয়ত তাঁকেও ধরিত্রীর গর্ভে নিতে, যাতে তিনিও সীতার সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারেন। অন্যথা তিনি পর্বত ও বনেব সঙ্গে ধরিত্রীর স্থিতি নষ্ট করে দেবেন।

রামের ক্রোধ দেখে দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি বিষ্ণু হতে অবতীর্ণ।

সাধ্বী সীতা তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন বলে তিনি তপস্যাবলে নাগ লোকে সুখে বাস করছেন। রামও সুরলোকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এই উত্তম ও শুভ রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করলে রাম বিস্তৃত জানতে পারবেন। কারণ রামকে যা করতে হবে বাল্মীকি মুনি এই মহাকাব্যে বিশদভাবে তা বর্ণনা করেছেন। কিছুই গোপন করা হয়নি। এবং তা সম্পূর্ণ সত্য।

সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে নির্বাসনের পর রামকে এতটা শোকার্ত্ত হতে দেখা যায়নি। হয়ত পুনর্মিলনের আশা তাঁর মনকে এতটা উতলা করেনি। কিন্তু সীতার পাতাল প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্মিলনের সব আশা নিভে যাওয়াতে সীতার বিহনে পৃথিবী তাঁর কাছে শূন্য মনে হচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে রামের সীতার জন্য এই শোক রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার জন্য ও ওথেলোর ডেসডিমোনার জন্য শোকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

অতঃপর দানাদির দ্বারা নিজের অশান্ত মনকে কিছুমাত্র প্রশমিত করে রাম ধর্মকার্যে কিছুকাল সময় যাপন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বে সর্বত্র সুখ বিরাজ করছিল। কিছুকাল পর তাপস বেশে কালপুরুষ রামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এবং রামকে সাবধান করে বললেন যে তাঁদের কথোপকথনের সময় কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হলে সে রামের দ্বারা বধ্য হবে। এই প্রতিশ্রুতি পেলে তবেই তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। রাম কালপুরুষের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লক্ষ্মণের উপর দ্বার রক্ষার ভার ন্যস্ত করলেন। এরূপ ব্যবস্থা হলে পর কালপুরুষ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য রামকে জানালেন। ব্রহ্মা তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে রামের নিকট পাঠিয়েছেন যে কালের জন্য রাম এ মর্ত্তে আগমন করেছেন, সে কাল পূর্ণ হয়েছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আরও অধিককাল প্রজাপালন করতে পারেন। ব্রহ্মা তাঁর মঙ্গলই কামনা করেন। অথবা তিনি

তাঁর স্বস্থানে ফিরে যেতে পারেন। রাম তাঁর নিজের স্থানে ফিরবার ইচ্ছা কালপুরুষকে জানালেন।

উভয়ের এরূপ কথোপকথনের সময় মহর্ষি দুর্বাসা রামের দর্শন কামনা করলেন। নতুবা তাঁর একটি প্রয়োজন নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শীঘ্র তাঁর আগমন বার্ত্তা মহারাজের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে বললেন। লক্ষ্মণ বিনীতভাবে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। মুনি বললেন যদি এক্ষুনি তাঁর আগমন রামকে জানানো না হয়, তবে রামকে, লক্ষ্মণকে, ভরত শত্রুঘ্নকে তাদের রাজপুরী সন্তানগণকে শাপান্ত করবেন। তিনি হৃদয়ে আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারছেন না।

কুপিল দুর্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।

... ...

পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥ (উঃ কাঃ)

একথা বলে তিনি লক্ষ্মণকে শাসালেন। লক্ষ্মণ সব কিছু বিনাশ অপেক্ষা তাঁর একার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করে রামকে মহর্ষির আগমন সংবাদ দিলেন। রাম কালকে বিদায় দিয়ে দুর্বাসা মুনির নিকট আসলেন। দুর্বাসা মুনি বললেন, তাঁর অনশন ব্রত ঐদিন সমাপ্ত হয়েছে। তিনি অতি ক্ষুধার্ত্ত, রামের যেরূপ অন্নই ভোজনের জন্য প্রস্তুত তিনি তাহাই গ্রহণ করবেন। রাম মুনি দুর্বাসাকে তৈরী খাদ্য প্রদান করলেন। মুনি দুর্বাসা তা গ্রহণ করে, রামকে আশীর্বাদ করে, নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাম গুরু বশিষ্ঠের উপদেশে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করে ধর্ম রক্ষা করবেন স্থির করে লক্ষ্মণকে বলেন ঃ—

বিসর্জ্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্য্যয়ঃ।

ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যভয়ং সমম্॥

(উত্তর) ১০৬।১৩

—সুমিত্রাকুমার, ধর্মের বিপর্যয় করা উচিত নয়। অতএব তোমাকে

পরিত্যাগ করলাম। কারণ সাধুদের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই সমান।

লক্ষ্মণের প্রতি রামের এই আচরণ ধর্মসঙ্গত হলেও, অত্যন্ত কঠোর প্রতীয়মান হয়। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে রাম খুবই আঘাত পেয়েছিলেন এবং তারপর তিনি ভরতকে অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে প্রস্থান করবেন স্থির করেন। কিন্তু ভরত রামকে বলেন, আপনাকে ছেড়ে আমি স্বর্গ ভোগ বা রাজ্য কিছুই চাই না।

ভরতের পরামর্শে রাম কুশলবকে রাজ্য ভার দিয়ে মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করেন, এবং অযোধ্যা হতে তিন ক্রোশ দূরে সরযূ নদীতে ভরত শত্রুঘ্ন সহ অবতরণ করে সকলেই মানবলীলা সংবরণ করে, ব্রহ্মার নির্দেশে তাঁর অনুজগণের সঙ্গে সশরীরে বৈষ্ণব তেজে প্রবিষ্ট হলেন।

রাম রাজত্বে এক সুখময় চিত্র আমরা দেখি। ন্যায় ধর্ম সুবিচারের রাজত্ব। সেখানে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ নেই, অবিচার বা অধর্ম নেই। রাম রাজত্বে চির শান্তি বিরাজ করেছে।

যদিও রামকে দেবতা রূপে চিত্রিত করে অনেক কবিই ভারতে তাঁকে পূজনীয় করে গেছেন, কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি রামকে দোষ গুণের আধার মানুষরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু গুণাধিক্যের জন্য তাঁর দোষ ত্রুটি আচ্ছাদিত হয়েছে।

রামের দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তি সমান। খর ও দূষণ বধের সময় রাম কত বড় যোদ্ধা ছিলেন তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখেছেন। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, ভ্রাতৃপ্রেম, স্নেহ ও প্রজাবাৎসল্য তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ঠ।

তিনি একজন অকৃত্রিম প্রেমিক ছিলেন। কখনো কখনো তাঁর এই প্রেম উদ্‌ভ্রান্ত রূপ নিয়েছে। প্রিয়ার বিরহে বিভিন্ন ঋতুতে ঋতু বর্ণনায় তাঁর বিরহ বিধুর কবি চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্য রক্ষা বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সব রকম দুঃখ তিনি

বরণ করেছেন। তিনি কখনো সত্যভ্রষ্ট হননি। প্রজারঞ্জনের জন্য প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে চির জীবনের জন্য হারালেন, তাই তিনি সত্যব্রত। কালপুরুষের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করে অবশেষে আত্মবিসর্জন দিয়ে তাঁর মানবলীলার অবসান ঘটিয়েছিলেন। ধর্ম ও প্রতিজ্ঞা পালনে তিনি সব কিছু বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। আত্মমর্যাদা বা বংশ মর্যাদাকে তিনি সবার উর্ধে স্থান দিয়েছেন। শুধু তা নয়, এ ব্যাপারে তিনি কখনো কারো সঙ্গে আপোষ করেননি। তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে কারো যুক্তি বা পরামর্শ তিনি কখনো গ্রহণ করেন নি—গুরুজন বা স্নেহভাজন নির্বিশেষে। যেমন কৈকেয়ী যখন দাবী করলেন যে রামকে সেদিনই চীর বল্কল পরে চৌদ্দ বছরের জন্য বনগমন করতে হবে, রাম সে মুহূর্তে সম্মত হলেন। জননী কৌশল্যা কত রকম যুক্তির অবতারণা করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, ব্যথা জর্জরিত মহারাজ দশরথ কেবল সেই রাত্রি রাজপুরীতে বাস করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাম জননী কৌশল্যা বা পিতা দশরথের অবাধ্য হতে ইতঃস্তত করেন নি। তিনি যখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন, কারো কোন অনুরোধ উপরোধ তাঁকে তাঁর কর্তব্য হ'তে বা সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত করতে পারেনি।

রাম চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট তাঁকে কখনো তাঁর কোন কাজের জন্য অনুতপ্ত হতে দেখা যায় নি। সীতার অগ্নি পরীক্ষা বা সীতার বনবাস—এসব ঘটনার জন্য অনুতাপ করেছেন এ রকম ভাবপ্রবণতা বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না।

রামায়ণে কৈকেয়ী সম্বন্ধে রামের দ্বিমুখী মনোভাব বারংবার প্রকাশ পেয়েছে, কখনো তিনি কৈকেয়ীর প্রতি তুষ্ট হয়ে, নিজের দুঃখ কষ্টের জন্য আপন ভাগ্যকে দায়ী করেছেন। আবার যখন সেই দুঃখ কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি তীব্র ভাষায়

কৈকেয়ীর সমালোচনা করে তাঁকেই রামের জীবনের সব দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন। কৈকেয়ীর সমালোচনা যেন একমাত্র রামেরই অধিকার। যেহেতু যখনই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হয়ে লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর সমালোচনা করেছেন, তখনই রাম প্রতিবাদ জানিয়ে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করেছেন। লক্ষ্মণের প্রতি রামের এ ধরণের ব্যবহার কি যুক্তি সঙ্গত? প্রবাদ আছে—আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও; কিন্তু রাম নিজেই যখন কৈকেয়ীর আচরণ বিস্মৃত হতে পারেননি, তখন লক্ষ্মণকে তিরস্কার করায় তাঁর চরিত্রে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যা পড়ে মনে হয় তাঁর প্রাক জীবন যা হোক্ না কেন, রামায়ণের রাম রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষ।

Milton লিখেছেন—A crown, golden in show, is but a wreath of thorns, brings danger, troubles, cares and sleepless night, to him who wears a regal diadem.

রামচরিত আলোচনাকালে এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা গেছে। যুধিষ্ঠির চরিত্রও এই উক্তির অন্যতম দৃষ্টান্ত।

বেদব্যাসের অমর মহাকাব্য মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠিরের জীবনী রামচরিত্রের মতই প্রায় এক নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতার অগ্রজ। যদিও তাঁর জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল—

এই নরশ্রেষ্ঠ, ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালী, সত্যবাদী এবং পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন।

পরাক্রমে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী ছিলেন। নকুল, সহদেব স্ব স্ব রূপে ও তেজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অতিক্রম করেছিলেন। তথাপি যুধিষ্ঠির এই অমর মহাকাব্যের নায়ক। নায়করূপে চিহ্নিত হয়েই যেন তিনি জন্ম নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন—

ত্বামেকং কারণম্ কৃত্বা কালেন ভরতর্ষভ।
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং ক্ষয়ং যাস্যতি ভারত।
দুর্য্যোধনাপরাধেন ভীমার্জুন বলেন চ॥ (সভা) ৪৬।১২

—হে ভারতশ্রেষ্ঠ, একমাত্র তোমাকেই উপলক্ষ্য করে দুর্যোধনের অপরাধে ভীমার্জুনের শক্তি বলে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয় ধ্বংস হবে।

অতএব মহাভারত মহাকাব্যের যাবতীয় ঘটনাবলীর তিনিই কেন্দ্রবিন্দু।

ধর্মের ঔবসে রাজা পাণ্ডুর প্রথম ক্ষেত্রজ সন্তান। যুধিষ্ঠির শত শৃঙ্গ পর্বতে জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁর অপর চার ভ্রাতা শতশৃঙ্গ পর্বতে পুরোহিত কাশ্যপের নিকট বেদাধ্যয়ন করেন, সেই সময় রাজা শুক বানপ্রস্থ গ্রহণ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে তপস্যারত ছিলেন। সেই রাজা উপকরণ সমূহও শিক্ষাদ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণকে ধনুর্বেদেও পারদর্শী করে তোলেন। ভীম গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠির তোমুর যুদ্ধে, অর্জুন ধনুবিদ্যায় ও নকুল সহদেব অসি ও চর্মযুদ্ধে পারদর্শী হলেন।

যখন যুধিষ্ঠিরের বয়ঃক্রম ষোল বছর, রাজা পাণ্ডুর তখন শতশৃঙ্গ পর্বতে কিন্দম মুনির শাপানুক্রমে মৃত্যু হয়। অতঃপর শতশৃঙ্গ পর্বতের ঋষিগণ কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন।

হস্তিনাপুরে আগমনের পর পাণ্ডুপুত্রগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে নানা রকম খেলাধুলায় আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। সব খেলাতেই পাণ্ডবদের বৈশিষ্ঠ ও প্রাধান্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে ভীম বালকসুলভ চপলতাবশতঃ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নানাভাবে নিগ্রহ করতেন। কিন্তু তার প্রতিকারের কোন সামর্থ্য ছিল না। ভীমের এরূপ পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ঈর্ষ্যাবশতঃ ভীমের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হলেন। এবং কৌশলে কিরূপে তাঁকে জব্দ বা বধ করা

যায় তারই ফন্দি খুঁজতে থাকেন।

এই কুমতলব নিয়ে দুর্যোধন প্রমাণকটী নামক স্থানে "উদকক্রীড়ন" বা জলখেলার স্থান নির্মাণ করালেন এবং জলক্রীড়ায় পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানালেন। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মত হয়ে কৌরবগণের সঙ্গে সেই ক্রীড়াস্থানে প্রবেশ করেন। সেখানে নানারকম খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যখন সকলে খাদ্যদ্রব্য উপভোগ কর-ছিলেন তখন দুর্যোধন কালকূট মিশ্রিত খাদ্য ভীমের মুখে ছুঁড়ে দিলেন। দিবসান্তে ক্রীড়া শেষে যুধিষ্ঠিরাদি সব রাজকুমারগণ প্রমাণকটী গৃহে রাত্রি যাপন করবেন স্থির করেন।

শ্রান্তি ও বিষের ক্রিয়ায় ভীম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই সুযোগে দুর্যোধন লতাপাশে ভীমকে শক্ত করে বেঁধে জলমধ্যে ফেলে দিলেন।

অন্যান্য রাজপুত্রগণ জলক্রীড়া শেষ করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসলেন। যুধিষ্ঠির বাড়ী ফিরে জননী কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন ভীম কি আগেই বাড়ী ফিরেছে? ভীমকে খুঁজে বার করতে কুন্তী পুত্রদের বললেন, ভীমকে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর ভীম নাগলোক হতে বাসুকি প্রদত্ত সুধা পান করে দ্বিগুণ শক্তি অর্জন করে আবার ভাইদের মধ্যে ফিরে আসেন। তখন পাণ্ডু পরিবারে আনন্দের বান ডাকলো। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির ভীমকে সাবধান করে বলেন—

তুষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন। (আঃ) ১২৮।৩৪

—চুপ করে থাক। এই সব ঘটনা নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা করা উচিত নয়,

এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তাঁর পাশ॥ (আঃ)

সময়োচিত এই সিদ্ধান্ত যুধিষ্ঠিরের প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি ভাইদের সতর্ক করে দিলেন কেউ যেন একা দুর্যোধনের নিকট না যায়।

অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও কৃপাচার্য ও দ্রোণের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির রথযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হলেন। (যুধিষ্ঠিরো রথশ্রেষ্ঠঃ।)

পাণ্ডুতনয়গণ পাঞ্চাল রাজকে পরাজিত ও বন্দী করে আচার্য দ্রোণকে গুরু দক্ষিণা দেওয়ার এক বৎসর পর—

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে যৌবরাজ্যায় পার্থিব।
স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥
ধৃতিস্থৈর্য্যসহিষ্ণুত্বাদানৃশংস্যাৎ তথার্জবাৎ।
ভৃত্যানামনুকম্পার্থং তথৈব স্থিরসৌহৃদাৎ॥

(আঃ) ১৩৮।১-২

—তারপর (অর্থাৎ পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করার) এক বছর পর প্রজাপালনের উপযুক্ত ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণের আধার যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অল্পকালের মধ্যে পাণ্ডবগণ নানা শস্ত্রে বিশারদ হয়ে নানা রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজিত রাজা ও রাজ্য হতে ধন আহরণ করে কুরুরাষ্ট্রের রাজকোষ বৃদ্ধি করেন। অন্যদিকে পাণ্ডবদের অমিত বিক্রম দেখে ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষ্যান্বিত ও সন্ত্রস্ত হলেন ও নিদ্রা ত্যাগ করলেন। (ন নিদ্রামলভন্নিশি)।

পাণ্ডবের কীর্তি লোক গায় অহর্নিশি॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল ছন্নমতি। (আঃ)

পাণ্ডবদের সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের পরম ঈর্ষ্যার কারণ হলো। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবেন, না তাদের নিগৃহীত করবেন এই পরামর্শ চাইলে, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী কণিক পাণ্ডবদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন। অন্যদিকে দুর্যোধন শকুনি ও কর্ণ পুত্রগণের সঙ্গে কুন্তীকে পুড়িয়ে

মারার ষড়যন্ত্র করেন। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছা যুধিষ্ঠিরকে রাজা বলে অভিষিক্ত করা। কিন্তু যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সন্তানদের পরপিণ্ড ভোগ করে নরকবাস তুল্য দুঃখভোগ করতে হবে—এ রকম এক নির্মম চিত্র ধৃতরাষ্ট্রের চোখের সামনে দুর্যোধন তুলে ধরেন। ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব হতে পাণ্ডবদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, কেবলমাত্র দুর্যোধনের পরামর্শে পাণ্ডবদের তাঁদের জননীর সঙ্গে কৌশলে বারণাবতে নির্বাসন দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

পাণ্ডবদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য দুর্যোধন কৌশলে বারণাবত নগরের শ্রী সম্বন্ধে খুব প্রচার আরম্ভ করেন। দুর্যোধনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। পাণ্ডবরা এই প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বারণাবত নগর দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবত নগর দেখবার অভিলাষ জানতে পেরে স্বয়ং পাণ্ডবদের সাক্ষাতে এই নগরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং পাণ্ডবরা ইচ্ছে করলে ভৃত্যগণের সঙ্গে সেই নগর পরিভ্রমণ করে আসতে পাবেন বলে মত প্রকাশ করেন। বারণাবতে কিছুকাল অবস্থান করে পাণ্ডবদের পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করতে ধৃতরাষ্ট্র বলেন।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝতে পেরে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা মনে করে 'তাই হবে' বলে সম্মতি জানালেন। তারপর যুধিষ্ঠির সমস্ত গুরুজনদের ও গান্ধারীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। গুরুজনেরা ও গান্ধারী পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করে কিছুদূর তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে অন্যান্য ভাইদের সহায়তায় যেরূপ সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন, অর্জুন যেভাবে কুরুরাষ্ট্রের রাজকোষ সমৃদ্ধ করছিলেন এবং প্রজারা যেরূপ যুধিষ্ঠিরের ও তাঁর ভ্রাতাদের অনুরক্ত হয়ে পড়ছিল, এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের

নিজেদের অসহায় মনে করার কারণ ছিল কি? তাঁদের বারণাবতে পাঠানোর পশ্চাতে ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি আছে জেনেও যুধিষ্ঠির সেই ফাঁদে পা দিলেন। এটা যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

এদিকে দুর্যোধন সচিব পুরোচনকে পাণ্ডবদের পূর্বেই বারণাবতে পাঠালেন। এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে অতি দ্রুত দাহ্য বস্তু দ্বারা যেন একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। কুন্তী ও তাঁর পুত্ররা সবান্ধবে ঐ গৃহে নিঃসন্দেহে যেন বাস করে, তারপর একদিন সুযোগ ও সুবিধা মত তাঁদের গৃহের দ্বারদেশে যেন অগ্নি সংযোগ করা হয়।

পাণ্ডবরা সকলের আশীর্বাদ নিয়ে বারণাবতের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলে, প্রজাপুঞ্জ ও ব্রাহ্মণগণ যখন নগরে ফিরে গেল; তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যুধিষ্ঠিরকে তাঁর সঙ্গীদের অবোধ্য ভাষায় বললেন—

পৌরেষু বিনিবৃত্তেষু বিদুরঃ সত্যধর্মবিৎ।
বোধয়ন্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ॥
প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞমিদং বচঃ।
প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞং প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোঽব্রবীৎ॥

(আঃ) ১৪৪।১৯-২০

ম্লেচ্ছ ভাষায় অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় অভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বললেন। বিদুর যা বললেন তা বিশুদ্ধভাষী বিশুদ্ধ ভাষাভিজ্ঞকে বলতে পারবেন এবং ম্লেচ্ছভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ ভাষাভিজ্ঞকে বলতে পারেন।

বিদুর বললেন—লৌহনির্মিত অস্ত্র ব্যতীতও এমন অস্ত্র আছে যা শারীরিক অনিষ্টকারী। যে শত্রুর সেই অস্ত্রকে চিনতে পারে বা তার প্রতিকার করতে জানে শত্রুর সে অস্ত্র তাকে কখনো বিনাশ করতে পারে না।

শুষ্কবন ও শৈত্য বিনষ্টকারী অগ্নি অরণ্যানীতে বিস্তৃত হলেও, গর্ত নিবাসী মূষিক প্রভৃতি প্রাণীকে কখনো বিনষ্ট করতে পারে না।

যার চক্ষু নেই সে পথ চেনে না, যে চক্ষুহীন সে দিক নির্ণয করতে পারে না। ধৈর্যহীনের বুদ্ধি লোপ পায। এ সত্যগুলি মনে রেখে সর্বদা সজাগ থাকবে। শত্রুর অলৌহ অস্ত্র নিজেই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শত্রু অগ্নি সংযোগ করবার পূর্বে নিজেই অগ্নি সংযোগ করবে। এবং জননী সহ পাঁচ নিষাদকে দগ্ধ করে নিজেদের অগ্নির হাত হতে রক্ষা করবে।

চতুর্দিকে বিচরণ করলে পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হবে। নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করবে, পাঁচজন একত্রে থাকলে নিপীড়িত হবে না।

বিদুরের এ সব কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—আমি আপনার সব কথাই বুঝেছি।

এরূপে পাণ্ডবদের নানা উপদেশ দিয়ে বিদুর কিছুদূর তাঁদের অনুগমন করে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যখন সকলে বিদায় নিল, তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন ক্ষত্ত ম্লেচ্ছ ভাষায় কি বললো যার উত্তরে তুমি বললে তুমি সব বুঝেছ? আমরা তো কিছু বুঝলাম না। যুধিষ্ঠির সংক্ষেপে বিদুরের উপদেশের কথা জননীকে জানালেন।

যুধিষ্ঠির জননী ও ভ্রাতাদের নিয়ে বারণাবতে পৌঁছলে নাগরিক-গণ তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। তারপর তাঁরা পুরোচন প্রদর্শিত পথে তাঁদের আবাসস্থানে গেলেন, ঐ স্থানে দশদিন বাস করার পর পুরোচন তাঁদের নতুন গৃহ "শিব ভবন" এর খবর দিল, পুরোচনের অনুরোধে তাঁরা নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে সেই ভবনে গেলেন। সে গৃহ শিবভবন বললেও বস্তুতঃ তা অশিব ভবন। (গৃহং শিবাখ্যমশিবং তদা)।

সেই গৃহ ভালভাবে পরীক্ষা করে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন—এটা সহজে অগ্নিদাহ্য। তিনি ভীমকে সব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বললেন—

বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু ঘৃতের নির্মাণ॥
... ...
জৌঘৃত সরিষা তৈল গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্মাণ॥ (আঃ)

যুধিষ্ঠির বললেন, নিপুণ শিল্পিব দ্বারা পুরোচন এ গৃহ তৈরী করেছে আমাদের দগ্ধ করবার জন্য বিদুর এটা পূর্বাহ্নেই জানতে পেরে, এ ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে যে গৃহে প্রথমে বাস করেছিলেন, সেই গৃহে যেতে বললেন। যুধিষ্ঠির বললেন, তাঁদের সাবধানে থাকা উচিত। ভাইদের ঐ স্থান হতে নিরাপদে নিষ্ক্রমণের পথ দেখতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁদের বোঝালেন যে দগ্ধ হবার ভয়ে ঐ স্থান হতে পলায়ন করলে দুর্যোধন গুপ্তচর দ্বারা তাঁদের হত্যা করাতে পারেন। অতএব তাঁদের উচিত দুর্যোধন ও পুরোচনের অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিয়ে কোন গুপ্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা।

অতঃপর পঞ্চপাণ্ডব মৃগযাচ্ছলে সাবাদিন অরণ্যে ভ্রমণ করে অরণ্যের পথঘাট তাঁদের নখদর্পণে আনলেন। অন্যদিকে বিদুর এক খনককে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠালেন! বিদুরের লোক জতুগৃহের ভূমিতে গোপনে খনন কার্য দ্বারা একটি বৃহৎ সুরঙ্গ তৈরী করে, সেই সুরঙ্গেব মুখ একটা কবাট বা দরজার দ্বারা আবৃত করে রাখা হলো। এ সুরঙ্গের সংবাদ সকলের অজ্ঞাত রইল। এভাবে এক বৎসর, কাবো কারো মতে ছয়মাস জতুগৃহে বাস করবার পর, যুধিষ্ঠির তাঁর অন্য ভাইদেব বললেন, যে তাঁরা পুরোচনকে বঞ্চনা করতে সক্ষম হয়েছেন। কাবণ সে পরম নিশ্চিন্তে আছে যে পাণ্ডবরা কোনরূপ সন্দেহ না কবে এ গৃহে বাস করছে। আব দেরী করা উচিত নয়। পুরোচন সহ আবও ছয়জনকে দগ্ধ করে তাঁদের কোন অজ্ঞাত স্থানে

যেতে হবে। এরূপ চিন্তা করে একদিন দানের ছলে কুন্তী ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। অনেক স্ত্রীলোকও এসেছিল। তারা সকলেই পান ভোজন করে রাত্রিতে ফিরে গেল। কেবল এক নিষাদ স্ত্রী তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে খেতে এসে প্রচুর মদ্য পান করে নেশায় মৃত প্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হল।

সকলে যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তখন ভীম যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে প্রথমে পুরোচনের শয়ন কক্ষে তারপর জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করলেন, এবং নিজেরা অতি দুঃখিত চিত্তে সুরঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে সেই সুরঙ্গ পথ ধরে চলতে লাগলেন। নিদ্রালস ও ভয়ে পাণ্ডবরা জননী কুন্তীকে নিয়ে দ্রুত চলতে পারছিলেন না। ভীম জননী ভ্রাতাগণকে কাঁধে ও কোলে ও অর্জুনকে দুহাতে ধরে বেগে চলতে থাকেন।

নাগরিকগণ জতুগৃহ দগ্ধ হতে দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে অভিশম্পাত দিতে থাকে ও পাণ্ডবদের জন্য দুঃখ করতে থাকে। দুর্যোধন ও তাঁর সহচরদের বঞ্চনা করবার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পাঁচ নিষাদ ও তাদের মাতা দগ্ধীভূত হয়।

সুরঙ্গপথ ও বন অতিক্রম করে পাণ্ডবরা জননীর সঙ্গে গঙ্গা তীরে পৌঁছে নদীর জল মাপছিলেন। তখন বিদুর প্রেরিত এক পবিত্র পুরুষ অতি দ্রুতগামী এক নৌকা নিয়ে পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হলেন। এবং তিনি যে বিদুর প্রেরিত এ প্রত্যয় জন্মাবার জন্য এক শ্লোক দ্বারা আত্ম পরিচয় দিলেন। ঐ নৌকা গঙ্গা পার করে তাঁদের বিপন্মুক্ত করবেন বলেন। বিদুর তাঁদের পথে কুশল আশীর্বাদ করেছেন তাও জানালেন। নাবিক পাণ্ডবদের গঙ্গা অতিক্রম করিয়ে দিয়ে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে চলে গেলেন। এবং পাণ্ডবরা সকলের অলক্ষিতে গুপ্ত ভাবে চলতে থাকেন।

মধ্যরাত্রি হতে পরদিন সায়াহ্নকাল অবধি ভীম ভীমবেগে চলে মা ও অন্যান্য ভ্রাতাদের নিয়ে এক বনে উপস্থিত হলেন। সেখানে

ফল মূল ও জল প্রচুর কিন্তু ক্রুর পক্ষী ও পশুতে পরিপূর্ণ ছিল। কুন্তী তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। কুন্তীর এই অবস্থা দেখে ভীম সকলকে এক বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে বলে জলের খোঁজে চললেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ভীম সারস পক্ষী দেখে নিকটেই জলাশয় আছে অনুমান করে সেদিকেই গেলেন।

সেই জলাশয়ে স্নান করে জল পান করে ভীম একটি উত্তরীয় করে মা ও ভাইদের জন্যে জল নিয়ে দ্রুতবেগে সেই জায়গায় ফিরে এলেন। ভীম ফিরে এসে দেখেন তাঁর জননী কুন্তী ও ভ্রাতারা ভূমি শয্যায় শয়ন করে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাঁদের এই নিদারুণ অবস্থা দেখে ভীম দুঃখে অভিভূত হলেও তাঁদের নিদ্রা ভঙ্গ করলেন না। কিন্তু নিজে জেগে থেকে তাঁদের পাহারা দিতে থাকেন।

অদূরে এক শাল বৃক্ষ আশ্রয় করে হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষস বাস করতো। সে মহাপরাক্রমশালী ও মনুষ্যমাংস লোভী। সে তার ভগ্নীকে বলে যে মানুষের গন্ধ তার নাসিকাকে যেন তৃপ্ত করছে। সে তার বোনকে এ সব মানুষ কারা খবর নিতে এবং তাঁদের হত্যা করে তার কাছে নিয়ে আসবার জন্য পাঠালো।

রাক্ষসী হিড়িম্বা তাড়াতাড়ি পাণ্ডবরা যেখানে শয়ন করেছিলেন সেখানে গেল। সে দেখল কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবরা নিদ্রামগ্ন এবং ভীম তাঁদের জাগ্রত প্রহরী। হিড়িম্বা ভীমের রূপ দেখে আকৃষ্ট হলো। (কাময়ামাস রূপেণাপ্রতিমং ভূবি।)

রাক্ষসী রূপ পরিত্যাগ করে উত্তম মানবী রূপ ধারণ করে হিড়িম্বা ভীমের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো নিদ্রিত এসব পুরুষরা ও এই বৃদ্ধা রমনী কে এবং আপনার কে হয়? হিড়িম্বা ভীমকে জানালো এখানে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস বাস করে। সে আপনাদের মাংস খাবার ইচ্ছায় আমাকে (হিড়িম্বা) এখানে পাঠিয়েছে। হিড়িম্বা ভীমকে পুনরায় বলে যে তাঁর রূপে সে আকৃষ্ট। সুতরাং ভীম যেন তার ভজনা করেন।

হিড়িম্বা যখন এভাবে ভীমকে প্রেম নিবেদন করছিলো, তখন হিড়িম্ব রাক্ষস হিড়িম্বার বিলম্ব দেখে তথায় উপস্থিত হয়ে হিড়িম্বাকে পুরুষাকাঙ্ক্ষিনী বলে ধিক্কার দিতে থাকে। এবং হিড়িম্বাকে বধ করবার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। তখন ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে ধিক্কার দিয়ে তাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন। হিড়িম্ব রাক্ষসও নিদ্রিত কুন্তী ও পাণ্ডবদের অপর চার ভ্রাতাকে উপেক্ষা করে ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলো। দুজনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধের উত্তালে জননী সহ অন্য চার পাণ্ডব নিদ্রা হতে জেগে উঠলেন এবং সম্মুখে হিড়িম্বাকে দাঁড়ান দেখলেন।

হিড়িম্বার অতিমানুষরূপে (রূপং দৃষ্ট্বাতিমানুষম্) বিস্মিত কুন্তী তাকে জিজ্ঞেস করেন সে কে এবং সেখানে কেন এসেছে? কুন্তীর প্রশ্নের উত্তরে হিড়িম্বা সব ঘটনা প্রকাশ করে এবং আরও বলে তাঁদের নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে ভীম হিড়িম্বকে দূরে সরিযে প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। এ কথা শুনে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব লাফিয়ে উঠলেন। অর্জুন ভীমকে সাহায্য করতে চাইলে, ভীম তাঁকে নিবৃত্ত করেন। অর্জুন দ্রুত রাক্ষসকে বধ করবার জন্য ভীমকে পরামর্শ দিলেন। এবং পুনরায় ভীমকে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ ভীম আর কাল ব্যয় না করে নির্মমভাবে ঐ রাক্ষসকে বধ করেন।

হিড়িম্বের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেই বন ছেড়ে নগরের দিকে অগ্রসর হলেন। হিড়িম্বা তাঁদের সঙ্গ নিল।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ভীম ও হিড়িম্ব যখন প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত, অর্জুনের নিদ্রাভঙ্গে অর্জুন ভীমকে, বললেন—আমরা এত জানতে পারিনি যে ভীমরূপ এক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে তুমি শ্রান্ত।

সাহায্যেঽস্মি স্থিতঃ পার্থঃ পাতয়িষ্যামি রাক্ষসম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাতরং গোপয়িষ্যতঃ॥ (আঃ) ১৫৩।১৯

—নকুল সহদেব জননী কুন্তীকে রক্ষা করবে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য তৈরী। আমি এখনই এ রাক্ষসকে নিপাতিত করবো।

তখন অগ্রজ যুধিষ্ঠিরও সেই স্থানে উপস্থিত। জননী কুন্তীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব অগ্রজের উপর ন্যস্ত না করে অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর সে কর্ত্তব্য ন্যস্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কারণ কি? অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, না অনুজ দুজনের পরাক্রম অধিকতর নির্ভরযোগ্য? এ প্রশ্নের উত্তর প্রণিধানযোগ্য।

হিড়িম্বা মাতা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে তার মনের অভিলাষ তাঁদের কাছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ভীম হিড়িম্বার কথায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কারণ রাক্ষসীরা মায়াবী। তারা মায়াকে আশ্রয় করে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। অতএব তাকে বধ করা উচিত।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন—

... ... ভীম নহে ধর্মাচার।
অবধ্যা স্ত্রীজাতি কেন করিবে সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা ধরিবারে শক্তি আছে কি ইহার॥ (আঃ)

অন্যত্র হিড়িম্বা রাক্ষসী সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির বলেছেন ঃ—

সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ॥
... ...
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥ (আঃ)

এইখানে যুধিষ্ঠিরের ন্যায়নিষ্ঠতা, ধর্মনিষ্ঠতা ও দয়ার্দ্রচিত্তের প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হিড়িম্বার প্রাণ রক্ষাই করেননি কেবল, তার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ করিয়েছিলেন। হিড়িম্বা যখন যুধিষ্ঠিরের তিন সর্ত্তে যথা—প্রথমতঃ ভীম প্রাতঃকৃত্য শেষ করলে তখন থেকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব অবধি ভীমের সঙ্গে বিহার করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে ভীমকে

পাণ্ডবদের কাছে ছেড়ে দেবে, দ্বিতীয়তঃ সে সর্বদা ভীমের হিত করবে ও তাকে রক্ষা করবে, তৃতীয়তঃ উপরোক্তভাবে গর্ভলাভ করার পূর্ব পর্যন্ত ভীমের সঙ্গে রমণ করবে—রাজী হলো, তখন মাতা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করলেন।

মদনশরে জর্জরিতা হিড়িম্বার যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর নিকট ভীমের সঙ্গে তার মিলন ঘটাবার জন্য প্রার্থী হয়ে তাঁদের সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা, রামের নিকট বিভীষণের আশ্রয় প্রার্থনার ঘটনা শরণ করিয়ে দেয়। এ দুটো ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই দেখা যায়।

বিভীষণ রামের শরণাগত হয়েছিলেন ভ্রাতা রাবণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদ যখম তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল। তাঁর মনে লঙ্কার সিংহাসন লাভের স্বপ্নও লুকিয়েছিল। যদিও রামের বন্ধুগণ-সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরযূথপতিগণ বিভীষণকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছিল, তবুও রাম বিভীষণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন শত্রুও আশ্রয় ভিক্ষা করলে তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত—এই উদারতা স্মরণ করেই রাম বিভীষণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখানে রামের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে।

হিড়িম্বার সাহায্য প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার প্রস্তাবে যে সম্মত হয়েছিলেন তার কারণ, কুন্তীব মতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁকে কঠিন বিপদে ফেলেছে। এরূপ সঙ্কটের প্রতিবিধানের কোন উপায দেখা যাচ্ছে না। কিছুদিন যেন এ দুর্গমারণ্যে সুখে বাস করতে পারা যায় তার ব্যবস্থার প্রযোজন। কুন্তীর এ কথা বলাব উদ্দেশ্য হিড়িম্বা ঐ দুর্গম বনে তাঁদের মঙ্গল করবে। হিড়িম্বা ভীমের প্রণয়প্রার্থী। ইহা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্ম সঙ্কটও বটে। কারণ বেদব্যাস হিড়িম্বার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—ধর্মানুবর্ত্তী পুরুষ যেন তেন ভাবে বিপদ হতে উদ্ধার লাভ করে। সব ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষার উপায়কে অবলম্বন করে। পাণ্ডব জননী

হিড়িম্বার কথার মধ্যে ধর্মের আভাস পেয়েছিলেন। অতএব হিড়িম্বার জন্য কুন্তীর আবেদন আপন স্বার্থের জন্য। রামপ্রদর্শিত উদারতার কোন চিহ্ন এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

পাণ্ডবগণ তাঁদের জননীর সঙ্গে হিড়িম্বার উল্লেখিত শালিহোত্র মুনির সরোবরে পৌঁছলেন এবং সেই সরোবরের জলপান করে তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটলো। এর পর তাঁরা বন হতে বনান্তরে অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন হিড়িম্বার পূর্বাভাষ মত ব্যাসদেব তাঁদের দেখা দিলেন এবং বললেন যে তিনি পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন পর্যন্ত তাঁদের সেই বনে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করতে বলে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর ব্যাসদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে এক চক্রানগরে গেলেন এবং এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁদের বাস স্থানের ব্যবস্থা করলেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একমাসকাল সেই গৃহে বাস করতে বলে গেলেন এবং তাঁর পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

কুন্তী পঞ্চপুত্র সহ ছদ্ম পরিচয়ে একচক্রানগরে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করার সময় পুত্রদের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে দিনাতিপাত করছিলেন। একদিন ভীম ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডব ভিক্ষায় বের হয়েছেন, এমন সময় আশ্রয়দাতার পরিবারের সকলকে ক্রন্দনরত দেখে কারণ অনুসন্ধান করে কুন্তী জানতে পারলেন-মহাবল বক রাক্ষসই এখন ঐ নগরের প্রভু। রাজা অন্যত্র থাকেন। বক রাক্ষস দেশ রক্ষা করে। এবং তার বিনিময়ে প্রতিদিন এক এক গৃহ হতে এক এক জনকে প্রচুর অন্ন ও দুই মহিষ সঙ্গে নিয়ে তার ভোগার্থে যেতে হয়। বক রাক্ষস তাদের সকলকে ভক্ষণ করে। আজ ব্রাহ্মণ পরিবারের পালা তাই তাঁদের এই শোক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে কুন্তী তাঁদের অভয় দিলেন এবং বললেন যে তাঁর পঞ্চ পুত্রের এক পুত্র ব্রাহ্মণদেব দেয় কর নিয়ে পাপিষ্ঠ রাক্ষসের কাছে যাবে। কুন্তী ভীমকে বক রাক্ষসকে বধ

করবার জন্য পাঠাতে চাইলে ভীম সহজেই সম্মত হলেন। এবং ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বক রাক্ষসের উদ্দেশ্যে গেলেন।

এই সময় চার ভ্রাতা গৃহে ফিরে জননীর মুখে ভীম রাক্ষস বধ করতে যাচ্ছেন শুনে রুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির জননীকে বলেন :—

কথং পরসুতস্যার্থে স্বসুতং ত্যক্তুমিচ্ছসি।

লোকবেদবিরুদ্ধং হি পুত্রত্যাগাৎ কৃতং ত্বয়া॥ (আঃ) ১৬১।৬

—পরের পুত্রের জন্য নিজ পুত্রকে ত্যাগ করতে কেন আপনি ইচ্ছা করেছেন? এ ভাবে পুত্র ত্যাগের দ্বারা আপনি লোক ও বেদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
পুত্রের ভিতর পুত্র কর কি বিশেষে।
সবে প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পায় সবে॥
স্কন্ধে করি নিল সবা হিড়িম্বক বনে।
হিড়িম্ব মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে?
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥ (আঃ)

এ ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের উষ্মাব কারণ কি ভ্রাতৃপ্রেম না নিজের স্বার্থ? কুন্তী দেবী যে ঔদার্য নিয়ে উপকারীর প্রত্যুপকার করতে গিয়েছেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সেই ঔদার্যের অভাব দেখা যায়। যুধিষ্ঠির এ ক্ষেত্রে বাস্তববাদী। আগে নিজেকে বাঁচিয়ে পরে পরের উপকার সাধনের কথা চিন্তনীয়। ভীমেব সঙ্গ ও বল পাণ্ডব পবিবাবের এ নিদারুণ অবস্থায় অপরিহার্য। এরূপ অবস্থায় ভীমকে এক রাক্ষসবধের জন্য পাঠান সমীচীন নয় বলে যুধিষ্ঠির মাতাকে বলেন।

এইখানে জননী কুন্তীর চরিত্রের পাশে যুধিষ্ঠিবের চরিত্র নিষ্প্রভ হয়েছে। পরার্থপরতা, পরোপকার দ্বিজরক্ষাও যে রাজধর্ম জননী

তা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন। কুন্তী আরও বলেন যে ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে তিনি এ কাজ করেছেন।

ভীম বকাসুরকে বধ করলে নগরবাসীরা খুবই আনন্দিত হলো। পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করতে থাকেন। কিছুদিন পর অপর একজন ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আশ্রয় নিলেন। কুন্তী ও পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণের সেবা করতে থাকেন। সেই ব্রাহ্মণ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা কালে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞ হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীর উৎপত্তি ও কৃষ্ণার জন্মকথা ও যাজ্ঞসেনীর স্বয়ংবর সভার কথা প্রকাশ করেন। জননী কুন্তী পুত্রদের সকলেরই মন স্বয়ংবর দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন দেখে যুধিষ্ঠিরকে পাঞ্চাল দেশে যাবার প্রস্তাব করেন। যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতারা সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

এ সময় ব্যাসদেবও পুনরায় উপস্থিত হলেন। তিনিও দ্রৌপদীর জন্ম রহস্য যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রকাশ করেন। এবং জানালেন যে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবের পত্নীরূপে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্টা। ব্যাসদেব তাঁদের পাঞ্চাল নগরে বাস করতে বলেন এবং দ্রৌপদীকে পেয়ে তাঁরা সুখী হবেন।

যখন পাণ্ডবপুত্রগণ মাতার সঙ্গে পাঞ্চাল নগরে আসছিলেন, তখন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁদের পথ অবরোধ করেন। অর্জুন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন। তখন গন্ধর্বরাণী যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁর পতির প্রাণ ভিক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গন্ধর্ব রাজাকে বধ করতে বারণ করেন। অর্জুনও অগ্রজের আজ্ঞা বেদ-বাক্য মনে করে তাঁকে মুক্তি দেন।

পাঞ্চাল নগরে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নেন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। সেখানে অবস্থান কালে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা দেখতে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন।

সমবেত ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ লক্ষ্যভেদ করতে অসমর্থ হলে, অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে লাভ করেন।

ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী অর্জুনকে কন্যা সম্প্রদান করার অপরাধে পরাজিত উপস্থিত রাজন্যবর্গ দ্রুপদ রাজাকে একত্রে আক্রমণ করলে, ভীম ও অর্জুন দ্রুপদ রাজার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ক্রোধান্ধ রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন।

যখন ভীমার্জুন ক্রোধান্ধ সম্মিলিত নৃপতিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং এক প্রচণ্ড ঝড়ের আভাস পাঞ্চাল নগরের রাজধানীব আকাশে বাতাসে, তখন যুধিষ্ঠির সিংহের গতিতে নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে করে স্বয়ংবর সভা হতে বেরিয়ে নিজের আবাস মুখে চললেন। যুধিষ্ঠিবেব এইভাবে স্বয়ংবর সভা হতে অপসরণ প্রতিকূল সমালোচনার বিষয় হয়েছে। কোন কোন সমালোচক তাঁকে কাপুরুষ আখ্যা দিতেও সঙ্কোচ বোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই নয়। স্বযংবর সভায সমবেত নৃপতিরা ব্রাহ্মণ বেশে অবস্থান করার দরুণ পঞ্চপাণ্ডবের দিকে কোন মনোযোগই দেয়নি। কেবল শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিনেছিলেন এবং বলরামের দৃষ্টি তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। যদি ভীমার্জুনের সঙ্গে অন্য তিন ভ্রাতাও যুদ্ধ করতেন, তবে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত সকলেরই পঞ্চপাণ্ডবকে চিনতে একটুও কষ্ট হতো না। ফলে ক্রুদ্ধ নৃপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ আরও জটিল ও কঠিন হতো। সংঘর্ষ কোন দিকে মোড় নিতো তা বলা যায় না। তাছাড়া দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি চক্রান্ত করে হয়ত ভার্গব কুম্ভকারের গৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে গুপ্ত হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতো। সুতরাং আত্মগোপন করাব জন্য ও যুধিষ্ঠিরের অন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে স্বয়ংবর সভা হতে এভাবে নিষ্ক্রমণ অতীব সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের ভূষণ ছিল।

ভীমার্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে তাদের আশ্রয় স্থানে ফিরে এসে মাতা কুন্তীকে ভিক্ষা নিয়ে ফিরেছেন বলেন। কুন্তীও পুত্রদের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সবাইকে ভাগ করে নিতে আদেশ দিয়ে বাইরে এসে দ্রৌপদীকে দেখে তাঁর নির্দেশের জন্য অনুতপ্ত হলেন। অধর্ম ভয়ে ভীতা কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর এ ভুলের কিছু বিহিত করবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করেন।

যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে অর্জুনকে দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিলেন। কারণ জিষ্ণুই নিজ বীর্য্যে দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে আপত্তি করেন। যুধিষ্ঠিব সব ভাইএর মুখ দেখে ও ব্যাসদেবের কথা স্মরণ করে বললেন —'সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা।' কল্যাণময়ী দ্রৌপদী সব পাণ্ডবেরই ভার্যা হবেন।

যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যখন অন্যান্য ভ্রাতারা চিন্তা করছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে শিষ্টাচারের পাট সম্পন্ন করলে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন কৃষ্ণ কি করে তাঁদের সেই জায়গায় অবস্থানের বিষয় অবগত হলেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেন প্রচ্ছন্ন থাকলেও অগ্নিকে চিনতে কষ্ট না। তাঁদের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে কৃষ্ণ বলরাম তখন বিদায় নিলেন, যেন অন্য কোন রাজা পঞ্চপাণ্ডবের বিষয় জানতে না পারে।

যদিও দ্রুপদ রাজার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করে ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন তবুও তাঁর মনে দুঃখ ও সন্দেহ জাগলো। তিনি কিরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান করলেন? ঐ ব্রাহ্মণ কে, কোথায় তার বাস ইত্যাদি সম্যক ভাবে জানবার জন্য তিনি তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদেশ করলেন।

কচ্চিন্ন শূদ্রেণ ন হীনজেন
বৈশ্যেন বা করদেনোপাপন্না।

কচ্চিৎ পদং মূর্ধ্নি ন পঙ্কদিগ্ধং

কচ্চিন্ন মালা পতিতা শ্মশানে ॥ (আঃ) ১৯১।১৫

—কোন শূদ্র, কোন নীচজন্মা বা করদাতা বৈশ্য তাকে নিয়ে যায়নি তো ? কোন ভিন্ন জাতির ব্যক্তি তার পঙ্কিল চরণ আমার মস্তকে রাখেনি তো ? বা দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মালা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয়নি তো ?

ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর অনুচরদের নিযে গোপনে পাণ্ডবদের আশ্রয় স্থানে অনুসন্ধান করেও কোনও সুনিশ্চিত খবর সংগ্রহে সমর্থ হলেন না। কেবলমাত্র পাণ্ডবগণের আচরণ লক্ষ্য করে নিসন্দেহ হয়েছিলেন যে এ বীরগণ ক্ষত্রিয। লোক পরম্পরায় প্রকাশ কুন্তী পুত্রগণই প্রচ্ছন্নভাবে এই স্থানে অবস্থান করছেন এ খবর তিনি জানতে পারলেন। অতএব এই বীররা পাণ্ডুপুত্র হতে পারেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই সংবাদে দ্রুপদরাজা আনন্দিত হয়ে তাঁর পুরোহিতকে বীরদের কাছে পাঠালেন। এই বীরদেব প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁরা পাণ্ডুনন্দন কিনা জানবাব জন্যই দ্রুপদ রাজা পুরোহিতকে পাঠালেন।

পুরোহিত পাণ্ডবদের নিকট গিযে রাজা দ্রুপদের ইচ্ছা তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন। যুধিষ্ঠির পুরোহিতকে বলেন—

পাঞ্চালরাজ স্বেচ্ছায় কন্যা দান করেননি। লক্ষ্যবেধ রূপ শুল্ক রেখে তিনি স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিলেন। এই বীর সেই সর্ত্ত পূর্ণ করে কন্যা লাভ করেছেন। তাঁর বর্ণ, কুল, শীল, গোত্রের কথা এ বিবাহ ব্যাপাবে ছিল না। এই বীর রাজসর্ত্ত পূর্ণ করে নৃপতিদের সামনে এই রাজকন্যাকে জয় করেছেন। সুতরাং এখন রাজা দ্রুপদের পরিতাপ করা সমীচীন নয। স্বল্প বলের কোন ব্যক্তি বা যে কখনো অস্ত্র ব্যবহার করেনি বা কোন হীনজাতি পুরুষ ধনুতে গুণ দিতে বা লক্ষ্যবেধ করতে পারে না। এখন কন্যার জন্য কোন রূপ দুঃখ করা অনুচিত।

এরূপ কথাবার্তার সময় দ্রুপদ রাজার অন্য এক দূত এসে পাণ্ডবগণকে রাজা দ্রুপদের প্রাসাদে ভোজনের নেমন্তন্ন করলেন। কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদ প্রাসাদে গেলেন এবং দ্রুপদরাজ তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনা করেন। রাজা দ্রুপদ ও তাঁর অমাত্যবর্গ পাণ্ডবদের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত গুণাগুণ দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন।

অতঃপর রাজা দ্রুপদ তাঁদের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠির আত্ম পরিচয় দিয়ে জানান তাঁরা ক্ষত্রিয় ও রাজা পাণ্ডব পুত্র। তিনি স্বয়ং যুধিষ্ঠির, যাঁরা রাজমণ্ডলীকে পরাজিত করেছেন তাঁরা ভীম ও অর্জুন। সম্মুখে নকুল ও সহদেব রয়েছে। যিনি দ্রৌপদীর সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন, তিনি জননী কুন্তী। অতএব আপনার কন্যা—

ব্যেতু তে মানসং দুঃখং ক্ষত্রিয়াঃ স্মো নরর্ষভ।
পদ্মিনীব সুতেরংতে হ্রাদান্যহ্রদং গতা ॥ (আ) ১৯৪।১১

—হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার মনের দুঃখ দূর করুন। আমরা ক্ষত্রিয়, পদ্ম যেমন এক হ্রদ হতে অন্য হ্রদে যায়, তেমনি আপনার কন্যাও এ রাজার প্রাসাদ হতে অন্য রাজার প্রাসাদে গেছে মাত্র।

যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে পাণ্ডুপুত্রদের পরিচয় পেয়ে রাজা দ্রুপদ আনন্দে অশ্রুপাত করতে থাকেন। অতঃপর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্রুপদ রাজা নির্দিষ্ট এক বৃহৎ ভবনে প্রবেশ করেন। তাঁরা সেই ভবনে বাস করতে থাকেন। একদিন রাজা দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের কাছে ঐ পুণ্য দিবসে অর্জুনের সঙ্গে বিধি অনুসারে দ্রৌপদীর বিয়ের অনুমোদন প্রার্থনা করেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন তাঁরও বিবাহে প্রয়োজন। রাজা দ্রুপদ বলেন, আপনি দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করতে পারেন বা আপনাদের মধ্যে যাকে বলবেন তিনিই দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করুক। উত্তরে যুধিষ্ঠির জানালেন দ্রৌপদী তাঁদের সকলেরই সহধর্মিনী হবেন, জ্যেষ্ঠানুসারে অগ্নি সাক্ষী করে

দ্রুপদ রাজা সব ভ্রাতাকেই (পঞ্চ পাণ্ডব) দ্রৌপদীকে সম্প্রদান করুন। এইরূপ প্রস্তাবে দ্রুপদ রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন এক পুরুষেব বহু স্ত্রী হতে পারে। কিন্তু এক স্ত্রীলোকের বহু স্বামী শাস্ত্রে নেই। এই রকম বিতর্কের সময় ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে এ সম্বন্ধে সকলেব অভিমত জানতে চান। দ্রুপদ রাজা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

তখন যুধিষ্ঠির তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে বলেন পুরাণে গৌতম বংশীয়া জটিলা সাতজন ঋষিব পত্নী ছিলেন। মুনি কন্যা বার্ক্ষীর দশ পতি ছিল। তাঁদের সকলেরই নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির বলেন :—

মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি।
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি॥ (আঃ)

আপনি বিনা বিচারে এ বিবাহ কার্য সম্পন্ন করুন।

অতঃপর ব্যাসদেব দ্রুপদ রাজাকে গোপনে পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত শোনালেন এবং দ্রুপদ রাজাকে দিব্যদৃষ্টি দানে পাণ্ডবদের দিব্যরূপ দেখালেন।

যথার্থই মাতৃ আজ্ঞাতেই কি যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতাকে দ্রৌপদীকে বিয়ে করার বিধান দিয়েছিলেন ? না গৃহাগতা দ্রৌপদীর রূপে তিনিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি দ্রৌপদীকে সবাই বিয়ে করবার স্বপক্ষে এত যুক্তির অবতারণা করেছেন ?

দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদীকে পঞ্চ ভ্রাতার সহধর্মিনী কবতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। দেব ও দৈবের নির্দিষ্টে দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামী পেলেন।

কালক্রমে পাণ্ডুপুত্রদেব বিবাহ সংবাদ কুরুকুলে প্রকাশ পেলো। দুর্যোধন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর পাণ্ডবরা জীবিত ও তাঁরা দ্রুপদ কন্যাকে বিবাহ করে দ্রুপদ রাজার মিত্রতা লাভ করেছে· এ সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে দিলেন। এবং তাঁদের ন্যায্য

প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে তাঁদের আনতে উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের পরামর্শে বিদুরকে কুন্তী ও কৃষ্ণার সঙ্গে পাণ্ডবদের আনবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বিদুরও পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, এবং দ্রুপদ রাজার নিকট জননী ও পত্নীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দ্রুপদ রাজাও সানন্দে অনুমতি দিলেন। রাজা দ্রুপদের অনুমতি পেয়ে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ও বিদুরের সঙ্গে জননী ও পত্নীসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। ধৃতবাষ্ট্র ও প্রজাবৃন্দেব দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে পাণ্ডবগণ পত্নী ও মাতাব সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন। পরে গান্ধারীর পরামর্শে বিদুর পাণ্ডবদের জননী কুন্তী ও পত্নী দ্রৌপদীসহ পাণ্ডুর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

পাণ্ডবরা যখন হস্তিনাপুরে কিছুদিন বিশ্রাম করছিলেন, তখন ভীষ্মের পরামর্শে ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন। পাণ্ডববা ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট আসলেন। তিনি যুধিষ্ঠিবকে বললেন, ভবিষ্যতে যাতে তাঁব পুত্রদেব সঙ্গে পাণ্ডবদের কোন বিবাদ না হয়, একথা চিন্তা করে তিনি পাণ্ডবদেব খাণ্ডবপ্রস্থেব শাসন ভার দিলেন। সেই দিনই ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে খাণ্ডবপ্রস্থের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে ঐরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রেব আদেশানুসারে অর্দ্ধবাজ্য ভয়ঙ্কব বন খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করলেন।

যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে অধিষ্ঠিত হলে পর কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্মরণ করেন। এবং ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে এক সুন্দর পুরী নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং সেই নগরের নামকরণ কবলেন ইন্দ্রপ্রস্থ। সেই নগবী পঞ্চভ্রাতা দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে নাগপরিবৃতা ভোগবতীব শোভা ধাবণ করলো। যুধিষ্ঠিব বিশ্বকর্মা ও বেদব্যাসকে বিদায় দিযে গমনেচ্ছু কৃষ্ণকে বললেন, তোমাব কৃপাতে আমরা রাজ্য পেযেছি। তোমার কৃপাতে দুর্গম শূন্যস্থান রাষ্ট্রে পরিণত হলো। তুমি আমাদেব মাতা, পিতা,

ইষ্টদেবতা। পাণ্ডবের পক্ষে যা শুভ হবে মনে কর, আমাদের তা আদেশ কর। জননী কুন্তীও কৃষ্ণকে অনুরূপ কথা বললেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিব খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। তাঁর সুশাসনের জন্য বহু জ্ঞানী গুণী ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বসতি স্থাপন করলেন। চার ভ্রাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যুধিষ্ঠির এক মহাযজ্ঞের শ্রী ধারণ করেন।

অনুগৃহ্ণন্ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্ব ধর্ম ভৃতাং বরঃ।
অবিশেষেণ সর্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ॥ (সভা) ১৩।৭

—কাবো প্রতি পক্ষপাতিত্য না করে সব প্রজার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করে যুধিষ্ঠির সকলের মঙ্গল সাধন করতেন।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে দ্রৌপদীর সঙ্গে কালাতিপাত করতে থাকেন। একদিন সব ভ্রাতারা যখন একত্রে বসেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ আসলেন। দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে যাতে বিবাদ না হয় সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ বিধান অবলম্বনের উপদেশ দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষির সম্মুখে ঐ বিধান পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

মহর্ষি নারদের সাক্ষাতে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সম্বন্ধে যে নিয়ম শপথ করে গ্রহণ করেছিলেন, একদিন তপস্বী এক ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের জন্য অর্জুন সে নিয়ম ভঙ্গ করে দ্বাদশ বৎসর বনবাসের দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গোধন উদ্ধার করে এসে অর্জুন দণ্ড গ্রহণের জন্য অগ্রজের নিকট গেলে যুধিষ্ঠির বলেন, ঐরূপ ক্ষেত্রে অর্জুন তাঁর প্রিয় কাজই করেছেন। এবং তাতে যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হননি। ছোট ভাই বড় ভাইএর ঘরে প্রবেশ করলে ধর্মনাশ রূপ কোন দোষ হয় না। অর্জুন বললেন, কপটতার সঙ্গে ধর্মেব অনুষ্ঠান করবে না,—এটাই যুধিষ্ঠিরের অনুশাসন। এই জন্য তিনি বনবাসের জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং অনুমতি পেয়ে দ্বাদশ বছরের জন্য বনবাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এ প্রসঙ্গে রামের লক্ষ্মণ বর্জন উল্লেখযোগ্য। রাম প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কঠোর। বশিষ্ঠের উপদেশ মত বধ এবং বর্জন সমান বা একই জিনিষ। তাই কালপুরুষের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষার্থে তিনি লক্ষ্মণকে বর্জন করতে ইতঃস্তত করেননি। কিন্তু যুধিষ্ঠির অঙ্গীকার ভঙ্গকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে সম্মত হলে, বোধ হয় তা উপেক্ষাই করতেন। এইখানে রামের দৃঢ় মনোবলের ও যুধিষ্ঠিরের দুর্বল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

বনবাস কালে অর্জুন নানাদেশ ভ্রমণ করে রৈবতক পর্বতে আসলেন ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। তখন রৈবতক পর্বত উৎসবে মগ্ন। সেই উৎসবে কৃষ্ণের ভগ্নীকে দেখে অর্জুন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিরূপে লাভ করা যায় জিজ্ঞেস করলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রাকে ক্ষত্রিয় ধর্মানুযায়ী বলপূর্বক হরণ করতে হবে বলে জানান। কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলেন, অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করেন। দ্বাদশ বছর নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং কঠোর তপস্যা করে দেবতাদের নিকট হতে নানা অস্ত্র লাভ করে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন।

সব রকম অশান্তি দূব হলে পাণ্ডবরা আনন্দিত চিত্তে নিজেদের বিক্রমে রাজন্যবৃন্দকে বশীভূত করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিছুদিন পর অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে জলবিহারে যমুনা যেতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে জলবিহারে গমন করলে, সেইখানে অগ্নির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। অগ্নিদেব খাণ্ডববন দগ্ধ করবার জন্য কৃষ্ণার্জুনের সাহায্য চাইলে, তাঁবা তাঁকে সাহায্য করেন। ময়দানব সহ ছয়টি প্রাণী ব্যতীত ঐ বনের সব কিছুই দগ্ধীভূত হয়। যেহেতু অর্জুন ময়দানবকে রক্ষা কবলেন, তাই ময়দানব অর্জুনের কোন প্রত্যুপকার করবার বাসনা ব্যক্ত করেন। অর্জুন কৃষ্ণের কোন উপকার কবলেই তাঁর উপকার

করা হবে বলে ময়দানবকে জানালেন। কৃষ্ণের নিকট ময়দানব তার অভিলাষ ব্যক্ত করলে, কৃষ্ণ তাকে বললেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরামর্শ করে ইন্দ্রপ্রস্থে একটি সুন্দর সভাগৃহ নির্মাণ করতে।

কৃষ্ণার্জুন তারপর যুধিষ্ঠিরের কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে ময়দানবের পরিচয় দিলেন। যুধিষ্ঠির ময়দানবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। কিছুদিন পর ময়দানব সভাগৃহ নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং চৌদ্দ মাসে সভাগৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন।

সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও দেব দ্বিজের পূজার্চনা করে যুধিষ্ঠির সেই রম্য সভাগৃহে প্রবেশ করেন। একদিন যখন পাণ্ডবরা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের ও গন্ধর্বদের সঙ্গে ঐ সভাগৃহে বসেছিলেন, তখন অপর চারজন ঋষির সঙ্গে দেবর্ষি নারদ সভাস্থ ব্যক্তিদের দেখে প্রীত হন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেন। মধুপর্ক ও অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণের সঙ্গে দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করে তাঁদের যথাযোগ্য সেবা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে পূজার্ঘ্য পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, দেবর্ষি নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম, অর্থ, কাম সংযুক্ত বহু উপদেশ যুধিষ্ঠিরকে দেন। নারদ প্রশ্ন করেন—অর্থ চিন্তার সঙ্গে ধর্ম চিন্তাও কর তো? অত্যন্ত সুখে আসক্ত মন দূষিত হয়নি তো? অর্থ লুব্ধ হয়ে ধর্মে বা ধর্মানুরক্ত হয়ে অর্থ চিন্তাই বিরক্তি বোধ কর না তো? কাল বিভাগ করে ধর্ম, অর্থ ও কামের যথাবিধি সেবা কর তো? মন্ত্রী, মিত্র, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা, প্রজাবৃন্দ লুপ্ত হয়নি তো? তারা সর্বদা অনুরক্ত তো? বৃদ্ধ শুদ্ধ চরিত্র সম্বোধন সমর্থ কুলীন এবং অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত কর তো? তোমার সমস্ত দুর্গ ধন, ধান্য জল ও যন্ত্র দ্বারা পরিপূর্ণ রেখেছো তো? তথায় ধনুর্দ্ধর ব্যক্তিগণকে সর্বদা সতর্ক রাখছো তো? কঠোর দণ্ড বিধানে প্রজাদের উত্তেজিত কর না তো? প্রগলভ বীর বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পবিত্র কুলীন কার্যদক্ষ প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই সেনাপতি করেছো

তো? সৈন্যদের যথোচিত ভোজন ও বেতন দানে অধিক বিলম্ব ঘটলে ভৃত্যরা প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়—যা অতি অনর্থের মূল। যদি কোন ব্যক্তি আপন পুরুষকার দ্বারা প্রভুর কার্য সুসম্পন্ন করে, তাকে অতিরিক্ত ভাতা বা বেতন বা সম্মান দেখান হয় তো? প্রভুর উপকার সাধনে যদি কারো মৃত্যু ঘটে অথবা বিকলাঙ্গ বা অক্ষম হয়, তার পরিবারকে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা আছে তো? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক আয় ব্যয় নিত্য পূর্বাহ্নে নিরূপণ করে তো? লুব্ধ চোব, বৈরী বা অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করা হচ্ছে না তো? তস্কর লুব্ধক বা কুমারগণ রাষ্ট্রপীডা উৎপন্ন করে না তো? রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে জলপূর্ণ তড়াগ খনন করা হয়েছে তো? রাজ্যে কৃষকদের বীজ ও অন্নাদির অভাব নেই তো? প্রত্যেক কৃষককে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে শত সংখ্যক ঋণ দেওয়া হয় তো? স্ত্রীলোকদেব রক্ষা ও তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হয় তো? বিশ্বাস করে তাদের কাছে কোন গোপন কথা প্রকাশ করা হয় না তো? নাস্তিকতা, অসত্য, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানীর সঙ্গত্যাগ আলস্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়েতে আসক্তি, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ মঙ্গল কার্য্যাদির অপ্রয়োগ, সব শত্রুকে এক সঙ্গে আক্রমণ—এই চৌদ্দ প্রকার রাজদোষ বর্জন করা হয়েছে তো?

উত্তবে যুধিষ্ঠির বলেন, প্রভু আপনার আজ্ঞা মতই কাজ করবো। আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হলো। যুধিষ্ঠির নারদের উপদেশানুসারে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন এবং অচিরেই বসুন্ধরার অধীশ্বর হলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠিব দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞেস কবলেন তাঁর সভার ন্যায় বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এমন কোন সভাগৃহ দেখেছেন কিনা। প্রত্যুত্তরে নারদ জানালেন যে যুধিষ্ঠিরের মণিময় সভাকক্ষের ন্যায় দ্বিতীয় কোন সভা কক্ষ তিনি মনুষ্যলোকে দেখেননি বা শোনেননি। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরের অবগতির জন্য

যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবেরের সভার বর্ণনা করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞেস করেন পিতৃলোকে তিনি পিতা পাণ্ডুকে কিরূপ দেখলেন এবং প্রত্যাগমন কালে তিনি তাঁকে কি বললেন? নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন তাঁর পিতা রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে অবস্থিত হরিশ্চন্দ্রের সম্পদ দেখে অতিশয় বিস্মিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলতে বলেছেন যে তিনি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ এবং ভ্রাতাগণ তাঁর বশীভূত। অতএব যুধিষ্ঠির যেন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুত্রদ্বারা এ যজ্ঞ সম্পন্ন হলে পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু বৎসর পর্যন্ত ইন্দ্রসভায় থেকে আনন্দ ভোগ করতে পারবেন। দেবর্ষি নারদও যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

যদিও স্বর্গত পিতাব একান্ত ইচ্ছা এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশ ও সম্মতি পেলেন, তবু যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে তাঁব রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প ভ্রাতাদের, মন্ত্রিগণকে ও মুনিবৃন্দকে জানালেন এবং তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সম্মতি প্রার্থনা করলেন। ভ্রাতাগণ, ঋত্বিকগণ, মন্ত্রিগণ, ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন সকলেই যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে তিনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ করবার সর্বপ্রকারে যোগ্য পাত্র। তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্কল্প স্থির করবার জন্য কৃষ্ণের দর্শনেচ্ছু হয়ে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। তাঁর প্রার্থনায় কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প ব্যক্ত করে তাঁব নিরপেক্ষ অভিমত জানতে চাইলেন।

কৃষ্ণ বলেন যুধিষ্ঠির সম্রাট আখ্যা লাভে ইচ্ছুক। সাম্রাজ্য প্রাপ্তির যে পাঁচটি গুণ শত্রুজয়, প্রজাপালন, তপঃশক্তি, ধন সমৃদ্ধি ও নীতি-ঐ সমস্ত গুণই যুধিষ্ঠিরে বর্ত্তমান। কিন্তু অন্তরায় বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধ, যিনি এখন নিজেকে সম্রাট বলে দাবী করেন। ছিয়াশীজন রাজাকে বন্দী করেছেন। বাকী চৌদ্দজন রাজাকে বন্দী দশায় আনতে পারলে তিনি সম্রাট হবেন। কৃষ্ণ বলেন এ জরাসন্ধকে

আমরা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত করবো।

কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধের জনবল ও শক্তিবলের কথা শুনে যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ ভীমার্জুন তাঁর দুই চক্ষু কৃষ্ণ তাঁর মন স্বরূপ। (ভীমার্জুনোবুভৌ নেত্রে মনোমন্যে জনার্দনম)। এই তিনজনকে জরাসন্ধ বধে পাঠিয়ে মনহীন চক্ষুহীন হয়ে তিনি কি করে বেঁচে থাকবেন? (মনশ্চক্ষুবিহিনস্য কিদৃশং জীবিতং ভবেৎ)।

জরাসন্ধবলং প্রাপ্য দুষ্পারং ভীমবিক্রমম।

যমোঽপি বিজেতাজৌ তত্র বঃ কিং বিচেষ্টিতম্॥ (সভা) ১৬।৩

—জরাসন্ধের বলের তুলনা করা কঠিন, তার বিক্রম ও ভয়ানক, যমরাজও তাকে জয় করতে সমর্থ নয়। সেখানে আপনাদের চেষ্টায় কি ফল হতে পারে? অতএব রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা পরিত্যাগ করাই সমীচীন।

যুধিষ্ঠিরের ঐ ক্লৈব্যভাব দেখে অর্জুন বলেন, ধনু, শস্ত্র, বাণ, পরাক্রম, স্বপক্ষ, ভূমি, যশ ও বল, এ সমস্ত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ঈপ্সিত আমি সমস্তই পেয়েছি। শত্রুদের জয় করবার যাঁর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি তিনিই সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। এই রকম প্রাজ্ঞ বাক্য দ্বারা অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা ক্ষত্রিয় ধর্ম বলে বোঝান। তা নয়ত মুনিদের মত কাষায় বস্ত্র পরিধানই শ্রেয়। (কাষায়াং সুলভং পশ্চাম্মুথীনাং শমমিচ্ছতাম্)।

কৃষ্ণ জনার্দ্দন সর্বতোভাবে অর্জুনের উক্তি সমর্থন করেন। জনার্দ্দনও অনুরূপ বাক্যে যুধিষ্ঠিরের জরাসন্ধ বধে অনিচ্ছাকে ধিক্কার দেন।

ন স্ম মৃত্যুং বয়ং বিদ্ম রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।

ন চাপি কঞ্চিদমরমযুদ্ধেনানুশুশ্রুম॥ (সভা) ১৭।২

—মৃত্যু কখন ঘটবে রাত্রে বা দিনে তা আমরা জানি না। যুদ্ধ না করে কোন ব্যক্তি অমর হয়েছে তাও শুনিনি।

জয় করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। এইভাবে পাণ্ডবগণ চতুর্দিক জয় করে সমস্ত পৃথিবীকে স্বধর্মানুসারে শাসন করতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্য মনস্থির করেন এবং সকলে তাতে সম্মতি জানান। কৃষ্ণও সেই সময় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা মত তাঁকে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করার অনুমতি দেন। তারপর ঋত্বিকগণ যুধিষ্ঠিবকে রাজসূয যজ্ঞে দীক্ষা প্রদান করলেন। এ যজ্ঞে নৃপতিবৃন্দ, কৌরবগণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের ভোজন বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা করা হলো।

ভীষ্মের উপদেশ মত উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির অর্ঘ্য প্রদান করে। কৃষ্ণ ঐ অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল বাসুদেবের ঐ পূজা সহ্য করতে না পেরে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে তিরস্কার করতে থাকেন। কারণ তাঁর মতে মধুসূদন কৃষ্ণ ঋত্বিকও নয়, আচার্য্যও নয়, রাজাও নয়। অতএব কোন হিতসাধনের জন্য তাঁকে অর্ঘ্য দেওয়া হলো ?

যুধিষ্ঠির শিশুপালকে প্রবোধ দিয়ে বলেন যে কৃষ্ণের ও ভীষ্মের সম্বন্ধে কর্কশ বাক্য নিরর্থক। উপস্থিত সব নৃপতি কৃষ্ণের পূজা মেনে নিয়েছেন। শিশুপালকেও তা মেনে নিতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে ভীষ্মের কৃষ্ণতত্ত্ব বিশেষভাবে জানা আছে যা শিশু-পালের জানা নেই।

তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে সর্বলোকে বৃদ্ধতম কৃষ্ণেব পূজাকে যে অবমাননা করে তাকে কোনরূপ অনুনয় বা সান্ত্বনা দেওয়া উচিত নয়। এ বাজসভায় এমন একজন রাজাকে দেখছি না যিনি সাত্বতীপুত্র কৃষ্ণের বিক্রমে পরাভূত হননি। কৃষ্ণ কেবল আমাদের পূজনীয় নন, তিনি ত্রিলোকের পূজনীয়। এভাবে ভীষ্ম কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, কৃষ্ণতত্ত্ব, তাঁর অতীত ও বর্তমান লীলা ও কর্মের কথা ঐ রাজসভায় বিশদভাবে বর্ণনা করেন। এবং তাঁর বহুবার

মর্তে দিব্য আবির্ভাবের কথাও বলেন। ভীষ্ম কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনার উপসংসারে বলেন যদি শিশুপাল কৃষ্ণ পূজাকে দুষ্কর্ম মনে করেন৹ তবে তাঁর যেরূপ ইচ্ছা তা তিনি করতে পারেন।

ভীষ্মর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সহদেব বলেন অপ্রমেয় পরাক্রম কেশিহন্তা কেশব কৃষ্ণের পূজা যাঁরা সহ্য করতে ইচ্ছুক নন তিনি সেই সব রাজার মস্তকে পদার্পণ করছেন। তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করার যদি কারো সাহস থাকে সে উত্তর করুক। যে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করবে সে তাঁর বধ্য।

কৃষ্ণ পূজিত হলে শিশুশাল ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাঁর পক্ষের রাজাদের যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড করতে উত্তেজিত করেন। সহদেব চরণ দেখিয়ে সব নৃপতির অপমান করার দরুণ সব নৃপতিকেই ক্রোধে বিবর্ণবদন দেখা গেল।

ক্রোধান্বিত নৃপতিমণ্ডলকে দেখে যুধিষ্ঠির কুরুপিতামহ ভীষ্মকে কি কর্তব্য জিজ্ঞেস করলেন। ভীষ্ম অভয় দিয়ে বলেন কুকুর কখনো সিংহকে বধ করতে পারে না। কৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকলে তাঁর কোন অমঙ্গল হবে না।

ভীষ্ম সব রাজাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে শিশুপাল তাঁকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। কৃষ্ণেব প্রতি কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করায় ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং শিশুপালের দিকে ছুটে যেতে ভীষ্ম বাধা দিলেন। শিশুপাল ক্রুদ্ধ ভীমকে ছেড়ে দিতে ভীষ্মকে বললেন। কারণ অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করে শিশুপালও তেমনি ভীমকে নিগৃহীত করবেন।

অবশেষে শিশুপাল বললেন ভীষ্ম তুমি নিন্দনীয় কাজ করেও যে এখনো জীবিত, তা নৃপতিদের কৃপায়, তোমার বীর্য্য বলে নয়। তখন ভীষ্ম সকলকে শুনিয়ে বলেন যে চেদিরাজ বলে, রাজাদের কৃপাতেই আমি এখনো জীবিত আছি। আমি এরূপ কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নই। এই সব রাজাদের আমি তৃণের ন্যায় মনে

করি।

ভীষ্মের এই উক্তিতে রাজাদের মধ্যে কোলাহল উঠলো। কোন কোন নৃপতি ভীষ্মকে দাম্ভিক আখ্যা দিযে, তিনি ক্ষমার অযোগ্য বলে অভিহিত করলো। ভীষ্মকে পশুর ন্যায় বধ করে কটাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করতে বললো।

প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম বলেন, আমি আপনাদেব মস্তকে পদ রাখছি, আপনাদের শক্তি থাকে তো আমাকে পশুর ন্যায় বধ কবে কটাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করুন। চেদিরাজ কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে তা নিজের মরণের জন্যই।

ভীষ্মের উক্তিতে শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং বলেন তুমি দাস, পূজাব যোগ্য নও, তথাপি পাণ্ডবরা তোমাব পূজা করছে। তাবা আমাব বধ্য।

. শিশুপালেব কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন এবং সকলের সমক্ষে চেদিরাজ সর্বদা সাত্বতীগণেব প্রতি নির্দ্দয় একথা বলেন এবং তার অনেক নৃশংস কর্মের উল্লেখ করেন। এই সভায় তাঁর প্রতি শিশুপালের কর্কশ আচরণের কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণ বলেন যে, এদ্দিন তিনি তাকে ক্ষমা কবেছেন। কাবণ তাঁর পিতৃষ্বসা শিশুপালের মাতাব নিকট কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আর নয়। কৃষ্ণ তখন দৈত্যকুল সংহারকারী চক্রকে স্মরণ করলে ক্ষণকালের মধ্যে চক্র হাজির হলো। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চক্রদ্বারা শিশু-পালের মস্তক বিচ্ছিন্ন কবেন। ছিন্ন মস্তক চেদিরাজ ভূলুণ্ঠিত হলো এবং তাঁর শরীর হতে শ্রেষ্ঠ তেজ বের হয়ে কৃষ্ণকে নমস্কার করে তাঁর শবীরে প্রবেশ কবলো। নৃপতিদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রোধে হস্ত মর্দন ও দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করতে থাকলো। কেউ কেউ কৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগলো। যুধিষ্ঠির তখন চেদিরাজের দেহ সংকার করবার জন্য ভ্রাতাদের আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালিত হলো। অতঃপর সর্বসমৃদ্ধিপূর্ণ

যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞ সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করে অনুষ্ঠিত হলো। কৃষ্ণের দ্বারা বিঘ্নশূন্য হয়ে, প্রচুর ধন, ধান্য, অন্ন ও নানা ভক্ষ্য দ্রব্যে সমৃদ্ধ হয়ে যজ্ঞ চলতে থাকে। দানে, ভোজনে, গানে, নৃত্যে পরিপূর্ণ হয়ে মহাসমারোহের মধ্যে সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলো।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞান্তে স্নান করলে পর সব রাজন্যবর্গ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সীমা পর্যন্ত রাজন্যবর্গের অনুগমনের আদেশ দেন।

রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই চলে গেলে, বাসুদেব যাবার অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন যে কৃষ্ণের কৃপায় তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উপহার সমূহ পেয়েছেন। অতএব কৃষ্ণকে যাও বলা সম্ভব নয়। তবে যদি তিনি একান্তই যেতে চান, তবে যুধিষ্ঠির আপত্তি করবেন না। সকলে চলে গেলে দুর্যোধন ও শকুনি ময়দানব নির্মিত রাজসভায় অবস্থান করতে থাকেন।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হলে শিষ্যগণের সঙ্গে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং স্বস্থানে চলে যাবার অনুমতি চাইলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একথা বললে যুধিষ্ঠির পিতামহের চরণ বন্দনা করে বললেন, তাঁর মনে এক দুশ্ছেদ্য সংশয় উদিত হয়েছে, যা কেবল পিতামহ ব্যাসদেবই দূর করতে পারেন। তিনি বলেন শিশুপাল-বধে মহান বিপদ দেখা দিয়েছে।

যুধিষ্ঠিবের বাক্যে ব্যাসদেব বলেন, এই উৎপাতের বা বিপদের ফল ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে ফলবে। এর দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ সূচিত হচ্ছে। একমাত্র তোমাকে নিমিত্ত করে, দুর্য্যোধনেব অপবাধে, ভীমার্জুনের বলে এখানে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ প্রাপ্ত হবে। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। কারণ কাল দুরতিক্রমণীয়। তুমি প্রমাদশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে রাজ্য শাসন কর। এ কথা বলে তিনি কৈলাস পর্বতাভিমুখে গমন করলেন।

পরবর্ত্তী ঘটনা স্রোতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী যুধিষ্ঠিরের সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী যুধিষ্ঠিরকে চিন্তিত ও সচকিত করলো। তিনি পিতামহ ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ভ্রাতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করলেন। যদি সব ক্ষত্রিয়ের তিনিই বিনাশের হেতু হন, বিধাতার ঈপ্সিত মৃত্যুর জন্য তিনি স্থির সঙ্কল্প করেছেন। যখন কালের এরূপ ব্যবস্থা, তখন তাঁর জীবন ধারণে কোন্ হিত সাধিত হবে? প্রত্যুত্তরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এ রকম বুদ্ধি নাশক দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হতে বারণ করেন। এবং যা কল্যাণকর হবে তা করতে অনুরোধ করলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের বললেন, সেদিন হতে তের বছর অবধি তিনি বা তাঁর কোন ভ্রাতাই কোন নৃপতিকে কর্কশ বাক্য বলবেন না, জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সমভাবে অবস্থান করবেন, নিজের পুত্রের সঙ্গে অন্যান্যদের পুত্রের কোন প্রভেদ করবেন না, সকলের প্রিয় আচরণ করে কলহ বর্জন করবেন, লোকে যেন মন্দ না বলে সর্বদা তার চেষ্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই আচরণবিধি অন্যান্য ভ্রাতাগণ অনুসরণ করে ধর্মরাজের হিতসাধনে সর্বদা ব্যাপৃত থাকবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দুর্য্যোধন শকুনির সঙ্গে সেই দিব্যসভা গৃহ ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে এমন সব বস্তু সেখানে দেখলেন যা হস্তিনাপুরে দেখেননি। ঐ মায়াময়ী সভাগৃহের কোন কোন দ্রব্য দুর্য্যোধনকে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত করলো। তিনি বার বার নানারকম ভাবে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বিপুল ঐশ্বর্য সম্ভারে তাঁর চিত্ত অপ্রসন্ন হলো। পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

'হিংসুক পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে।' দুর্য্যোধনও পাণ্ডুতনয়ের ঐশ্বর্য, শৌর্য, বীর্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখে অন্তরে জ্বলতে

থাকেন। অসূয়ার ফলে তাঁর মনে পাপ বুদ্ধি উদয় হলো। তিনি মাতুল শকুনির নিকট স্বীকার করেন যে অর্জুনের বাহুবলে বিজিত এ সমগ্র পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশীভূত। যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞ দেখে তিনি দিবারাত্র ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন এবং অসহিষ্ণু হয়ে জ্বলে পুড়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে কোন প্রকারে আত্মহত্যা করবার বাসনা ব্যক্ত করলেন এবং জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার কথা ব্যক্ত করে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

শকুনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরকে ঈর্ষা করতে বারণ করে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁদের বিনাশের জন্য নানারকম চেষ্টা সত্ত্বেও সমর্থ হওয়া যায়নি। বরং পাণ্ডবরা অশুভ হতে শুভ আহরণ করেছে, যেমন দ্রৌপদী লাভ, কৃষ্ণকে সহায়রূপে পাওয়া, পিতৃপুরুষের রাজ্যের অংশ পাওয়া ইত্যাদি। তাঁদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না, পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখে, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণীর বা রাক্ষসকিন্নর দেখে শোক করা উচিত নয়। শকুনি আরও বলেন যে দুর্য্যোধনও অসহায় নন। শকুনির ভ্রাতারা তাঁর বশীভূত, দ্রোণ, তাঁর পুত্র, কর্ণ, কৃপাচার্য, রাজা জয়দ্রথ, শকুনি স্বয়ং—এই সকলের সহায়তায় দুর্যোধন সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে সক্ষম।

উত্তরে দুর্যোধন বলেন যে শকুনিও তাঁর পক্ষীয় অন্যান্য মহারথদের সাহায্যে তিনি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও মহামূল্য সভাগৃহ ইত্যাদি জয় করতে ইচ্ছুক। শকুনি বলেন যে দেবগণের সঙ্গে মিলেও পাণ্ডবদের জয় করা সম্ভব নয়। শকুনি আরও বলেন যে তিনি একটি উপায় জানেন যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করা সম্ভব।

দুর্য্যোধন অধীর হয়ে মাতুল শকুনির নিকট সেই উপায়ের কথা জানতে চাইলেন। উত্তরে শকুনি বলেন যে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় খুব অনুরাগী। কিন্তু খেলায় তেমন দক্ষ নন। শকুনি নিজে পাশা খেলায় অত্যন্ত পটু এবং ত্রিলোকে পাশাখেলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অতএব যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত খেলায় আমন্ত্রণ করা হোক।

পাশা খেলা দিয়ে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সব জয় করা যাবে। শকুনি দুর্যোধনকে তাঁর পিতার অনুমতি নিতে বলেন। এবং তাঁর অনুমতি পেলে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিঃসংশয়ে জয় করতে পারবেন।

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।

সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্যতি নিবর্ত্তিতুম্॥ (সভা) ৪৮।১৯

—পাশা খেলা কুন্তী পুত্রের অতি প্রিয়, কিন্তু তিনি ক্রীড়ায় পটু নন। তাঁকে আহ্বান করলে তিনি নিবৃত্ত হতে পারবেন না।

যুধিষ্ঠিরের দ্যূত ক্রীড়া সম্বন্ধে দুর্বলতার বিষয় সকলেই অবগত। তাঁর মত ধার্মিক জনের ব্যসনের প্রতি এরূপ আসক্তি—এক অসঙ্গত বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই দ্যূতাসক্তিই পাণ্ডবদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ, অন্যপক্ষে ঐ দ্যূতক্রীড়াই কুরুকুলের ধ্বংসের কারণ।

দুর্য্যোধন ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন। শকুনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে দুর্যোধন দিন দিন কৃশ ও দীনভাবাপন্ন হয়ে চিন্তান্বিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এরূপ অবস্থার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। কারণ তিনি রাজার ন্যায় অবস্থান করছেন ও রাজসুখ ভোগ করছেন, তবুও তিনি কৃশ বা দীনভাবাপন্ন কেন হবেন? দুর্যোধন স্বর্গের ইন্দ্রের ন্যায় জীবন যাপন করছেন।

উত্তরে দুর্যোধন পিতাকে জানালেন যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য, শ্রী দর্শনে তাঁর ভোজ্যবস্তু অপ্রিয় হয়েছে। তারপর দুর্য্যোধন পিতার নিকট যুধিষ্ঠিরের যাবতীয় ঐশ্বর্য, মান, সন্মান, নৃপতিদের নানা ধন রত্ন দান ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করে বলেন যে এ সব দেখে তিনি যেন জরাক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর চিত্ত যেন সর্বদা দগ্ধ হচ্ছে। শান্তি নেই তাঁর মনে। তিনি আরও বলেন এ অশান্তি দূর করবার জন্যে যুদ্ধের দ্বারা পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য আহরণ করতে হবে নয়ত রণভূমিতে আহত হয়ে শয়ন করতে হবে।

তখন শকুনি যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য কি প্রকারে পাওয়া যায়

তার একটি উপায় জানালেন। শকুনি অক্ষক্রীড়া পটু, যুধিষ্ঠিরও অক্ষক্রীড়া প্রিয়, কিন্তু অপটু। তাঁকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলে তিনি নিশ্চিত আসবেন। শকুনি কপটতার দ্বারা তাঁকে জয় করে তাঁর দিব্যশ্রী হরণ করবেন।

দুর্যোধন পিতাকে অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দিতে বলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। এতে দুর্যোধন আত্মহত্যার ভয় দেখালেন। দুর্যোধনেব এরূপ আর্ত্ত বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র এক মনোরম সভাগৃহ নির্মানের আদেশ দিলেন। অন্যদিকে অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ সম্বন্ধে বিদুরের উপদেশ চাইলেন।

দ্যূতক্রীড়া ব্যাপারে বিদুর সম্মতি দিলেন না এবং ইহা দ্বারা কুলনাশের আশঙ্কার কথা জানালেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দৈবের দোহাই দিয়ে বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আনবার আদেশ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুযায়ী বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে (বিদুরকে) এত অপ্রসন্ন কেন দেখাচ্ছে বলে সকলেব কুশল প্রশ্ন কবেন। তাঁরা পরস্পরের কুশল প্রশ্ন শেষ করলে বিদুব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের সভার মত এক সভাগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন। ভ্রাতাদেব সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে সে সভাগৃহ দেখতে ও সেই সভায় সুহৃদভাবে দ্যূতক্রীড়া করতে আমন্ত্রণ করেছেন। এ দ্যূত সভায় সমবেত কপটীগণকে যেমন গান্ধাররাজ শকুনি, বিবংশতি রাজা চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয়কে দেখতে পাওয়া যাবে এ কথা জানাবার জন্যই বিদুরের আগমন।

যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াতে কলহের আশঙ্কা করে বিদুরের মত প্রার্থনা কবেন। তখন বিদুর বলেন—

…………দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল॥

... ...

বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয়ঃ হয়।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয়॥ (সঃ)

যদিও যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন তাঁর মতই যুধিষ্ঠিরের শিরোধার্য। কিন্তু বিদুর দ্যূতে অনর্থ ঘটে এ কথা বলা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির বললেন

আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ।
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে॥ (সভা) ৫৮।১৬

—আমন্ত্রিত হলে আমি কখনও নিবৃত্ত হই না। এটাই আমার চিরদিনের ব্রত।

যুধিষ্ঠির আরও বলেন, দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর ইচ্ছা নেই। ধৃতরাষ্ট্র পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ না করলে তিনি শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতেন না। তবে তাঁর এ নিত্য ব্রত যে দ্যূতে আহ্বান করলে, তিনি কখনো নিবৃত্ত হন না। পরদিন ভ্রাতাদের, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে তিনি হস্তিনাপুরে যাত্রা করেন।

দৈবং হি প্রজ্ঞাং মুষ্ণাতি চক্ষুস্তেজ ইবাপতৎ।
ধাতুশ্চ বশমন্বেতি পাশৈরিব নরঃ সিতঃ॥ (সভা) ৫৮।১৮

—চোখের উপর পতিত তেজ যেমন চোখের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে, সেরূপ দৈব ও প্রজ্ঞাকে হরণ করে। পাশাবদ্ধ মানুষের ন্যায় সকলেই বিধাতার বশীভূত।

যুধিষ্ঠিরের মত সর্বগুণান্বিত রাজা বিদুরের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সপরিবারে পাশা খেলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। বিদুরের মুখে ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাষ পেয়েও সে সম্বন্ধে ভ্রাতাদের সঙ্গে বা অন্য কারো সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করেই এরূপ পদক্ষেপ হঠকারিতা মাত্র, যার কুফল যুধিষ্ঠির সপরিবারে জীবনভর ভোগ করেছেন।

Cumberlandএর—I look upon every man as a suicide from the moment he takes the dice-box

desperately in his hand. All that follows in his fatal career, from that time, is only sharpening the dagger before he strikes it to his heart. উক্তিটির সত্যতা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে যেন হুবহু মিলে যায়।

রামের দুর্ভাগ্যের কারণ দৈব নির্দ্দিষ্ট। যুধিষ্ঠিরের প্রজ্ঞা দৈবই হরণ করেছিল। যুধিষ্ঠির পাশের দ্বারা আবদ্ধ মানুষের ন্যায় দৈবের পরাধীন। নতুবা জেনে শুনে আগুনে হাত দিলেন কেন?

রাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে রাজসমারোহে যাত্রার শুভার্থে স্বস্তি বাচন উচ্চারণ করতে করতে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে বের হলেন। অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ভ্রাতারা তাঁর অনুগমন করেন। হস্তিনাপুরের অদূরে তাঁবু ফেললেন এবং বিশ্রাম করলেন। তখন বিদুর সকলের সাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়েব অসাধু অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

পরদিন যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। দ্রৌপদীর উত্তম সাজসজ্জায় গান্ধারীর পুত্রবধূরা অপ্রসন্ন হলো। সেদিন হস্তিনাপুরে রাজপ্রাসাদে রাজসম্মানে কাটিযে যুধিষ্ঠিব পরদিন সদ্য নির্মিত রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সমবেত রাজন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ সম্পন্ন করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তখন শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনার আগমনে সকলে আনন্দিত। এটাই পাশা খেলার উৎকৃষ্ট সময়।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

> ....পাশা অনর্থের ঘর।
> ক্ষত্রপরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
> কপট এ কর্ম ইথে কপট বাখান।
> অনীতি কর্মেতে মম নাহি লয় মন॥ (সভা)

যুধিষ্ঠির আরও বলেন যে সব মুনিঋষি কর্ম ও জ্ঞান মার্গে বিচরণ করেন তাঁরা দ্যূতক্রীড়াকে পাপজনক বলেন। পাশা খেলা কপট

ব্যক্তির শঠতা। অতএব মোটেই প্রশংসনীয় কর্ম নয়। কপটতার দ্বারা তিনি সুখ বা ধন কিছুই চান না।

উত্তরে শকুনি বলেন অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞের সঙ্গে জয়লাভের আশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়, শস্ত্রনিপুণ যোদ্ধা অকৃতাস্ত্রের সঙ্গে, বলবান দুর্বলের সঙ্গে কপটতার দ্বারা পরাজয়ে প্রবৃত্ত হয়, এটা শাঠ্য বা কপটতা নয়। তারপর উপহাস করে শকুনি বললেন, অক্ষক্রীড়া করবার জন্যে এসে তাকে কপট খেলা বলে যদি মনে ভয় হয়, তবে দ্যূত ক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত হও।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

আহূতো ন নিবর্ত্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।

বিধিশ্চ বলবান্ রাজন্ দিষ্টস্যাস্মি বশে স্থিতঃ ॥ (সভা) ৫৯।১৮

—পাশা খেলায় আমন্ত্রিত হলে, আমি নিবৃত্ত হব না—এই আমার ব্রত। বিধিই বলবান, অদৃষ্টের অধীন আমি।

যেমন ঃ—

ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

—হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে অবস্থান করে আমাকে যেভাবে নিযুক্ত করছে, আমি তাই করছি।

যুধিষ্ঠিরের অদৃষ্টের উপর নির্ভরতাকে কোন প্রকারেই সমর্থন-যোগ্য নয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর কোন পৌরুষ বা বিধির উপর একান্ত নির্ভরতা প্রকাশ পায়নি। পরন্তু তার অবচেতন মনে দ্যূতাসক্তির প্রক্রিয়াই তাঁকে দ্যূত ক্রিয়ায় প্ররোচিত করেছিল।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের আশঙ্কা জেনে কখনো সেদিকে পা বাড়ায় না, অথচ যুধিষ্ঠিরের মত ধার্মিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁর এই আসক্তিটিকে কোন প্রকারেই দমন করতে পারেননি।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন কার সঙ্গে খেলবেন? অসমান বা

ঈষদূন ব্যক্তি পণ প্রতিপক্ষ হতে পারে না। দুর্যোধন বলেন তাঁর ধনরত্নে তাঁর মাতুল শকুনি পাশা খেলবেন। তবে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হতে পারে।

উপস্থিত রাজন্যবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই সভাগৃহে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হলো। যুধিষ্ঠির তাঁর মহামূল্য মণিহারটি পণ রাখলেন। দুর্যোধন বললেন তাঁর বহু মণি ও ধন আছে। তিনি সব পণ রাখলেন। শকুনি অক্ষ গ্রহণ করে নিক্ষেপ করে বলেন, তোমার পণকে জয় করেছি। কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পণের পর পণ শকুনি জয় করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির বহু সোনা রূপা পরিপূর্ণ অক্ষয় রাজকোষ রাজরথ, একলক্ষ দাসীরূপ ধন, এক লক্ষ যুবক ভৃত্য, এক হাজার মদমত্ত হস্তী, এক হাজার রথ ও রথী গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ প্রদত্ত অর্জুনকে বিচিত্র অশ্ব সমূহ দশ হাজার শ্রেষ্ঠ রথ ও শকট, ষাট হাজার বীরসৈন্য, চারশত নিধি পণ রাখলেন। শকুনি প্রত্যেক পণ জয় করলেন।

ঐ সময়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করে তাঁর জ্ঞান ও চোখকে উন্মোচন করার জন্যে অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ ও হিতকর বাক্য বললেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বংশের স্বার্থে দুর্যোধনকে বধ করবার জন্যে বা ত্যাগ করবার জন্যে এবং পাণ্ডবদের সৌহার্দ্দ্য অর্জনের পরামর্শ দিলেন। বিদুরের এ রকম পরামর্শে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে বিদুরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এমনকি বিদুরকে কুরুকুল ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন। ধৃতরাষ্ট্র নির্বাক শ্রোতার মত বিদুর ও দুর্যোধনের বিতর্ক শুনছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিভীষণের অবস্থা স্মরণীয়। রাবণের সম্মুখে ইন্দ্রজিৎ যখন বিভীষণকে ভর্ৎসনা করছিলেন, রাবণও তখন নীরব ছিলেন।

অতঃপর শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির তোমার যদি আর ধন থাকে, তা পণ রাখ। যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, বিন্দু, মহাবিন্দু, মধ্য ও পরার্দ্ধ পরিমাণ

ধন সিন্ধু নদীব পূর্বতীর হতে পর্ণাশা নদী পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতে যত দুগ্ধবতী গাভী, অশ্ব, ছাগ, মেষ, ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অন্য সব ধন সব নগব ও জনপদ সমস্ত পণ রাখা হলো। শকুনি কপট পাশা খেলায় সব জয় করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলেন—

রাজপুত্রা ইমে রাজংশ্চোভন্তে যৈর্বিভূষিতাঃ।
কুণ্ডলানি চ নিষ্কাশ্চ সর্ব্বং রাজবিভূষণম্।
এতন্মম ধনং রাজংস্তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥ (সভা) ৬৫।১০

—এই যে রাজপুত্ররা সোনার কুন্তলাদি রাজভূষণে বিভূষিত হয়েছেন, সে সবও আমার ধন, আমি সে সব ভূষণকে পণ রাখলাম। শকুনি এই পণও জয় করলেন। এরূপে নকুল, সহদেবকে যুধিষ্ঠির হারালেন। তখন শকুনি কটাক্ষ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, ভীম ও অর্জুন তাঁর অধিকতর প্রিয। এ কটাক্ষে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন দ্যূতকারীরা পাশা খেলতে এমন উৎকট প্রলাপ বকে যা জাগ্রত অবস্থায শোনা যায়না এবং স্বপ্নেও দেখা যায়না। তারপব যুধিষ্ঠিব অর্জুন ও ভীমকে পণ রাখলেন এবং উভয়কেই হারালেন। এবার যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রেখেও হেরে গেলেন।

তখন কপট শকুনি বললেন—

অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন গ্রহ একোঽপরাজিতঃ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তযাত্মানং পুনর্জয়॥ (সভা) ৬৫।৩২

—হে রাজন, তোমার প্রিয়া কৃষ্ণা একমাত্র পণ অপরাজিত আছে, তাকে পণ রেখে পুনবায় নিজেকে জয় কর।

নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃষ্ণা নাতিবোহিণী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দিব্যাম্যহং ত্বয়া॥ (সভা) ৬৫।৩৩

—যিনি হ্রস্বা (খর্ব) নহেন, দীর্ঘাও নহেন, কৃষ্ণাও নহেন অতি গৌরবর্ণাও নহেন, এবং যাঁর কেশ নীল কুঞ্চিত, সেই দ্রৌপদীকে পণ বেখে পাশা খেলছি।

ঐ সময় যুধিষ্ঠিব সভামধ্যে পাঞ্চাল কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যেব ও

অপরিমেয় গুণাবলীর বর্ণনা করেন। তখন সমবেত রাজন্যবৃন্দের ধিক্কারে সভাগৃহ উত্তপ্ত হলো। ক্ষোভে ক্রোধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরে স্বেদ সঞ্জাত হলো। বিদুর দু হাতে মাথা ধরে অচেতন অবস্থায় বসে রইলেন। অশ্বত্থমা, ভূরিশ্রবা, ধৃতরাষ্ট্র তনয় যুযুৎসু অধোমুখে দুহাত পিষ্ট করতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞেস করেন—

ধৃতরাষ্ট্রস্তু তং হৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত।

(সভা) ৬৫।৪৩

—ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত হয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞেস করতে থাকেন, কি জয় করা হলো? কি জয় করা হলো? নিজের মনোভাব গোপন রাখতে পারলেন না।

দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি খুব আনন্দিত হলেও অন্য সকলে কাঁদতে থাকেন। মদোন্মত্ত শকুনি এ ধনও জয় করলেন বলে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন।

খেলার নেশায় তিনি এক এক করে সর্বস্ব হারালেন। অবশেষে নিজের ভ্রাতাদের এমনকি স্ত্রী দ্রৌপদীকেও পণে হারিয়ে দুর্যোধনের অধীনতা স্বীকার করলেন।

নল রাজাও কলির চক্রান্তে পাশা খেলায় সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী দময়ন্তীকে পুনঃ পুনঃ পণ রাখতে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি তা করেননি। এখানেই নলরাজা ও রাজা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

যুধিষ্ঠিরের এই ধরণের খেলার নেশাকে নিম্ন শ্রেণীর জুয়ারীদের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে। বোধ করি খেলার নেশায় তাঁর বিবেক বুদ্ধিও লোপ পেয়েছিল। তাই অনুগত ভ্রাতাদেরও খেলায় পণ রাখলেন। বিশেষ করে পঞ্চ ভ্রাতার স্ত্রী দ্রৌপদীকে পণ রাখা যুক্তি সঙ্গত কিনা এ বিচার বুদ্ধিও তাঁর লোপ পেয়েছিল।

ভ্রাতারা যদি তাঁর অনুগত না হতেন এবং তিনি যে তাঁদের পণ রেখেছিলেন তা যদি তাঁরা অনুমোদন না করতেন—তবে যুধিষ্ঠিরের সত্য রক্ষা বিপর্যয়ের মুখে পড়ত।

পঞ্চভ্রাতার স্ত্রী দ্রৌপদীর উপর তাঁর কতটুকু দাবী? অথচ তিনি তাঁকেও পণ রাখতে দ্বিধা করেননি। রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজরাণী দ্রৌপদীকে সাধারণ জুয়াড়ীর মত পাশা খেলায় পণ রাখা কেবলমাত্র অশোভনীয় নয়, অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। ধর্মের পুত্র হয়ে—এমন অধার্মিক কাজ তাঁর চরিত্রে এক দুরপনেয় কলঙ্ক।

রামের চরিত্র এদিক দিয়ে পূত, পবিত্র, কোন বিলাস ব্যসনে কখনো আকৃষ্ট ছিল না।

তখন দুর্যোধন বিদুরকে আদেশ করলেন দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে তাঁকে দিয়ে সভাগৃহ মার্জনা করাতে ও তাঁর অন্তঃপুরে দাসীগণের সঙ্গে অবস্থানের ব্যবস্থা করতে। বিদুর অতি পরুষ ও কর্কশ ভাষায় দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করেন। দুর্যোধন বিদুরকে পাল্টা ভর্ৎসনা করে প্রতিকামীকে দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনবার আদেশ দিলেন।

দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনবার জন্যে দুর্যোধন প্রতিকামীকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠালে, দ্রৌপদী উত্তর দিলেন :

যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায়॥ (সঃ)

প্রতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর উত্তর শুনে এবং দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভায় আনতে বদ্ধ পরিকর দেখে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন :—

দৈবের নির্বন্ধ কর্ম কি খণ্ডিতে পারে॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম রক্ষা করুক সে আসি এ সভায়॥ (সঃ)

যুধিষ্ঠির প্রতিকামীকে আরও বলেন, তুমি পাঞ্চালীকে বলো তিনি যেন একবস্ত্র রজস্বলা ও ক্রন্দনরতা হলেও সভায় শ্বশুরের সন্মুখে উপস্থিত হন।

রাজমহিষীকে খেলার পণ রাখা কি ধর্ম ? অন্তঃপুরের পুরনারীকে বারবণিতার মত রাজসভায় হাজির করা কি ধর্মরক্ষা ? দ্যূতাসক্তিকে দৈবের নির্বন্ধ বলে প্রশ্রয় দেওয়া কি আত্মবঞ্চনা নয়? স্ত্রী দ্রৌপদী ও ভ্রাতা ভীম তাঁর এই দ্যূতাসক্তিকে বিধির বিধান বলে মেনে নিতে পারেননি। এজন্য যুধিষ্ঠিরেব বিরুদ্ধে অনেকবার তাঁদের অনুযোগ শোনা গেছে।

দূত্যক্রীড়া ও দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখার জন্য সমালোচকদের কাছে যুধিষ্ঠির চরিত্র এক কঠিন ধাঁধা। নিজে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখতে পারেন কিনা, তিনি বিজিতা না অবিজিতা এ প্রশ্ন নিয়ে দ্রৌপদী দ্যূত সভায় হাজির হয়েছিলেন। স্বয়ং ভীষ্ম এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দিলেন না। তাঁর মতে যুধিষ্ঠির পৃথিবীর সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্মকে নয়। দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে গিয়ে সে পণ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, কারণ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় শঠতার কোন অভিযোগ করেননি। নিজে হেরে গিয়ে স্ত্রীকে পণ রাখার অধিকার থাকে না যেমন সত্য, অন্য পক্ষে সেই যুগে স্ত্রী সর্বদা স্বামীর বশীভূত এ কথাও সত্য। ভীম বলেছিলেন যে দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির তাঁর অধিকার অতিক্রম করেছেন। অর্জুনের মতে ক্ষাত্র ধর্ম মতে পাশা খেলে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের মহাকীর্তি বৃদ্ধি করেছেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর দ্যূত সভায দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের উপাখ্যান বর্ণনা করে এবং নানা রকম যুক্তির অবতারণা করে সভাস্থ সভ্যগণকে সত্য ও ধর্মকে অবলম্বন করে এক নিবপেক্ষ মত দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সভাস্থ সকলেই নীরব ছিলেন। বিদুর যেন সভার কাছ থেকে ভীমের অনুরূপ মত আশা করেছিলেন।

এই এক জায়গায় রাম ও যুধিষ্ঠিরের চবিত্র একই পর্য্যায়ে পড়ে। রাজমহিষীদের প্রতি এরূপ অহেতুক নিষ্ঠুব আচরণের অভিযোগে উভয় মহাকাব্যের নায়ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

বিনা দোষে সীতাকে কত না দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। অনুরূপ দ্রৌপদীকেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন সমস্ত শালীনতা বর্জন করে দ্রৌপদীকে একবস্ত্রাবস্থায়, কেশাকর্ষণ করে দ্যূতসভায় জোর করে হাজির করে নানা কর্কশ ভাষায় নির্য্যাতিত করতে থাকে। তা দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে যুধিষ্ঠির তাঁদের প্রভু। অতএব তিনি সকলের সব ধন সম্পদ দানে হারালেও ভীমের কোন ক্রোধ নেই। কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির তাঁর অধিকার অতিক্রম করেছেন। কৌরবদের হাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে ভীম বলেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর ক্রোধ হচ্ছে। ভীম সহদেবকে আগুন আনতে আদেশ করেন যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় পোড়াবার জন্যে। অর্জুন প্রখর যুক্তি দিয়ে ভীমের ক্রোধকে শান্ত করেন। যদি অর্জুন শান্ত না করতেন তবে তাঁর আকৃতি কিরূপ হত তা বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরও অন্যত্র ভীমকে ধৈর্য্য ধারণ কর, বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

অতঃপর কর্ণ ও দুঃশাসন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করতে থাকলে দ্রৌপদী সেই দ্যূত সভায় পুনঃ জিজ্ঞেস করেন তিনি কি বিজিতা না অবিজিতা ?

ভীষ্ম বলেন—

যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন প্রমাণমিতি মে মতিঃ।

অজিতাং বা জিতাং বেতি স্বয়ং ব্যাহর্তুমর্হতি॥ (সভা) ৬৯।২১

—যুধিষ্ঠিরই এ প্রশ্নের উত্তরের প্রমাণ বলে আমি মনে করি। তুমি জিতা কি অজিতা তিনি স্বয়ং মত ব্যক্ত করুন।

যুধিষ্ঠির নীরব। শত্রুদের ক্রূর হাসি বা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ভীমের রোমকূপ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতের কারণ হলেও যুধিষ্ঠির নির্বিকার। দ্রৌপদীর আকুলি ব্যাকুলি, জননীর অশ্রুজল বা ভ্রাতাদের উত্তেজনা কিছুই যুধিষ্ঠিরকে যেন স্পর্শ করছে না। মনে

হয় তিনি যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। এক গভীর ক্রোধ তাঁর চোখে দীপ্যমান ছিল। নিয়তির দোহাই বা অন্য যে কোন প্রকার উক্তি যুধিষ্ঠিরের এ আচরণকে কলঙ্কমুক্ত করতে পারে না।

অতঃপর কর্ণের ভাষায় দ্রৌপদী যেন নৌকা হয়ে পাণ্ডবগণকে পারে পৌঁছিয়ে দিলেন। কারণ নানা অশুভ লক্ষণ দেখে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে বিহ্বল হয়ে দ্রৌপদীকে বর দিতে চাইলেন। সেই বরে দ্রৌপদী পাণ্ডুতনয়দের ধনু ও রথের সঙ্গে দাসত্ব হতে মুক্ত করেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র সান্ত্বনা বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করে ধন রত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যেতে আদেশ করেন। যুধিষ্ঠিরও স্ত্রী ও ভ্রাতাদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন।

যখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যেতে আদেশ করলেন এবং তাঁরাও ফিরে গেলেন, তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন অত্যন্ত নিরাশ হলেন, দুঃশাসন বললেন অতি কষ্টে তাঁরা পাণ্ডবদের ধনসম্পদ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা সব কিছু আবার তাদের প্রত্যর্পণ করলেন। কি করে সেই ধনসম্পদ আবার পাওয়া যায় তার উপায স্থিব করতে দুঃশাসন সহচরদের অনুরোধ করেন।

দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রেব নিকট গিয়ে অর্জুনের শক্তি মত্তার কথা বিশদভাবে বর্ণনা কবতে আরম্ভ করেন। এবং অর্জুনের দুঃসাহসিক কর্মসমুহেব এক তালিকা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তুলে ধরে বলেন যে ফাল্গুনির শৌর্য বীর্য্যের কথা চিন্তা করে দুর্য্যোধন ভয়ে উদ্বিগ্ন। অর্জুনকে তিনি এত ভয় করেন যে অকারাদি নাম শুনলেই ভয়ে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। এবং তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

দুর্যোধনের এরূপ ভীতিব কথা শ্রবণ করে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে কলহ হতে পারে এমন কিছু করা উচিত নয়। প্রীতির সঙ্গে পাণ্ডবদের সঙ্গে বসবাস করতে উপদেশ দিলেন। তা হলে ত্রিলোকে তাঁর কোন ভয় থাকবে না।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ দুর্যোধনের মনঃপুত হলো না। তিনি কৌশলে জিষ্ণুকে বধ করবার আব্দার ধরলেন। এবং ইন্দ্রর প্রতি বৃহস্পতির উক্তি সমর্থন করে বলেন যে সকল প্রকার উপায় দ্বারা শত্রুকে নিধন করাই সার বাক্য।

তখন দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা দ্বারা জয় করে দ্বাদশ বৎসরের জন্য চীর জিন পরে বনবাসে পাঠিয়ে তাঁদের বশে আনবার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি চাইলে ধৃতরাষ্ট্র বলেন—

তূর্ণং প্রত্যানয়স্বৈতান কামং ব্যধ্বগতানপি।
আগচ্ছন্তু পুনর্দ্যূতমিদং কুর্বন্তু পাণ্ডবাঃ॥ (সভা) ৭৪।২৪

—পুত্র পাণ্ডবরা যতদূর পথই অতিক্রম করুক না কেন শীঘ্রই তাঁদের ফিরিয়ে আন। পুনরায় পাণ্ডবগণ পণে দ্যূতক্রীড়া করুক।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারী প্রভৃতির নিষেধ অগ্রাহ্য করে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণ করলেন।

জানংশ্চ শকুনের্মায়াং পার্থো দ্যূতমিয়াৎ পুনঃ। (সঃ) ৭৬।৬

—শকুনির মায়া বা শঠতা জেনেও যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় আসলেন।

এবার শকুনি পাশা খেলায় পণ রাখলেন ঃ—

যে হারিবে দ্বাদশ বছর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বছর এক গুপ্ত বেশে রবে॥
অজ্ঞাত বছর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বছর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এই ত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল। (সঃ)

উপস্থিত সুহৃদবৃন্দের হৃদয়কে মথিত করে যুধিষ্ঠির পুনরায় শকুনির এই ষড়যন্ত্রের জালে পা দিলেন। যুধিষ্ঠির সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন—

যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হৈব কেন আমা হেন জন॥
একেত্ত আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্মিক না ছাড়ে ধর্ম যদি হয় ক্লেশ॥ (সঃ)

যুধিষ্ঠির আরও বলেন, শকুনি, আমাদের ন্যায় স্বধর্ম পালনে ব্রতী রাজা আহুত হলে দ্যূত হতে নিবৃত্ত হয় না। আমি তোমার সঙ্গে পাশা খেলবো।

ধৃতরাষ্ট্র গুরুজন। কিন্তু দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান কখনো ধর্ম কাজের পর্যায়ে পড়ে না। এই কারণে দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ায় যোগদান করা ধর্ম কাজ নয়। যখন তার সুনিশ্চিত ফল রাজা যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাত ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন বলেছেন—

অসম্ভবে হেমময়স্য জন্তো—
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাসন্নপরাভবাণাং
ধিয়ো বিপর্য্যস্ততরা ভবন্তি॥ (সঃ) ৭৬।৫

—স্বর্ণময় কোন জন্তু হয় না জানা সত্ত্বেও রাম সুবর্ণ মৃগ দেখে লুব্ধ হয়েছিলেন। বিপদ আসন্ন হলে মানুষের বুদ্ধি প্রায়শঃ বিপর্য্যস্ত হয়।

রামের ন্যায় যুধিষ্ঠিরেরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুধিষ্ঠিরের অদৃষ্টে ঘটলো। দ্যূত ক্রীড়ায় আমন্ত্রিত হলে তা রক্ষা না করা ক্ষাত্রধর্ম গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে—এটা যুধিষ্ঠিরের যুক্তি। কিন্তু সত্যই যদি তাই হবে তবে ধর্মজ্ঞ বিদুর যাঁকে পাণ্ডবরা গুরু বলে মানতেন, যাঁর আদেশ উপদেশ তাঁরা মাথা পেতে গ্রহণ করতেন, তিনি এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে অনুরূপ পরামর্শ কেন দিলেন? বনবাসকালে কৃষ্ণই বা কেন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, —তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তবে দ্যূতক্রীড়া হতে দিতেন না।

দুঃশাসনের নানা কটুবাক্যে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ বনগমনের জন্য অজিনের বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির নিকট বনগমনের বার্তা জ্ঞাপন করে, ফিরে এসে তাঁদের পুনঃ দর্শন করবেন বলেন। বিদুরের ইচ্ছানুসারে মাতা কুন্তীকে বিদুরের কাছে রেখে গেলেন।

বনগমনকালে পাণ্ডুপুত্রেরা কে কি ভাবে যাচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞেস করলেন। বিদুর বলেন কুন্তিনন্দন যুধিষ্ঠির বস্ত্রে মুখ ঢেকে গমন করছিলেন। এর তাৎপর্য্য কি ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলেন। বিদুর ব্যাখ্যা করে বলেন, যুধিষ্ঠির সাধারণতঃ স্নেহ-পরায়ণ। কিন্তু কপট পাশায় রাজ্য হরণ এবং আপনার পুত্রদের কর্কশবাক্যে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ উন্মীলিত করেননি। তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ নয়নে প্রজাগণকে দর্শন করে দগ্ধ করবেন না, এ জন্যই তিনি চোখ দুটো না খুলে বস্ত্রে মুখ ঢেকে চলছিলেন।

যখন পাণ্ডুতনয় হস্তিনাপুরের বৃহৎ দ্বার পার হয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে উত্তরদিকে চলতে থাকেন, তখন পুরবাসিগণ যে রাজ্যে পাপিষ্ঠ দুর্যোধন রাজত্ব করবেন সে রাজ্য ত্যাগ করে পাণ্ডবদের মত গুণবান পুরুষদের মধ্যে বাস করবার বাসনায় পাণ্ডবদের অনুগমন করেন। পুরবাসিগণের মুখে নিজেদের নানারূপ প্রশস্তি শুনে ও পুরবাসিরা তাঁদের অনুগামী হতে ইচ্ছুক দেখে যুধিষ্ঠিরও তাঁদের নিবৃত্ত করবার জন্যে বললেন, পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতৃব্য বিদুর, জননী কুন্তী এবং অন্যান্য সুহৃদগণ হস্তিনাপুরে আছেন। তাঁরা সকলেই শোকে ও সন্তাপে বিহ্বল। অতএব তাঁদের সেবা যত্ন করা পুরবাসি-গণের কর্ত্তব্য। পুরবাসিগণ তাঁদের এই কর্ত্তব্য সাধন করলেই, যুধিষ্ঠিরের পরম সন্তোষ সম্পাদন করা হবে।

আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিও।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিও॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।

... ...

এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন ॥ (সভা)

রাম ও যুধিষ্ঠির উভয়েই সমান জনপ্রিয়। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম যখন বিমাতা কৈকেয়ীর আদেশে বনগমন করছিলেন, তখন তাঁর প্রজাবৃন্দ তাঁর অনুগমন করেছিলেন। তিনিও সকলকে ভরতের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেছিলেন। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁদের বিরত করতে পারেননি।

যুধিষ্ঠিরের এরূপ অনুরোধে পুরবাসিগণ নগরে ফিরে গেলেন এবং পাণ্ডবগণ রথে করে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন এবং গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করে রাত্রি কাটালেন। কোন কোন দ্বিজ পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তাঁদের অনুগমন করে সেখানে থেকে গেলেন। সাগ্নিক ও নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ সশিষ্য উপস্থিত থেকে বেদ-উচ্চারণ করে অগ্নিহোত্র কাজ সম্পন্ন করে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন প্রভাতে পাণ্ডবগণ যখন বনে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন ভিক্ষোপজীবি বিপ্রগণ তাঁদের আগে এসে দাঁড়ালেন। তখন যুধিষ্ঠিব তাঁদেব বললেন যে তাঁদের রাজ্য ধন সব কিছু শত্রু হরণ করেছে। ফলমুল মাত্র আহার করে তাঁদের বনে চলতে হচ্ছে। এ বন বহু হিংস্র জন্তু ও সর্পাদিতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণগণ বনে তাঁদের অনুগমন করলে খুবই কষ্ট ভোগ করবেন, যা যুধিষ্ঠিরকে ব্যথা দেবে। অতএব তিনি তাঁদেব অভীষ্ট স্থানে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিবকে তাঁদের ত্যাগ না করতে অনুরোধ কবেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, দেবতারাও ভক্তের প্রতি সদয় হয়। উত্তবে যুধিষ্ঠির বলেন, তাঁরও দ্বিজের প্রতি পরম ভক্তি আছে। কিন্তু তিনি সহায় সম্পদহীন, ভ্রাতারা যাঁরা তাঁর সঙ্গে বনে ফলমূল আহরণ করছেন, তাঁরাও শোকে দুঃখে অভিভূত, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর অপমান ও রাজ্য

অপহরণ দুঃখে তাঁরা অত্যন্ত পীড়িত। অধিক ফলমূল আহরণ করবার জন্যে তাঁদের ক্লেশ দিতে তিনি ইচ্ছুক নন।

ব্রাহ্মণগণ বলেন তাঁদের ভরণ পোষণের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কোনরূপ উদ্বিগ্ন হতে হবে না, তাঁরা নিজেই নিজেদের অন্নাদি সংগ্রহ করবেন। কেবল ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপে তাঁদের মঙ্গল বিধান এবং ভগবৎ কথার দ্বারা তাঁদের আনন্দ বিধান করেই দ্বিজগণ আনন্দ পাবেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে বললেন যে তাঁদের সঙ্গ আনন্দেব, তবে তাঁদের এভাবে অবস্থান তাঁর দুঃখের কারণ হবে। এজন্য শোক সন্তপ্ত হয়ে তিনি বসে পড়লেন। তখন দ্বিজগণের মধ্যে নিপুণ দ্বিজ শৌনক যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে সহস্র সহস্র শোকের ও শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়ে থাকে, জ্ঞানী তাতে অভিভূত হন না। দ্বিজগণের ভরণপোষণের জন্য তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করার উদ্যোগ করুন। কারণ সিদ্ধলোক তপস্যার দ্বারা নিজের বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে। যোগ ও সাংখ্যদর্শনে বিশেষজ্ঞ দ্বিজ শৌনক বলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব অমঙ্গল বিনাশকারী যে অষ্টাঙ্গ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি) যোগসাধনের অনুকূল শ্রুতি ও স্মৃতি যুক্ত উত্তম বুদ্ধির অধিকারী। যুধিষ্ঠির অতি সজ্জন। অতএব অভাব ও স্বজনের বিপদ উপস্থিত হলেও তাঁর কখনো শারিরীক ও মানসিক দুঃখ হতে পারে না। রাজর্ষি জনকের মতে রোগ, শ্রম, অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি, প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এ চার শারিরীক দুঃখের কারণ, মানসিক দুঃখের প্রতিকার ও মানসিক দুঃখের চিন্তা বর্জন এ উভয় দুঃখ দূব করার উপায়। মনের দুঃখের মুল স্নেহ। স্নেহ জীব মাত্রেবই আসক্তির কারণ। আসক্ত জিনিষের বিযোগ সম্ভাবনায় দুঃখ উৎপন্ন হয়। জ্ঞানী, যোগী, শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারশীল কৃতার্থ ব্যক্তিকে কখনো আসক্তির আকর্ষণ স্পর্শ করে না। পরিশেষে তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধর্মলাভ ও সংসার হতে মুক্তি লাভে যদি তাঁর ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব বস্তুতে স্পৃহা

ত্যাগ করতে উপদেশ দেন।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন যে তাঁব অর্থের আকাঙ্ক্ষা নিজের জন্যে নয়, ব্রাহ্মণগণের ভরণ পোষণের জন্যে। অনুগামীদের পালন ও পোষণ তাঁর মত গৃহধর্মাবলম্বী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তৃণাসন, বসবার স্থান, হাত পা ধোবার জল, মিষ্টবাক্য এ চার বস্তুর সজ্জনের গৃহে কখনো অভাব হয় না। আর্ত্তকে শয্যা, চলন অক্ষমকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান সকলেরই কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির দ্বিজপ্রবরকে আরো অনেক প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে তিনি বলেন, কর্ম অনুষ্ঠান কর এবং কর্ম ত্যাগ কর—এটাই বেদের বচন।

শৌনকের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের নিকট গেলেন এবং বেদপবাগ ব্রাহ্মণগণ বনে তাঁর অনুগমন করছেন, বহু দুঃখে পীড়িত হওয়ায় তিনি তাঁদের পোষণ করতে অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় তাঁব কি কর্ত্তব্য তিনি পুবোহিতকে তা জিজ্ঞেস করলেন। অনেক চিন্তার পর পুবোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যেব উপাসনা করতে উপদেশ দিলেন। কারণ অন্ন সূর্য্যেবই স্বরূপ। তিনি সকল প্রাণীর পিতা। অতএব তাঁর শবণাগত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, যুধিষ্ঠির কর্মের দ্বাবা পবিত্র, ধর্মানুসারে তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পোষণ করতে সক্ষম।

মুনি ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যের তপস্যার পদ্ধতি বলে দিলে যুধিষ্ঠিব ব্রাহ্মণগণকে অন্ন দান কববার জন্যে সংযত ও বিশুদ্ধ চিত্তে তপস্যা আরম্ভ করেন। যুধিষ্ঠির এইরূপে সূর্য্যের স্তব ও তপস্যা কবলে দিবাকর যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন এবং বললেন যে তাঁর অভিলষিত বস্তু সবই তিনি পাবেন। বনবাসের বার বছর কাল সূর্য্যই তাঁকে অন্ন দেবেন। যুধিষ্ঠিরকে এক তামাব হাঁড়ি দিয়ে সূর্য্য বললেন—

গৃহ্লীষ পিঠরং তাম্রং ময়া দত্তং নবাধিপ।
যাবদ্ বর্ৎস্যতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত॥

ফলমূলামিষং শাকং সংস্কৃতং যন্মহানসে।
চতুর্বিধং তদন্নাদ্যমক্ষয্যং তে ভবিষ্যতি ॥ (বন) ৩।৭২-৭৩

—হে রাজন, আমার প্রদত্ত এই তামার হাঁড়িটি গ্রহণ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত পাঞ্চালী সুব্রত অর্থাৎ স্বীয় ধর্মানুযায়ী এ পাত্র নিযে রন্ধনগৃহে অবস্থান করবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রৌপদী নিজে ভোজন না করে অন্ন পরিবেশন করবে, ততক্ষণ এ পাত্রে ফল, মূল, শাক এবং মহানসে রন্ধন করা মৎস্যমাংসাদি আমিষরূপ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হযে থাকবে।

সূর্য্যদেব আরও বলেন যে চতুর্দ্দশ বৎসরে যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য পাবেন। এ পাত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যেব পদ বন্দনা করেন ও ভ্রাতাদের আলিঙ্গন করেন।

অতঃপর ঐ পাত্র নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর নিকট গেলেন এবং উনোনে ঐ পাত্র বসিয়ে পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অন্ন প্রস্তুত করালেন। ঐ পাত্রে প্রস্তুত অন্ন অল্প হলেও বৃদ্ধি পেয়ে অক্ষয় হোত।

শাস্ত্রের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠির প্রথমে দ্বিজগণকে সেই অন্ন পরিবেশন করতেন। তারপর ভ্রাতাদের খাওয়াতেন, অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজে ভোজন করতেন। সর্বশেষে দ্রৌপদী আহার করলে সেই অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হতো অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যেতো।

সূর্য্যদেবের বরে যুধিষ্ঠির অভীষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দিতে থাকেন এবং বিশেষ তিথিতে যজ্ঞীয় অন্ন প্রস্তুত করিযে বিধি মতে অগ্নিতে আহুতি দিতেন।

যুধিষ্ঠির অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। মুনি-গণেব দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে ও পরিতৃপ্ত হযে তিনি সেখানে বাস করতে থাকেন।

একদিন দ্রৌপদী, ভ্রাতৃবৃন্দ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির দেখলেন বিদুর ব্যস্ত ভাবে আসছেন। তা দেখে তিনি ভীমকে বললেন, মহাত্মা বিদুর নিশ্চয় কোন প্রয়োজনীয় কথা বলতে

আসছেন, হয়ত পাপিষ্ঠ শকুনি পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় আমাদের আহ্বান করে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জয় করবার অভিলাষ করেছে। তিনি আরও বলেন, তাঁকে ডাকলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। যদি পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় গাণ্ডীবকে হারাতে হয়, তবে পুনরায় রাজ্য লাভে সন্দেহ আছে।

পাণ্ডবগণ সকলে বিদুরের অভ্যর্থনা করলেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হয়ে, পাণ্ডব ও কৌরব উভয়কুলের হিতকর কোন পথের কথা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে বিদুর বলেন যে তিনি উভয়পক্ষের হিতকর পরামর্শ দেন। কিন্তু তা ধৃতরাষ্ট্রের মনঃপূত না হওয়ায়, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবার উপদেশ দেন। ধৃতরাষ্ট্রের আর তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। এ জন্যে যুধিষ্ঠিরকে হিতের জন্য কিছু বলবার জন্যে তিনি কাম্যক বনে এসেছেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির বলেন যে প্রমাদশূন্য হয়ে তিনি তা পালন করবেন।

যখন বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের এরূপ আলাপ আলোচনা চলছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র সেখানে সঞ্জয়কে পাঠালেন। তিনি বলেন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে স্মরণ করেছেন এবং তিনি না গেলে ধৃতরাষ্ট্র প্রাণত্যাগ করবেন বলে স্থির সঙ্কল্প করেছেন।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতি বিদুরকে পুনরায় প্রত্যাগত দেখে দুর্যোধন সন্দেহ করেন যে বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাণ্ডবদের তাঁদের রাজ্য ফেরত দিতে পারেন। তখন শকুনি বলেন—

সত্যবাক্যস্থিতাঃ সর্বে পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।

পিতুস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥ (বন) ৭।৮

—পাণ্ডবরা সকলেই সত্যব্রত। তোমার পিতার বাক্যে তাঁরা বনবাসের প্রতিজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করবেন না।

কর্ণও বলেছেন :—

নাগমিষ্যন্তি তে ধীরা অকৃত্বা কালসংবিদম্ ॥ (বন) ৭।১৩

—সেই স্থিরবুদ্ধি পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞার সময় উত্তীর্ণ না করে ফিরে আসবে না।

কাম্যক বনে পাণ্ডবদের পরম হিতৈষী সুহৃদগণ ও আত্মীয়গণ যেমন কৃষ্ণ, বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ, পাঞ্চাল কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও কেকয় রাজকুমারগণ পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তিনি দ্যুত ক্রীড়ার সময় হস্তিনাপুরে উপস্থিত থাকলে, ঐ দ্যূতক্রীড়া হতে দিতেন না। নানা প্রকার কুফল দেখিয়ে তিনি দ্যুতক্রীডার নিন্দা করে বলেন, পাশা খেলায় এমন নেশা আছে যা মানুষের সর্ব্বনাশ করে। রমনীর প্রতি আসক্তি, পাশা খেলা, মৃগযার নেশা ও মদ্যপান, এ চার নেশাই দুঃখের কারণ। পাশা খেলাই সকলের অপেক্ষা বৃহত্তম নেশা শাস্ত্রজ্ঞেরা বলে থাকেন। পাশা খেলার সময় কৃষ্ণ কেন উপস্থিত থাকতে পারেননি কারণ বলতে গিযে তাঁর সঙ্গে শাল্বেব যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। কৃষ্ণ সকলেব থেকে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নকুলের স্ত্রী করেণুমতীকে নিয়ে এবং কেকয়রাজপুত্রগণ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে সকলে বিদায় নিলেন। কিন্তু রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ যুধিষ্ঠির পুনঃ পুনঃ যাবার অনুমতি দিলেও পাণ্ডবদের ছেড়ে গেলেন না।

বনবাস কালে ভবত ও তাঁদের তিন জননী ও পুরোহিত বশিষ্ঠ চিত্রকূট পর্বতে বামের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনা। আব কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সুহৃদ ও আত্মীয়গণ মিলিত হয়েছিলেন পাণ্ডবদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ও তাঁদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিতে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেন যে তিনি সাম্রাজ্ঞী হবেন তাঁব এ বাক্য কখনো মিথ্যে হবে

না। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেন তিনি দ্রোণকে বধ করবেন, শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীম দুর্যোধনকে ও অর্জুন কর্ণকে বধ করবেন।

এই দুই নায়কের বনগমন ব্যাপারেও এক বৃহৎ বৈষম্য লক্ষণীয়। রাম চীর ও জিন সম্বল করে কেবল অনুজ লক্ষ্মণ ও সহধর্মিণী সীতাকে নিয়ে বনে গমন করেছিলেন। যুধিষ্ঠিবের বনগমনের সঙ্গী ছিলেন চার ভ্রাতা, দ্রৌপদী, পুরোহিত ধৌম্য, সশস্ত্র ভৃত্য, অস্ত্র শস্ত্র, রথ ও রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ। এরূপ সহচর ও অনুচর নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বছর বন হতে বনান্তরে কাল যাপন করেন। বনবাসকালে রামের মনে কোনো দুঃখ, ক্ষোভ বা অনুশোচনা ছিল না। কেবল রাম যখন কোন বিপদে পড়েছেন, তখন কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলে দুঃখ করেছেন। অপর পক্ষে যুধিষ্ঠির দুঃখ ও অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। রাজ্যহারা হবার জন্যে তাঁর দুঃখ তত নয়, ভ্রাতাদের ও স্ত্রীর দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাঁর অবিচ্ছিন্ন সন্তাপেব কারণ হয়েছিল।

সুহৃদ ও আত্মীয়গণ বিদায় নিলে পর যুধিষ্ঠির ভাইদের বলেন যে বাব বৎসব তাঁদের নির্জন বনে বাস করতে হবে। বহু ফুল ও ফল যেখানে আছে, যা পুণ্যবানদের বাসস্থান এরূপ সুন্দর ও কল্যাণকর একটি স্থান তাঁদের বাসের জন্য স্থির করতে। উত্তরে অর্জুন দ্বৈতবন নামক সরোবরের নাম উল্লেখ করেন। যুধিষ্ঠির সম্মত হয়ে সব রকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন।

দ্বৈতবনে অবস্থান কালে ঋষি মার্কেণ্ডয় পাণ্ডবদের আশ্রমে আসেন। যুধিষ্ঠিব ঋষিকে যথাযোগ্য পূজা করলে ঋষি ঈষৎ হেসে অন্যান্য তপস্বীগণেব মধ্যে আসন নিলেন। ঋষির স্মিত হাস্য দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর হাসিব কাবণ কি জানতে চান। কারণ অন্যান্য তপস্বীগণ পাণ্ডবদেব বনবাস দুঃখে কুণ্ঠাবোধ করছেন। কিন্তু ঋষি মার্কেণ্ডয়েব মুখে হাসি।

উত্তরে ঋষি বলেন যে যুধিষ্ঠিরকে দেখে তাঁর রামচন্দ্রের কথা

মনে পড়লো। রাম অত্যন্ত প্রভাবশালী ও অজেয় হলেও রাজ্য ত্যাগ করে বনে বাস করছিলেন। বল থাকলেও বলের অহঙ্কার অধর্মাচরণও অনুচিত। এই নীতি বাক্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন। নিজ তেজ বলে যুধিষ্ঠির কৌরবদের থেকে পুনরায় হৃত রাজলক্ষ্মী ফিরে পাবেন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে তিনি প্রস্থান করেন।

এক সন্ধ্যায় দুঃখ ও শোকে কাতর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সঙ্গে একত্রে বসে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ উদ্রেক করবার উদ্দেশ্যে প্রথমে দুর্যোধনের নিষ্ঠুবতার, হৃদয়হীনতার উল্লেখ করেন এবং আরও বলেন যে যখন যুধিষ্ঠিব অজিন পরে বনের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের চোখে জল দেখা যায়নি। অন্যান্য সব কুরুবংশীয়গণ চোখের জল ফেলেছিলেন। তারপর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের পূর্বকার জীবনের সঙ্গে বনবাসের জীবনের তুলনা করে বলেন যুধিষ্ঠিরের কুশের আসন, কুশশয্যা, চন্দন লিপ্ত শরীরকে পঙ্কমল লিপ্ত দেখে, রেশমী কাপড়ের স্থলে চীর দেখে তিনি আজ মুহ্যমান। তিনি আরও বলেন যে যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদে সহস্র সহস্র স্বর্ণময় পাত্র অন্নে পূর্ণ থাকত এবং যদৃচ্ছা ভোগ্য বস্তু দ্বারা ব্রাহ্মণদের সেবা করা হোতো। তাঁর ভ্রাতারা (পাণ্ডবরা) কুণ্ডল শোভিত হয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতেন। তাঁদের আজ ফলমূলে জীবন ধারণ করতে দেখে তিনি (দ্রৌপদী) কি করে শান্তি পেতে পারেন? ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠিরের কি ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে না? তারপর নিজের বনবাস দুঃখের বিষয় জানিযে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেন দ্রৌপদীর এই দুরবস্থা দেখেও কি যুধিষ্ঠিরের হৃদয় ব্যথায় কাতর হচ্ছে না? পরিশেষে দ্রৌপদী বলেন যে এ জগতে ক্রোধ শূন্য কোন ক্ষত্রিয় নেই। যুধিষ্ঠিরই একমাত্র তার ব্যতিক্রম।

অতঃপর দ্রৌপদী প্রহ্লাদ ও বলির উপাখ্যান দ্বারা ক্ষমার পাত্র ও অপাত্র ও তেজ প্রকাশের স্থান সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলেন। উপসংহারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের প্রতি তেজ প্রকাশ করবার কাল, এখন ক্ষমা করবার কাল নয় বলে তিনি মনে করেন। সব সময়ে মৃদু স্বভাব হলে লোকে অবজ্ঞা করে, আবার সর্বদা কঠোর হলে সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হয়। অতএব কাল ও পাত্র অনুযায়ী রাজা ক্ষমা ও তেজ প্রযোগ করবে।

দ্রৌপদীর এ সব আক্ষেপের উত্তরে যুধিষ্ঠির ক্রোধের নিন্দা করে ও ক্ষমার প্রশংসা করে দ্রৌপদীকে বলেন ক্রোধই মানুষের উন্নতি ও অবনতির কারণ। ক্রোধকে সংযত করতে পারলে তা উন্নতির কারণ হয়। অন্যদিকে দারুণ ক্রোধ মানুষের বিনাশের কারণ। যুধিষ্ঠির তখন ক্রোধের নানা দোষের বর্ণনা করেন এবং বলেন যে তেজস্বী ব্যক্তি সর্বদা ক্রোধ হতে দূরে থাকেন। যে ব্যক্তি বলবান কর্তৃক ভর্ৎসিত ও প্রহৃত হযেও ক্রোধকে সংযত করে ক্ষমা করতে পারে, সে নিত্যই জিত ক্রোধ, বিদ্বান এবং উত্তম পুরুষ। তারপর এক পুরাতন কাহিনী দিযে ক্ষমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

যে ব্যক্তি ক্ষমাকেই ধর্ম, যজ্ঞ, বেদ এবং সর্ব শাস্ত্রের সার জ্ঞান বলে জানেন, তিনিই সকলকে ক্ষমা করতে পারেন। ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই শৌচ-স্বরূপ এবং ক্ষমাই এ ধরিত্রীকে ধারণ করে আছে। ক্ষমাই তেজস্বীর তেজ, ক্ষমাই তপস্বীর ইপ্সিত ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্যনিষ্ঠের সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শম। যুধিষ্ঠির আরও বলেন ক্ষমার যখন এত গুণ তখন তাঁর মত ব্যক্তি কি করে ক্ষমা ত্যাগ করতে পারেন?

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলেন যে কাশ্যপ মুনি ক্ষমাশীলগণের এই গাথা গেযেছেন। ক্ষমার এই রূপ জেনে তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিযে বলেন যে সোমদত্ত, যুযুৎসু, অশ্বত্থামা, পিতামহ ও ব্যাস তাঁর এই শমগুণের কথা নিত্যই বলে থাকেন।

এঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন। নচেৎ লোভ বশতঃ ধ্বংস হবেন। দুর্যোধন ক্ষমা ধারণ করবার অযোগ্য তাই ক্ষমা লাভ করেনি। তিনি ক্ষমার মাহাত্ম্য জানেন। তাই ক্ষমা তাঁকেই আশ্রয় করেছে। জিতাত্মা পুরুষের দয়া ও ক্ষমা এ দুটি স্বভাব এবং এটাই সনাতন ধর্ম। অতএব তিনি এদের অবলম্বন কববেন।

ক্ষমা ও দয়া সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের পর্য্যালোচনা দ্রৌপদীকে শান্ত করতে পারলো না। যুধিষ্ঠিরের উপদেশে তাঁর দুঃখ অধিকতর বৃদ্ধি পেলো। তিনি বলেন যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, নতুবা পিতৃপিতামহের মত রাজ্যভার বহন না করে তিনি বনে বনে বিচরণ করছেন কেন? তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এক দুঃসহ সঙ্কট যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করেছে, নয়ত তিনি কি এরূপ দুঃখের যোগ্য? নাকি তাঁর ভ্রাতারা এরূপ দুঃখ ভোগের যোগ্য। দ্রৌপদী বলেন যে তাঁব নিশ্চিত ধারণা যুধিষ্ঠির প্রাণ হতে ধর্মকে প্রিয় জানেন। ধর্মের জন্য তিনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এমন কি দ্রৌপদীকেও ত্যাগ করতে পারেন। দ্রৌপদী আরও বলেন যে ধর্মের সংরক্ষক রাজা, ধর্মই আবার রাজাকে রক্ষা করে। কিন্তু বিস্ময়েব বিষয় ধর্ম কেবল যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করছেন না। যুধিষ্ঠিব আচারে, ব্যবহারে সকলের আদর্শ স্থানীয়, অনুকরণীয়। কুকর্ম করতে যারা সদা সর্বদা লজ্জা অনুভব করে এমন সচ্চরিত্র সভ্যলোককে অর্থকষ্ট ভোগ করতে এবং অধার্মিক অসত্য লোককে সুখী হতে দেখে দ্রৌপদী চিন্তায় বিহ্বল। কারণ এর দ্বারা ভগবানকেও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়।

দ্রৌপদীব উপরোক্ত সমালোচনা হতে যুধিষ্ঠিরেব চরিত্রের একটা সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

দ্রৌপদীর মুখে বিধাতার নিন্দা শুনে যুধিষ্ঠির বলেন, যাজ্ঞসেনি, তোমার কথা শ্রুতি মধুর, ও কোমল। কিন্তু তোমার কথা

নাস্তিক মতাশ্রিত। 'দান করা কর্তব্য' বলে তিনি দান করেন। 'যজ্ঞ করা উচিত' বলে তিনি যজ্ঞ করেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে তিনি কোন কাজ করেন না। প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় বিভূতিসম্পন্ন ঋষিগণ ধর্মই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠেয় বিষয় বলে, বলে থাকেন। মোহমুক্ত মনের দ্বারা ধর্ম ও বিধাতাকে নিন্দা করা তোমার উচিত নয়। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ধর্ম সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা পোষণ করতে নিষেধ করেন। কারণ ধর্মই একমাত্র স্বর্গ প্রাপ্তির ভেলা। সমস্ত প্রাণীর ভরণপোষণকারী ঈশ্বরের নিন্দা করতে বারণ করেন।

উত্তরে দ্রৌপদী বলেন ঈশ্বর বা ধর্মকে নিন্দা বা অবমাননা করবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐরূপ বলেননি। প্রজাপতি ঈশ্বরকে কি অবমাননা সম্ভব? তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেন, দুঃখে কাতর হয়ে তিনি প্রলাপ বকছিলেন মাত্র। তাঁর আরও কিছু প্রলাপ শুনবার জন্যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে কর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে কর্ম করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জঙ্গম প্রাণী বিশেষতঃ মানুষ কর্মের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। সমস্ত প্রাণীই নিজের কর্ম দিয়ে জীবন ধারণ করে। বিধাতাও সৃষ্টি ও পালন কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। সদা কর্মেই আবৃত থাক, ধনাদি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে কর্ম প্রয়োজন। কারণ কেবল ভোগ করতে থাকলে, আয় না করলে হিমালয় তুল্য ধনরাশিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন কর্ম না করলে জগতের কি অবস্থা হতো তার বর্ণনা করেন। পুরুষকার বিনা কিছু লাভ করা যায় না। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে দুর্বুদ্ধিতে মানুষ বিনষ্ট হয়। ঈশ্বর যদি প্রাণী মাত্রেরই কর্মানুসারে ইষ্ট অনিষ্ট ফল না দিতেন, তবে প্রাণীগণের মধ্যে কেহ ধনী কেহ দরিদ্র এরূপ ব্যবধান হতে পারতো না। সকলেই ধনী হতো, বা সকলেই দরিদ্র হতো।

মনুর এটাই সিদ্ধান্ত যে মানুষকে কর্ম করতে হবে। যে কর্ম করবে না, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে সে পরাজিত হবে। দ্রৌপদী

যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বলেন, শত্রুর যাতে বিপদ ঘটে তার চেষ্টা করবে। এমনকি সমুদ্র বা পর্বতও যদি শত্রু হয় তারও জলশূন্যতা বা পতনের চেষ্টা করবে। সুতরাং মরণশীল মানুষের কথা ধর্তব্য নয়। সর্বদা শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করবে। এরূপ ব্যবহার করলে রাজা প্রজাবৃন্দের নিকট কর্তব্যশীল বলে নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়। মানুষ কখনও নিজেকে নিজে অনাদর করে না। কারণ নিজেকে অনাদর করলে কখনো উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে না। এরূপ ভাবে কাজ করলে কাজে সিদ্ধি লাভ হয়।

দ্রৌপদীর ঐরূপ উক্তি শুনে ক্রোধে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষের যোগ্য ধর্মানুসারে প্রাপ্ত রাজপদবীকে আপনি আশ্রয় করুন। ধর্ম, কাম, অর্থশূন্য হয়ে এ তপোবনে বাস কি লাভেব হবে? গাণ্ডীবধারী অর্জুনের দ্বারা সুবক্ষিত রাজ্য যুধিষ্ঠিরেব অসাবধানতায তাঁদের চোখের সামনে শত্রু হরণ করেছে। ভীম যুধিষ্ঠিবকে সম্বোধন করে বলেন যে যুধিষ্ঠির ধার্মিক বলে খ্যাত বলেই তাঁর প্রিয অভিলাষ পূর্ণ করবাব জন্যই ভীমরা বনবাস রূপ মহাসঙ্কটে পড়েছেন। কৃষ্ণ, অর্জুন, অভিমন্যু ইত্যাদি বীবগণ নকুল, সহদেব এবং স্বযং ভীম—কেউই বনবাস পছন্দ করেন না।

অতঃপর ভীম শ্লেষের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, নিজের হৃত রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারে অসমর্থ দুর্বল মানুষ নিষ্ফল স্বার্থহানীকর বৈবাগ্য অবলম্বন করে তাকে শ্রেয়ঃ মনে করে। তিনি বনবাস অপেক্ষা সম্মুখ সমরে বীরের মৃত্যুকে শ্রেযঃ মনে করেন। তাঁবা শত্রুতাব প্রতিশোধ নিতে চান। এর দ্বারা তাঁদের বিপুল যশ লাভ হবে। অতএব তাঁদের যুদ্ধই কর্তব্য। আবেগের সঙ্গে ভীম বলেন, যে ধর্ম নিজের ও মিত্রবর্গের কেবল ক্লেশের কারণ, তা সঙ্কটই। এটা প্রকৃত ধর্ম নয়, বরং কুধর্ম। অতঃপর ভীম অর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন। ভীম বলেন, ধর্মই সমস্ত জগতের মুল, ধর্মেব

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নেই। সে ধর্ম আবার প্রচুর ধনের দ্বারাই অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। অভিপ্রেত সেই প্রচুর অর্থ কখনো ভিক্ষার দ্বারা ও ক্লীবের দ্বারা অথবা কেবল ধর্মবুদ্ধির দ্বারা লাভ সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ যাচ্ঞার দ্বারা অর্থ লাভ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষা নিষিদ্ধ, সুতরাং তেজ প্রকাশ করেই তা লাভ করতে সচেষ্ট হন। ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম হচ্ছে বল ও উৎসাহ। ভীম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে আরও বলেন, হে রাজন, মানুষের স্বধর্ম হতে চ্যুতি প্রশংসার যোগ্য নয়। মনের দুর্বলতাকে ত্যাগ করে শক্তি অবলম্বন করে ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন। ভীম আরও বলেন যে কখনও কোন রাজা কেবল ধর্মে ব্যাপৃত হয়ে রাজ্যলাভ করেনি, বা পৃথিবীকে জয় করতে পারেনি, বা ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পারেনি। ভীম যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে আরও বলেন যে তাঁর মত ধার্মিক রাজার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে লোকে নিশ্চয় ভাবছে যে সূর্য্য হয়ত তাঁর প্রভা এবং চন্দ্রও হয়ত তাঁর জ্যোৎস্না হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন।

অপেযাৎ কিল ভাঃ সূর্য্যাল্লক্ষ্মীশ্চন্দ্রমসস্তথা।
ইতি লোকো ব্যবসিতো দৃষ্ট্বেমাং ভবতো ব্যথাম্॥

(বন) ৩৩।৭৪

—হে ভারত, ব্রাহ্মণগণকে জয় লব্ধ অর্থ দান করবার জন্যে আপনি অস্ত্র শস্ত্রাদি সমস্ত উপকরণ নিয়ে রথে আরোহণ করে শীঘ্রই শত্রুর প্রতি ধাবিত হন।

দ্রৌপদীর খেদ ও ভীমের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠির শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভীম তাঁকে বাক্যরূপ শল্যের দ্বারা ব্যথিত করে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করছেন। যদিও ভীমের বাক্য অতি অপ্রিয়, তবু তিনি ভীমের নিন্দা করছেন না। কারণ তাঁর অন্যায়ের জন্যই তাঁদের উপর এ বিপদ এসেছে। কেন দুর্যোধনের সঙ্গে পাশা খেলতে রাজি হয়েছিলেন তার কারণ বল্তে গিয়ে যুধিষ্ঠির বলেন যে, দুর্যোধনের রাজ্য হরণ করতে পারবেন এই আশায় তিনি পাশা

খেলতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শঠ শকুনি কপটতার দ্বারা তাঁকে জয় করেছে। শকুনি কপটতা অবলম্বন করে খেলছে বুঝেও তিনি মনকে সংযত করতে না পেরে অনর্থ ঘটিয়েছেন। ক্রোধ মানুষের ধৈর্য্য নষ্ট করে। তাঁদের ভাগ্যে এরূপ ছিল, এই বলে তিনি ভীমকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। যুধিষ্ঠির আরও বলেন যে দ্বিতীয়বার যখন পাশা খেলায় তিনি আহুত হলেন, তখন ভীম ও অর্জুন জানতেন যে দুর্যোধন তাঁকে একবার মাত্র পাশা খেলার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁরা তাঁকে বাধা দেন নি। দ্বিতীযবারের পণও যুধিষ্ঠিব স্বীকার করেছিলেন, এবং তারই ফলে তাপসবেশ ধারণ করে বিভিন্ন দেশ ও বনে বিচরণ করছেন।

যুধিষ্ঠিব প্রশ্ন কবেন রাজসভায় সৎপুরুষদের সামনে যে প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার করেছিলেন রাজ্যের লোভে তা ভঙ্গ করা কি সম্ভব? তিনি ভীমকে স্মবণ করিযে দেন যে পাশা খেলার সময় তিনি গদাতে হাত দিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অর্জুন নিষেধ করেছিলেন। নতুবা কি ভযানক অনর্থই না ঘটতো।

যুধিষ্ঠিব পুনরায় ভীমকে স্মবণ করিযে দিয়ে বলেন, প্রতিজ্ঞার সময় তিনি কিছু বলেন নি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের সময এরূপ কর্কশ বাক্য কেন? দ্যূত সভায় দ্রৌপদীব লাঞ্ছনা দেখে অসহ্য অপমানে তিনি ছটফট করছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণকে তা ক্ষমা কবতে হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। অবশ্যম্ভাবী সুসময়েব জন্য ধৈর্য ধারণ করতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। কারণ তাঁদের সুসময় অবশ্যই আসবে। যুধিষ্ঠির দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে,

মম প্রতিজ্ঞাঞ্চ নিবোধ সত্যাং
বৃণে ধর্মমমৃতাজ্জীবিতাচ্চ।
রাজ্যঞ্চ পুত্রাশ্চ যশো ধনঞ্চ
সর্বং ন সত্যস্য কলামুপৈতি॥ (বন) ৩৪।২২

—জীবন ও অমরত্বের চেয়ে তিনি সত্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন সব কিছুই সত্যের ষোল কলার এক কলাও নয়।

বাল্মিকীর মানসপুত্র রামও সত্য ও ধর্মকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এই জন্যে তিনিও পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ জিনিষকে ত্যাগ করার দৃঢ় সঙ্কল্পের অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

যুধিষ্ঠিরের এরূপ উক্তিতে ভীম অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তিনি বলেন, একটু একটু করে যে মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়, সে কি কালের প্রতীক্ষা করতে পারে? তের বৎসর পর্যন্ত প্রতীক্ষিত কালকে যদি তাঁরা অপচয় করে প্রতীক্ষা করতে থাকেন, তবে ঐ কাল তাঁদের মৃত্যুর মুখে পৌঁছিয়ে দেবে। তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, এসব ধনুর্দ্ধর সিংহ, তাঁদের বীর প্রসবিনী জননী, তাঁরা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করতে গিয়ে জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করছেন। যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে ভীম বলেন যে তাঁর স্বভাবের নম্রতা ও দয়ালুতার জন্যই সকলে ক্লেশ ভোগ করছেন। কেউ এজন্য তাঁকে প্রশংসা করবে না। তাঁর প্রকৃতি দয়ালু ব্রাহ্মণের ন্যায়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মগ্রহণ করেছেন? এ কুলে ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরাই জন্মে। বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তিসম্পন্ন ও উচ্চকুল জাত হয়েও যুধিষ্ঠির কেন অজগরের ন্যায কর্ত্তব্য কর্মে নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন?

ভীম যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, সূর্য্য যেমন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না, তেমনি যুধিষ্ঠিরের মত পৃথিবী খ্যাত ব্যক্তির পক্ষে অজ্ঞাতবাস কি সম্ভব? এটা এক মুষ্টি তৃণের দ্বারা পর্বত ঢাকার চেষ্টার মত। তখন যুধিষ্ঠিরকে ভীম প্রশ্ন করেন গজরাজের ন্যায় অর্জুন কি করে অজ্ঞাত বাস করবে? সিংহের তুল্য পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেব কি করে আত্মগোপন করবে, বিশ্ববিশ্রুতা দ্রৌপদীই বা কি করে অজ্ঞাত বাস করবে? এবং মেরুপর্বতের ন্যায় ভীমের পক্ষেও অজ্ঞাতবাস অসম্ভব। অজ্ঞাতবাসে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা করে ভীম বলেন, তাঁরা যে সব রাজা ও রাজপুত্রকে নির্বাসিত

করেছেন তাঁরা হয়ত এদ্দিনে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাঁরা কখনো পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন না। পাণ্ডবদের অন্বেষণে বহু গুপ্তচর নিয়োজিত হবে। এ সব কারণে অত্যন্ত ভয়ের সম্ভাবনা আছে। যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করবার জন্যে ভীম বলেন, শত্রুবধের ব্যাপারে বুদ্ধিকে স্থির করুন। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নেই। (নান্যেয় ধর্মোঽস্তি সংযুগাৎ)।

ভীমের কথা শুনে নিবিষ্টচিত্তে কিছুকাল চিন্তা করে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, হে ভরত কুলতিলক বাক্যবিশারদ ভীম, এক পক্ষে তুমি যা বলেছ তা ঠিক। তবে অন্য পক্ষে তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তিনি বলেন—

সুমন্ত্রিতে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে।
সিধ্যন্ত্যর্থা মহাবাহো দৈবং চাত্র প্রদক্ষিণম্ ॥ (বন) ৩৬।৭

—সুমন্ত্রণা দ্বারা সুবিচার করে নিজ বিক্রম প্রকাশ করে যদি কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলে হে মহাবাহো, কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং দৈবও অনুকূল হয়।

যুধিষ্ঠির ঐ সময় কেন প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত সময় নয় তার নানা কারণ বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, পাণ্ডবদের দ্বারা লাঞ্ছিত রাজা, ভূমিপালগণ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং দুর্যোধনে হিতে সর্বদা ব্যাপৃত। তাঁরা পূর্ণ কোষ ও পূর্ণ বল নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবে। সমস্ত সৈন্য ও অমাত্যদের সম্পূর্ণ বেতন ও উপভোগের সামগ্রী দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা হয়েছে। যুধিষ্ঠির সর্ব অস্ত্রবিদ ও অভেদ্য কবচের দ্বারা আবৃত কর্ণের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেন। কর্ণের পরাক্রমের খ্যাতি যুধিষ্ঠিরের রাত্রির নিদ্রা হরণ করেছে। যুধিষ্ঠিরের এসব কথা শুনে ভীমের অন্তরে যেন বিজয় সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জাগলো। তিনি তাই অন্যমনা হয়ে নীরব রইলেন।

যুধিষ্ঠির ও ভীম যখন ঐরূপ কথাবার্ত্তা বলছিলেন বেদব্যাস যোগবলে তা জেনে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করলেন। বেদব্যাস বললেন যোগবলে যুধিষ্ঠিরের অন্তরের কথা জেনেই তিনি দ্রুত এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি হতে যুধিষ্ঠিরের মনে যে ভয় হয়েছে তা তিনি কর্মের দ্বারা বিনাশ করেছেন। তারপর বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে নিরালায় ডেকে নিয়ে বললেন সুসময় আসন্ন। অর্জুন শত্রুদের যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কাছ থেকে "প্রতিস্মৃতি" বিদ্যা গ্রহণ করতে বলেন। অর্জুন এ বিদ্যা লাভ করে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন। অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন মহেন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার কাছে গিয়ে তপস্যা ও বিক্রমের দ্বারা তাঁদের সাক্ষাৎ পেতে সমর্থ হবেন। অর্জুন নারায়ণ ঋষির নিত্য সহচর নরঋষি। এই অর্জুন সকলের অজেয় এবং স্বীয় মর্যাদা হতে কখনো বিচ্যুত হননি। অর্জুন, ইন্দ্র, রুদ্র ও সকল লোকপালের নিকট থেকে নানা অস্ত্র লাভ করে মহৎ কর্ম সাধন করবেন। বেদব্যাস অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে অন্য বনে যাবার জন্যে বলেন। এসব কথা বলে মহাযোগী ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে সেই উত্তম বিদ্যার উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠির সংযত চিত্তে নিয়মিত ভাবে বেদব্যাসের উপদিষ্ট সেই মন্ত্র মনে মনে ধারণ করে অভ্যাস করতে থাকেন। এবং ব্যাসদেবের উপদেশে দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনের দিকে এগোতে লাগলেন। অন্য সকলেই যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। কিছুদিন কাম্যকবনে কাটাবার পর যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেবের উপদেশ মনে পড়ল। তিনি অর্জুনকে নির্জনে নিয়ে বললেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে সমগ্র ধনুর্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং তাঁরা সকলেই দৈব, মানুষ, ব্রাহ্ম এ তিন প্রকার সকল অস্ত্রের বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত অস্ত্র রোধ করতেও সমর্থ। দুর্যোধন

তাঁদের প্রচুর ধনাদির দ্বারা এবং তাঁদের পৃথক পৃথক সেবার দ্বারা তাঁদের সর্বদা সন্তুষ্ট করছেন। সব নগর, গ্রাম, বন ও সসাগরা পৃথিবী দুর্যোধনের বশে এসেছে। এ সব তথ্য প্রকাশ করে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সম্বোধন করে বলেন যে অর্জুন তার প্রিয় এবং তাঁদের সকলের দায়িত্ব অর্জুনের উপর ন্যস্ত রয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে যে মন্ত্র দিয়েছেন ও যে কার্য্য করতে বলেছেন তা করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ঐ মন্ত্র যথা নিয়মে প্রয়োগ করলে সমস্ত জগৎই উদ্ভাসিত হয়। ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে উগ্র তপস্যার দ্বারা দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্যে চেষ্টা করতে তিনি অর্জুনকে বলেন। সব বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কবচ পরে খড়্গ ও অস্ত্র নিয়ে দেবমন্ত্র দ্বারা তপস্যার জন্যে উত্তরদিকে যেতে অর্জুনকে বলেন। ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দৈবাস্ত্র রয়েছে। ইন্দ্রের আরাধনা করলে ইন্দ্র দৈবাস্ত্র প্রদান করবেন। দীক্ষা গ্রহণ করে সেদিনই কৃষ্ণের দর্শনের জন্য গমন করতে তিনি অর্জুনকে আদেশ করলেন। এ সব বলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সেই মন্ত্র দিলেন এবং তপস্যার জন্য যেতে অনুমতি দিলেন।

অর্জুন অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্র লাভের জন্যে স্বর্গলোকে গমন করেন, অন্যান্য পাণ্ডবরা দ্রৌপদী সহ কাম্যক বনে বাস করতে থাকেন। ঐ সময়ে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী সহ অর্জুনের জন্য শোকে অতি কাতর হয়ে অশ্রুপাত করছিলেন। এমন সময় ভীম পুনঃ যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে তাঁর আদেশে অর্জুন অস্ত্র লাভের জন্য তপস্যা করতে গেছে, তার উপরেই সব পাণ্ডবদের জীবন নির্ভর করছে। কারণ অর্জুনের বিনাশ ঘটলে পুত্রের সঙ্গে পাণ্ডবরা, পাঞ্চালগণ, সাত্যকি ও কৃষ্ণ বিনষ্ট হবে। অর্জুন পাণ্ডবদের বহু কষ্টের বিষয় চিন্তা করে আপনার (যুধিষ্ঠির) আদেশে তপস্যার জন্যে গেছে। এটা অতি দুঃখদায়ক। ভীম আক্ষেপ করে আরও বলেন যে অর্জুনের মত বলশালী ও কৃষ্ণের ন্যায় বন্ধু থাকা সত্ত্বেও দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠিরের

জন্যই তিনি ক্রোধ সংবরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তির দোষেই তাঁরা বনে কষ্ট ভোগ করছেন, যদিও বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। ভীম বলেন যে অর্জুনকে স্বর্গলোক থেকে ফিরিয়ে এনে কৃষ্ণের সঙ্গে বার বৎসর পূর্ণ হবার আগেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে তিনি বধ করবেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি শত্রুদের ধ্বংস করার পর, ত্রয়োদশ বছর অতীত হলে যুধিষ্ঠির রাজধানীতে যাবেন এবং নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সব পাপ স্খলন করবেন। কারণ কষ্টের দিন অতি দীর্ঘ। একটি অহোরাত্র, একটি বছরের মত দীর্ঘ, অতএব তের দিনের অহোরাত্র কষ্ট ভোগ তের বছর সমাপ্ত হয়েছে মনে করুন। অনুচরদের সঙ্গে দুর্যোধনকে বধ করার এই উত্তম সময়। নতুবা সে সমগ্র পৃথিবীকে বশ করবে। শঠতার দ্বারাই শঠকে বিনাশ করতে হয়।

যখন ভীম এইরূপ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বধ করবার জন্যে উত্তেজিত করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে তের বছর পর নিশ্চয় তুমি অর্জুনের সঙ্গে দুর্যোধনকে বধ করবে। তিনি ভীমকে সম্বোধন করে বলেন যে তুমি যে বললে দুর্যোধনকে বধ করার সময় উপস্থিত হয়েছে, তা ঠিক নয়। মিথ্যার ঠাঁই তাঁর মধ্যে নেই। দুর্যোধনকে বধ করবার জন্য ভীমকে শঠ বা পাপিষ্ঠ হতে হবে না।

যখন যুধিষ্ঠির ভীমকে ঐরূপ বলছিলেন তখন মহর্ষি বৃহদশ্ব আসন গ্রহণ করলে যুধিষ্ঠির কাতর ভাবে মহর্ষিকে অনেক দুঃখের কথা বললেন। তিনি বললেন, তিনি দ্যূত নিপুণ নহেন, বিশেষতঃ সরলস্বভাব। শত্রুরা দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর রাজ্য ধন হরণ করেছে। তাঁর প্রাণ প্রিয়া ভার্য্যাকে লাঞ্ছিত করেছে, অতি নিষ্ঠুর বনবাস পণ জয় করে চীর জিন পরিধান করিয়ে তাঁদের গভীর অরণ্যে পাঠিয়েছে। যে অর্জুনের উপর তাঁদের সকলের ভরসা, অস্ত্র শিক্ষা শেষ করলে পর আবার তাঁকে দেখতে পাবেন। তাঁর অভাব তাঁরা তীব্র ভাবে

অনুভব করছেন। যুধিষ্ঠির গভীর খেদের সঙ্গে মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর মত এ রকম হতভাগ্য কোন রাজা জগতে আছে কি? তাঁর ধারণা তাঁর মত দুঃখী লোক জগতে নেই।

মহর্ষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তাঁর অপেক্ষাও অধিক দুঃখী এক রাজা ছিলেন। মহর্ষি তখন সেই রাজার কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেন। নিষধরাজ নল ও তাঁর পত্নী দময়ন্তীর প্রসঙ্গ মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন। রাজা নল ও তাঁর ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে দ্যূত ক্রীড়া করে রাজ্য ধন সব কিছু পণে হারান। নল রাজার নিজের বলতে কিছুই রইল না, কেবল মাত্র ভার্য্যা দময়ন্তী ছাড়া। পুষ্কর দময়ন্তীকে পণ রাখতে বললে রাজা নল ক্ষুব্ধ হয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করে বনোদ্দেশ্যে গমন করেন। দময়ন্তী ও তাঁর অনুগমন করেন।

দময়ন্তীর আখ্যান শেষ করে মহর্ষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, আপনি ভ্রাতাদের ও ভার্য্যার সঙ্গে দুঃখ ভোগ করছেন, ধর্মের আলোচনা শ্রবন করে সুখে ও আনন্দে আছেন। অন্য পক্ষে নল ও দময়ন্তী উভয়ে পরে একক ভাবে বনে বনে কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন। রাজ্যহারা নলের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে আপনার বনবাসের দুঃখের কোন তুলনা চলে না। অতএব আপনার বিলাপের কোন হেতু নেই। দৈব কষ্ট দিতে থাকলেও এবং পুরুষকার ব্যর্থ হলেও সত্ত্বগুণের লোক নিজেকে কখনো বিষাদগ্রস্ত করে না।

মহর্ষি আরো বলেন, রাজন্, কোন দ্যূতজ্ঞ ব্যক্তি পুনঃ আপনাকে দ্যূতে আহ্বান করবে এ ভয়ে আপনি অস্থির। মহর্ষি বলেন যে তিনি অক্ষ ক্রীড়ায় নিপুণ। এ ভয় দূর করবার জন্যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে সে বিদ্যা শিক্ষা দেবেন। অক্ষক্রীড়ার রহস্য দান করে স্নান করবার জন্যে মহর্ষি অশ্বশীর্ষ তীর্থে গমন করেন।

বৃহদশ্ব চলে গেলে পর যেসব স্থানে অর্জুন তপস্যায় রত সেই সেই স্থান হতে আগত ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের থেকে যুধিষ্ঠির জানলেন যে অর্জুন

একাকী ভয়ঙ্কর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। এ সংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনের জন্যে শোক করতে লাগলেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট অর্জুন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন। অর্জুনের বিরহে অন্যান্য ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী শোকে এমনই কাতর হলেন যে তাঁরা সকলেই অর্জুনবিহীন কাম্যকবন পরিত্যাগ করে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দ্রৌপদী ও অন্যান্য ভাইদের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ চিত্তে মৌন হয়ে বসে রইলেন।

ঐ সময় দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের নিকট আসলেন। পাণ্ডবরা তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলে, দেবর্ষি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করলেন। তখন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর জন্য দেবর্ষি কি করতে পারেন? যুধিষ্ঠির বলেন যে দেবর্ষি যখন তাঁর উপর সন্তুষ্ট আছেন, তাতেই তিনি সব কিছু পেয়ে গেছেন। যে লোক তীর্থ পর্যটনে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সে কি ফল পায় তার যথার্থ বর্ণনা করতে যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে অনুরোধ করেন।

দেবর্ষি বলেন ঠিক এ রকম জিজ্ঞাসু হয়ে ভীষ্মও পুলস্ত্য মুনির নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। পুলস্ত্য মুনি ভীষ্মকে যা বলেছিলেন তিনিও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তা শোনাবেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট পুলস্ত্য মুনি ভীষ্মকে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানের যে মাহাত্ম্য বা মহিমা বর্ণনা করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তিনি যদি মুনি ঋষি সমভিব্যবহারে তাঁর বর্ণিত তীর্থাদি ভ্রমণ করেন তবে জগতে বিখ্যাত হবেন। শত্রুদের বিনাশ করে নিজের রাজ্য ফিরে পাবেন। যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার আশ্বাস দিয়ে দেবর্ষি নারদ অন্তর্দ্ধান হলেন। যুধিষ্ঠির নানা তীর্থের পুণ্যের কথা মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ধৌম্যমুনিকে বলেন অস্ত্র আহরণের জন্য তিনি অর্জুনকে দেবলোকে প্রেরণ করেছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নর ও নারায়ণঋষি জেনে তিনি অর্জুনকে অস্ত্রলাভের জন্যে পাঠিয়েছেন।

অর্জুনই কেবল অতিরথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণ রূপ মহাগ্নিকে নির্বাপিত করতে সমর্থ। অর্জুন ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু সেই অর্জুন অস্ত্র লাভ করে কখন ফিরে আসবেন তার জন্য উঁ বা অধীর প্রতীক্ষায় আছেন—তিনি এই আক্ষেপ করতে থাকেন। যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যকে বলেন অর্জুন হীন কাম্যকবনে তাঁরা শান্তি পাচ্ছেন না। ধৌম্যকে তিনি অনুরোধ করেন এমন এক সুন্দর বনের খবর বলতে যা পবিত্র, পুণ্যাত্মার বাসস্থান ও ফল মূলে পরিপূর্ণ।

উত্তরে ধৌম্য দিক দিক চারিদিকের তীর্থ স্থানের বর্ণনা করেন এমন সময় লোমশ মুনি তথায় উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার পর তাঁর তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

লোমশমুনি মধুর ভাষায় পাণ্ডবদের আনন্দিত করে বলেন যে ইচ্ছামত সব লোক ঘুরে ঘুরে অবশেষে তিনি অমরাবতীতে ইন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। সেখানে অর্জুনকে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখে মুনিবর যখন আশ্চর্য্য বোধ করছিলেন, তখন তাঁকে ইন্দ্র মর্ত্তে পাণ্ডবদের নিকট আসতে আদেশ করলেন। তাই তিনি দেবরাজ ও অর্জুনের বাক্যানুসারে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কৃষ্ণা ও ঋষিগণের সঙ্গে শ্রবণ কর। তোমাদের এক অতি প্রিয় সংবাদ দিচ্ছি। যুধিষ্ঠির, তুমি যে অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুনকে পাঠিয়েছিলে, সে তা লাভ করেছে। তিনি বলতে থাকেন অর্জুন কোন অস্ত্র কি ভাবে লাভ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে যা বলবার জন্যে বলেছেন তা শ্রবণ কর। অর্জুন অস্ত্র শিক্ষা করে শীগ্‌গির ফিরবে। দেবতার অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করে সে ফিরছে। ইন্দ্র তোমাকে বলেছেন তুমি যেন ভ্রাতাদের সঙ্গে তপস্যায় মনোযোগ দাও। তপস্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন কিছুই নেই। এবং তদ্বারা মহৎ বস্তু লাভ করা

যায়। তারপর লোমশ মুনি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে যা বলতে বলেছিলেন তা তাঁকে বললেন।

দেবর্ষি নারদ ও লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিবকে তীর্থ ভ্রমণে যেতে উপদেশ দিলে যুধিষ্ঠির বহু সঙ্গীকে ত্যাগ করে ভীম ও অন্যান্য ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীর সঙ্গে মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্যের সমভিব্যাহারে তীর্থ যাত্রায় বের হলেন।

মহর্ষি লোমশ সবিস্তারে যুধিষ্ঠিরের কাছে অধর্মেব ফলে যাবতীয় ক্ষতির কথা বর্ণনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপূর্ব মহিমাও কীর্তন করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দেন যে দেবগণ ও ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা যেমন সব কিছু লাভ করে থাকেন, সেরূপ যুধিষ্ঠিরও তপোবলে ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের অচিরেই বধ করবেন।

বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য তীর্থে এসে উপস্থিত হলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির কৌশকী, গঙ্গাসাগর, বৈতরণী নদী দেখে মহেন্দ্র পর্বতে গমন করেন। তথায় অমিত তেজস্বী পরশুরামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। পরশুবামকে যথাযোগ্য অর্চনা করে দক্ষিণ দিকে তাঁরা প্রস্থান করেন। বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে যুধিষ্ঠিব ভ্রাতা ও ভার্য্যা সহ প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে যাদবগণের সঙ্গে মিলিত হলেন। যুধিষ্ঠিবেব ন্যায় ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পুরুষকে জটা ধারণ করে বনে বিচবণ করতে দেখে সাধারণ লোক কি করবে বলরাম কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন। সাধাবণ লোক কি ধর্মের শরণ নেবে না অধর্মকে আশ্রয় কববে? কারণ লোকের চোখেব সামনে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সমৃদ্ধি লাভ করছে আর যুধিষ্ঠির রাজ্য হারিয়ে নানা দুঃখ ভোগ কবছেন। এমন সময় পাণ্ডব বন্ধু সাত্যকি তাঁদের জন্যে যুদ্ধ কবে ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে বধ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেন, সাত্যকি যা বলেছেন তা অতি সত্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যুধিষ্ঠিব ও তাঁব ভ্রাতাগণ নিজের বাহুবলে যে রাজ্য জয় করেননি এমন রাজ্য চান না। পাণ্ডবরা

কখনো ধর্ম পরিত্যাগ করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির বললেন যে তিনি ধর্মের বিনিময়ে রাজ্য চান না। কৃষ্ণ ও তিনি পরস্পরকে সম্যক জানেন। যুধিষ্ঠিব সাত্যকিকে বলেন, কৃষ্ণ যখনই পরাক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হয়েছে মনে করবেন, তখন তিনি ও তুমি দুর্যোধনকে যুদ্ধে জয় করবে। অতঃপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে লোমশ মুনি, ভ্রাতা ও ভৃত্যগণের সঙ্গে পয়োষ্ণী নদীর ঘাটে উপস্থিত হলেন।

তথায় কিছুদিন বাস করার পর নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে মহর্ষি লোমশ সকল তীর্থের মহিমা কীর্ত্তন করে যুধিষ্ঠিব ও অন্যান্য পাণ্ডবদের জ্ঞান ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন। লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তাঁরা অনেক তীর্থ পরিক্রম করে কৈলাস ও মন্দর পর্বতে প্রবেশ করছেন। কৈলাস পর্বতের নিকট বদরিকাশ্রম অবস্থিত। কিন্তু এ সব অতি দুর্গম। তখন মহর্ষি লোমশ নদী, পর্বত, সরোবর প্রভৃতির কাছে যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করেন। যুধিষ্ঠির সকলকে সাবধান করে বলেন যে ঐ দেশ অতি দুর্গম, অতএব সকলকে পরম পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে।

যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন যে মহর্ষি লোমশের সাবধানী বাণী শুনেছো, এখন চিন্তা করে দেখো দ্রৌপদী কি করে সেখানে যাবে। তিনি ভীমকে ধৌম্য, সহদেব, সারথি প্রভৃতি যারা কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম তাঁদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরের আগমন প্রতীক্ষা কবে হরিদ্বাবে অবস্থান করতে বলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বলেন যে দ্রৌপদী অর্জুনকে দেখবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, সেরূপ সহদেবও। অতএব যুধিষ্ঠির কেন তাঁদের পিছনে ফেলে যেতে চাইছেন। যদি দ্রৌপদী বা নকুল ও সহদেব দুর্গম পথ চলতে অসর্থ হয়, ভীম তাঁদের কাঁধে কবে চলবেন। যুধিষ্ঠির ভীমের এ রকম উত্তব শুনে তুষ্ট হয়ে তাঁর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে তাঁদেরও সঙ্গে নিলেন।

কিয়দ্দূর যাবার পর তাঁরা কুলিন্দরাজ সুবাহু রাজার রাজ্য

দেখলেন এবং সুবাহু তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলে তাঁরা সেখানে সুখে রাত্রি যাপন করেন। ভৃত্যদের, পাচক, পাকশালার অধ্যক্ষদের ও দ্রৌপদীর জিনিষপত্র কুলিন্দরাজের ঐখানে রেখে তাঁরা অর্জুনকে দেখবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন।

যখন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন অর্জুনের জন্য শোক প্রকাশ করে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন, অর্জুনকে নিকটে দেখতে না পেয়ে তাঁর শরীর শোকে দগ্ধ হচ্ছে। অর্জুনকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা এ রকম কষ্ট সহ্য করছেন, পাঁচ বছর কাল অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে তিনি বড়ই কষ্ট অনুভব করছেন ইত্যাদি। পরিশেষে তিনি বলেন যে সংযত ও মিতাহার হয়ে অর্জুনের দর্শনের জন্য তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করছেন। মহর্ষি লোমশ তাঁদের সকলকে নিরুদ্বিগ্ন ও সমাহিত হযে চলতে বলেন। কারণ এ স্থান পুণ্যকর্মা দিব্য ঋষিগণের ও দেবতাগণের বাসস্থান ও বিহার ভূমি। লোমশ মুনির কথা শুনে ও অলকানন্দা নদীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে সকলে সংযতভাবে গঙ্গাকে অভিবাদন করলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হলে সম্মুখে নবকাসুরের রাশীকৃত অস্থিস্তূপ দেখা গেল। লোমশ মুনি, বিষ্ণু কিরূপে ঐ দৈত্য বধ করেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। মুনির মুখে ঐ কাহিনী শুনে পাণ্ডবগণ মুনির আদিষ্ট পথে আনন্দে এগোতে থাকেন। পথ চলতে চলতে বর্ষা ও বাতাসের আঘাতে শ্রান্ত হযে দ্রৌপদী পথিমধ্যে মূর্ছিত হলেন। তখন নকুল ছুটে আসলেন এবং দ্রৌপদীব দিকে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

যুধিষ্ঠির ছুটে এসে দ্রৌপদীকে কোলে নিযে করুণ ভাবে কাঁদতে থাকেন। নিজেব পাশা খেলার মোহেব জন্য নিজেকে ধিক্কাব দিতে থাকেন। তখন ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজগণ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানাভাবে আশ্বাস দিলেন। এবং শান্তিব জন্যে মন্ত্র

ও পাণ্ডবদের যত্নে দ্রৌপদী পুনঃ জ্ঞানলাভ করলেন। নকুল ও সহদেব তাঁর গাত্র মার্জনা করতে থাকেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে জিজ্ঞেস করেন ঐ রকম উচু নীচু পর্বত দ্রৌপদী কি করে অতিক্রম করবেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, তিনি দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যাবেন। তাঁকে বিষণ্ণ হতে বারণ করেন। ভীম আরও বলেন, যদি যুধিষ্ঠির অনুমতি করেন তবে হিড়িম্বানন্দন তাঁদের সকলকে আকাশ পথ দিয়ে নিয়ে যাবে।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে ভীম ঘটোৎকচকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীমের আজ্ঞার অপেক্ষায় রইল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন তোমার ঐ পুত্রকে এরূপ আদেশ কর যেন আমরা ও দ্রৌপদী অক্ষত শরীরে গন্ধমাদন পর্বতে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে।

ভীমের আদেশে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের মধ্যখানে দ্রৌপদীকে রেখে তাঁদের নিয়ে চললো। এবং তার সাহায্যে অন্যান্য রাক্ষসরা ব্রাহ্মণগণকে নিয়ে চললো। মহর্ষি লোমশ নিজ যোগশক্তিবলে আকাশ পথ দিয়ে চললেন। রমণীয় বন, উপবন সমূহ দেখতে দেখতে সকলে বদরিকাশ্রমের দিকে চলতে থাকেন। ঐ স্থানের দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষিবৃন্দ যুধিষ্ঠিরের আগমনের কথা পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিলেন। এবং যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতিতে তাঁরা সকলে হৃষ্টমনে যুধিষ্ঠিরের অভ্যর্থনা করেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণ, বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণও দ্রৌপদীর সঙ্গে এই মনোরম পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ কবেন। তাঁরা ঐ স্থানের মনোরম সৌন্দর্য ও পবিত্রতা উপভোগ করে পরম আনন্দে বিহার করতে লাগলেন।

অর্জুনকে দেখবার আশায় পাণ্ডবগণ পরম শুচিতা অবলম্বন করে সেই জায়গায় ছয় রাত্রি কাটালেন। একদিন এক মনোরম সহস্রদল পদ্ম বাতাসে সেখানে আনলো। দ্রৌপদী ঐ পদ্মটি দেখে মুগ্ধ হয়ে ভীমের কাছে ঐ পদ্মটি চাইলেন ও তা পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন।

তিনি ঐ পদ্মটি যুধিষ্ঠিরকে দেবার জন্য নিয়ে গেলেন এবং আরও ঐরূপ পদ্ম ফুলের জন্য ভীমেব কাছে আবদার করলেন। প্রিয়ার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভীম আরও পদ্ম সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন।

এদিকে নানারূপ উৎপাত ও অশুভ লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠিব ব্যস্ত ও ত্রস্ত হয়ে নকুল ও সহদেবকে বললেন যে তিনি ভয়ঙ্কর কোন উৎপাতের আশঙ্কা করছেন। হয়ত তাঁদের যুদ্ধও করতে হতে পারে। তিনি যমজ ভ্রাতা দুজনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যুধিষ্ঠির বীর ভীমের খোঁজ কবলেন। দ্রৌপদী বললেন, যে সুগন্ধ পুষ্পটি বাতাসে ভেসে এসেছিল, ঐ রকম আরো অনেক ফুল আনবার জন্যে ভীম গেছেন এবং তিনি শীগ্গিব ফিববেন। যুধিষ্ঠিব নকুল ও সহদেবকে জানালেন যে তাঁরা ভীমের সন্ধানে যাবেন। কারণ ভীম অনেক দূরে চলে গেছে এবং তাব যাবার পর বহু সময় অতীত হয়েছে। ভীম যেন সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেব প্রতি কোন অপরাধ না করতে পারে, তার পূর্বেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে, এই বলে তিনি ঘটোৎকচকে সম্বোধন করে তাঁদের নিয়ে যাবার জন্যে বলেন।

'তাই হোক' বলে ঘটোৎকচ ও সহচর রাক্ষসগণ পাণ্ডবগণকে ও ব্রাহ্মণদের নিযে মহর্ষি লোমশেব সঙ্গে কুবেরের পুষ্করিণীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঐ পুষ্করিণীর তীরে ভীমকে দেখতে পেলো। তাঁরা দেখলেন ভীম সেখানে ভীমকাণ্ড করে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু যক্ষ নিহত, কারো মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ, কারো চোখ বা জিহ্বা ছিন্ন ভিন্ন ইত্যাদি। এবং ভীম গদা হাতে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়িয়ে দণ্ডায়মান। যুধিষ্ঠিব তাঁকে আলিঙ্গন করে মধুবভাবে বললেন, ভীম, এ কি কাজ কবেছ তুমি? দেবতাদেব এরূপ অপ্রিয় কাজ তুমি কবেছ? তাঁর প্রিয হতে চাইলে এ ধরণের অপ্রিয কাজ করতে তিনি ভীমকে বাবণ কবেন। তাবপর সেই সুগন্ধ পদ্মগুলি নিয়ে সেই সবোবর তীরে যুধিষ্ঠিব বেড়াতে থাকেন। কুবেবকে জানিয়ে সেই সবোবর তীবে তিনি আনন্দের সঙ্গে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন।

ঐ সময়ে একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভ্রাতাদের বললেন পুণ্যদায়ক ও মঙ্গলদায়ক অনেক তীর্থ তাঁরা দেখেছেন, অনেক ঋষির পূর্ব-চরিত্র, কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে শুনেছেন, অনেক স্নান তর্পণ করেছেন ইত্যাদি। কুবেরের বাসভূমিতে কি করে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময় এক আকাশবাণী শোনা গেল,—কুবেরের এই আশ্রম হতে আরো আগে যাওয়া অসম্ভব। কারণ পথ অতি দুর্গম। এই বাণী তাঁদের বিশালা বদরীনামে নারায়ণাশ্রমে ফিরে যেতে বলে। সেখান থেকে কুবেরের বাসভূমি দেখা যাবে। ধৌম্য বললেন, এ বাণীর বিপরীত কাজ করা উচিত নয়। তাঁরা সকলে দ্রৌপদীসহ নরনারায়ণাশ্রমে ফিরে আসেন।

গন্ধমাদন পর্বতে নরনারায়ণাশ্রমে পাণ্ডবগণ অর্জুনের অপেক্ষায় নিশ্চিন্তে বাস করছিলেন। ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ বিদায় নিয়েছে। ভীমও যত্রতত্র বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। এ সুযোগে এক রাক্ষস নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরকে হরণ করে। এ রাক্ষসের নাম জটাসুর। সে নিজেকে মন্ত্রকুশল ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়ে পাণ্ডবগণের সেবা করছিল। যুধিষ্ঠির ঐ পাপিষ্ঠকে চিনতে পারেননি। লোমশ ও অন্যান্য তপস্বীগণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঐ রাক্ষস তার নিজ আকৃতি ধরে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, দ্রৌপদী ও তিন পাণ্ডবকে নিয়ে প্রস্থান করে। সহদেব বলপ্রকাশ করে কোনরূপে রাক্ষসকবল হতে নিজেকে মুক্ত করেন ও একখানি তরবারি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন্। তারপর ভীম যে পথ ধরে গিয়েছিলেন সেদিকে গিয়ে চীৎকার করে ভীমকে ডাকতে থাকেন। যুধিষ্ঠির নানাভাবে ঐ রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করে তার মধ্যে ধর্মের উদ্রেক করবার চেষ্টা করেন। ধর্ম ও ন্যায়ের কথা রাক্ষসের মন স্পর্শ করল না। তখন যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারী করে রাক্ষসের গতি মন্থর করে দিলেন এবং সকলকে ঐ রাক্ষসকে ভয় করতে বারণ করেন।

এ সময় সহদেব ঐ রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে, গদা হস্তে ভীম সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, এবং পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে বললেন যে তিনি রাক্ষসকে প্রথম থেকে সন্দেহ করছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের বেশ নিয়ে আত্মগোপন করেছিল বলে তাকে বধ করেননি। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। রাক্ষসের সঙ্গে ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং ভীম তাকে বধ করেন।

রাম চরিত্রেও এইরূপ একটা ঘটনা পাওয়া যায়। দণ্ডকারণ্যে হঠাৎ বিরাধ রাক্ষস প্রথমে সীতা, পরে রাম লক্ষ্মণকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করে। ব্রহ্মার বরে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না বলে রাক্ষস জানায়। তখন রাম লক্ষ্মণ তার বাহুদ্বয় ছিন্ন করেন। ইহাতে বিরাধ রাক্ষস মূর্ছিত হয়ে পড়ে। রাম লক্ষ্মণ তাকে মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত করেন। তবু তাকে বধ করা গেল না। অতঃপর রাম তাকে ভূমিতে প্রোথিত করে বধ করতে হবে বলে লক্ষ্মণকে গর্ত করতে বলে রাম পা দিয়ে বিরাধের গলা চেপে রইলেন। বিরাধ তখন আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন তিনি তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্ব, কুবেরের শাপে বিরাধ রাক্ষসে পরিণত হয়েছেন। রাম তাকে বধ করলে তাঁর স্বর্গলাভ হবে। তাঁর নির্দ্দেশ মত রাম লক্ষ্মণ তাঁকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করে রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টি করেন।

রাক্ষস নিহত হলে যুধিষ্ঠির নরনারায়ণাশ্রমে আবার ফিরে আসেন। একদিন দ্রৌপদীর সঙ্গে সব পাণ্ডবগণ বসে অর্জুনকে স্মরণ করতে থাকেন। তিনি বললেন, বনে বাস করতে করতে চার বৎসর কেটে গেল। অর্জুন সঙ্কেত পাঠিয়েছিলো যে পঞ্চম বৎসরে সে ফিরবে। তাঁরা সকলেই দেবলোক হতে আগত অর্জুনকে দেখবার জন্যে ঘটোৎকচাদি বাহক দ্বারা ও মহর্ষি লোমশ দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। নানা পর্বত, গন্ধমাদনের পাদদেশ বহু পার্বত্য নদী ইত্যাদি দেখতে দেখতে তাঁরা সতের দিন চলার পর হিমালয় পর্বতের এক পৃষ্ঠভাগে উপস্থিত হলেন

এবং গন্ধমাদন পর্বত দেখতে পেলেন। সেখানে রাজর্ষি বৃষপর্বার আশ্রম দেখতে পেলেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে এবং বৃষপর্বার হাতে ব্রাহ্মণগণকে ও নিজেদের যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী গচ্ছিত রেখে উত্তরদিকে চলতে থাকেন। গন্ধমাদন পর্বত ও তার চারদিকের নানা মনোরম শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তপস্বী আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে ঋষি আর্ষ্টিষেণকে সম্মান দেখালে পর, ঋষি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নানারূপ উপদেশ দেন। এবং অর্জুনের আগমন পর্যন্ত তথায় বাস করবার জন্যে বলেন, সেই আশ্রমে অত্যাশ্চর্য্য বস্তুসমূহ দেখতে দেখতে পাণ্ডবদের বহু মাস কেটে গেল।

কয়েকদিন পরে পাণ্ডবরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন গন্ধমাদন পর্বত কেঁপে উঠল। কারণ গরুড় এসে এক বিকট সাপকে ধরে নিল। পর্বতের শিখরদেশ হতে এক প্রবল বাতাসের আঘাতে সুগন্ধ ফুলের বহুমালা পাণ্ডবদের কাছে পড়ল। ঐ মালাতে পাঁচ রঙএর ফুল ছিল।

একদিন দ্রৌপদী ভীমকে নির্জনে পেয়ে বললেন, অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করবার সময় যুদ্ধে যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রগমন রোধ করে গাণ্ডীব ধনু পেয়েছিলেন। তেমনি তুমিও তোমার বাহুবল দ্বারা রাক্ষসদের এ পর্বত ছেড়ে পালাতে বাধ্য করলে তোমার বন্ধুগণ সকলে নির্ভয়ে বিচিত্র মালাবিশিষ্ট ঐ পর্বত শিখর উপভোগ করতে পারবে। দ্রৌপদী আরও বলেন যে তাঁর বহুকালের ইচ্ছা যে ভীম দ্বারা রক্ষিত হয়ে তিনি ঐ পর্বত শিখর দেখবেন। দ্রৌপদীর কথায় উত্তেজিত হয়ে ভীম গদা, ধনু ইত্যাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সেই পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন এবং কুবের ভবন দেখতে পেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বিকট জ্যাঘোষ ও শঙ্খধ্বনি করতে থাকেন। ঐ শব্দে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ সেখানে আসলে ভীমের সঙ্গে তাদের এক ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। ভীম তাদের অনেককে হত করলেন।

যারা জীবিত ছিল তারা কুবেরকে ভীমের এ সংহার লীলার সংবাদ দিলো।

যখন এই জন্যে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দে গিরিগুহা প্রকম্পিত হচ্ছিল, তখন যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যরা ভীমকে দেখতে না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের কাছে রেখে তিন ভাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভীমের খোঁজে বের হলেন এবং দ্রুত পর্বতশিখরে আরোহণ করে খুঁজে খুঁজে ভীমকে দেখতে পেলেন এবং আবোও দেখলেন বহু রাক্ষস হত হয়েছে বা অনেকে আহত হয়ে ছটফট করছে। আর বীর ভীম গদা, খড়্গ ইত্যাদি হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির ভাইকে আলিঙ্গন করে সেখানে বসে পড়লেন এবং ভীমকে তাঁর হঠকারিতার ও দুঃসাহসিকতার জন্যে ভর্ৎসনা করেন ও বললেন যে ভীমের তাঁর প্রিয় কাজ করাই উচিত এবং ঐরূপ কাজ পুনঃ করতে বারণ করেন।

ঐদিকে রণক্ষেত্র থেকে পলাতক রাক্ষসগণেব মুখে ভীমের ব্যাপার জানতে পেরে কুবের গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং পাণ্ডুতনয়দের দেখে প্রীত হলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করে নিজেদের অপরাধ স্মরণ করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীমও কুবেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন, তিনি ভীমের উপর ক্রুদ্ধ হননি বরং সন্তুষ্টই হয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে দেবগণ পূর্বেই এই নিহত যক্ষ রাক্ষসগণের বিনাশ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এবং তিনি নিজে ভীমের দ্বারা ঘোর শাপ বিমুক্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ঐ শাপের কথা জিজ্ঞেস করলে, অগস্ত্য মুনি কি কারণে তাঁকে শাপান্বিত করেন কুবের তা সবিস্তারে প্রকাশ করেন। অতঃপর কুবের যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়ে, ভীমের অসহনশীল স্বভাব, বালবুদ্ধি প্রভৃতির জন্য শাসনে রাখতে, অর্জুনের অস্ত্র বিদ্যার ও অস্ত্র লাভের সংবাদ দিয়ে, তাঁদের পিতামহ সম্রাট শান্তনুর

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জানিয়ে, ভীমকে আশীর্বাদ করে এবং যক্ষেরা পাণ্ডবদের সব সময়ে রক্ষা করবে, এ আশ্বাস দিয়ে নিজ ভবনে ফিরে গেলেন।

গন্ধমাদন পর্বতে পাণ্ডবরা অর্জুনের আগমন অপেক্ষা করতে থাকেন। কাম্যকবন হতে যখন অর্জুন অস্ত্রলাভের জন্য যাত্রা করেন তখন থেকে অন্য পাণ্ডবরা অর্জুনের জন্য শোকার্ত হয়ে আছেন।

অন্যদিকে অর্জুন ইন্দ্রের নিকট হতে সব প্রকার দৈবাস্ত্র সমন্ত্রক গ্রহণ করে ইন্দ্রকে প্রণাম করে ও ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন, এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে পুনঃ মিলিত হলেন। অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরাদি সকলের খুবই আনন্দ হলো। অর্জুনও যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে পরম আনন্দ লাভ করেন।

অর্জুনের প্রত্যাগমনের পরদিনই ইন্দ্র স্বয়ং পাণ্ডবপুত্রদের নিকট উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রকে পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। তখন দেবরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেন তিনি পৃথিবী শাসন করবেন। তাঁর মঙ্গল কামনা করেন এবং অর্জুন তাঁর নিকট হতে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন এ সংবাদও দিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত হতে আশ্বাস দেন। কারণ ত্রিলোকে কেউই ধনঞ্জয়কে জয় করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর দেবরাজ স্বর্গে চলে গেলেন। পাণ্ডবগণকে কাম্যকবনে ফিরে যেতে বললেন।

ইন্দ্র চলে গেলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করে, অর্জুন কি করে অস্ত্রশস্ত্র সমূহ লাভ করেছেন, কি করে ইন্দ্রের দর্শন পেলেন, কি করে শঙ্করকে আরাধনায় তুষ্ট করেছেন, ইন্দ্রের কি প্রিয় কার্য্য করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করতে অর্জুনকে বলেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ কাম্যকবন হতে বেরিয়ে যাবার পর যা যা ঘটেছিল তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুধিষ্ঠিরের কাছে বর্ণনা করেন। অর্জুনের

মুখে সমুদয় ঘটনা শুনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সমুদয় দিব্যাস্ত্রগুলি দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্যাস্ত্রগুলি দেখাতে থাকলে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বৃথা অস্ত্র প্রদর্শন করতে অর্জুনকে বারণ করেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন শত্রু নিধনে ঐ সব অস্ত্র প্রয়োগ করবেন তখনই দিব্যাস্ত্রের শক্তি বা পরাক্রম দেখা যাবে। এই বলে দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য দেবতা যাঁরা অর্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, সবাই স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ আনন্দিতচিত্তে সেই বনে বাস করতে থাকেন। পাণ্ডবগণ অর্জুনেব সঙ্গে পরমানন্দে ও অতি সুখ ও মঙ্গলের সঙ্গে রমণীয গন্ধমাদন পর্বতে তাঁদের বনবাসের চার বছর কাটালেন। এই ভাবে তাঁদের বনবাসের দশ বছর অতীত হলো।

অতঃপর একদিন যখন যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল ও সহদেব বসে-ছিলেন, তখন ভীম যুধিষ্ঠিবকে কিছু প্রিয় ও হিতকর কথা বললেন। ভীম বললেন যে তাঁদের বনবাসের এগার বছর চলছে। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায তাঁরা মান সম্মান পরিত্যাগ করে বনে বনে বিচরণ করছেন এবং অজ্ঞাতবাসেব কালও হযত সুখে কাটাতে পারবেন। কিন্তু সময় এসেছে কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে দুর্যোধনকে প্রলুব্ধ করা এবং পবে কোনও দূরদেশে গিযে বাস করা, তাহলে দুর্যোধন তাঁদের গতিবিধি জানতে পাববেন না। ভীম যুধিষ্ঠিরকে ভূতলে গিয়ে বাস করতে অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠিব ভাইদেব অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কালবিলম্ব না কবে গন্ধমাদন পর্বত ত্যাগ করে মহর্ষি লোমশেব ও রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণেব হিতোপদেশ শিবোধার্য্য করে বদবিকাশ্রম, সুবাহুনগর ইত্যাদি অতিক্রম করে সবস্বতী নদীর তটস্থিত দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন, এবং তথায় পাণ্ডবগণ আনন্দের সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

দ্বৈতবনে বাসকালে বৃকোদর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেই বনে যত্র তত্র বেড়াতে থাকেন। মহাবল ভীমের প্রবল পরাক্রমের গর্ব বহুকাল হতেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঐ বন তাঁর ক্রীড়াস্থান হয়েছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি প্রাণী তাঁর ভযে পলায়ন করতো। এক দিন ভীম দেখলেন এক মহাকায অজগর একটি পর্বত কন্দরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে শয়ন করে আছে। ঐ অজগর ভীষণ ক্রোধে ভীমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর বাহুদ্বয় ধরে ফেল্‌লো। স্পর্শ মাত্র ভীম মূর্ছিত প্রায় হলেন এবং অজগরের বশীভূত হযে ছটফট করতে থাকেন। মুক্তিলাভের চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না। তখন ভীম সেই অজগরকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কি বিদ্যাবল বা বরপ্রাপ্ত হয়েছেন যে কারণে চেষ্টা করেও ভীম মুক্ত হতে পারছেন না এবং ভুজঙ্গের বশীভূত হচ্ছেন।

উত্তরে অজগর কিরূপে তাঁর সর্পরূপ প্রাপ্তি ঘটেছে তা ভীমের কাছে বিবৃত করেন। প্রত্যুত্তরে ভীমও বলেন যে তিনি দৈবকেই বলবান মনে করেন এবং দৈবেব আঘাতেই তাঁর ঐ দশা ঘটেছে। তাঁর নিজের জীবনের জন্যে কোন খেদ নেই, তবে তাঁর শোক তাঁর রাজ্যভ্রষ্ট ভ্রাতাদের জন্যে। তিনি ভ্রাতাদের জন্যে নানা ভাবে বিলাপ করতে থাকেন।

ঐদিকে যুধিষ্ঠিব অনিষ্ট সূচক উৎপাত দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ভীমের সন্ধান করতে থাকেন। দ্রৌপদী জানালেন ভীম অনেকক্ষণ বাইরে গেছেন। একথা শুনে যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে বের হয়ে পড়লেন। অর্জুনের উপর দ্রৌপদী ও ব্রাহ্মণগণেব ভার ন্যস্ত করে গেলেন। ভীমের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে দেখতে পেলেন এক গিরি গহ্বরের মধ্যে এক অজগরের কবলে ভীম নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে আছেন।

যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি করে তাঁর ঐ অবস্থা ঘটেছে এবং সর্প শ্রেষ্ঠ বা কে ?

ভীম অজগরকে দেখিয়ে বলেন যে ইনি অন্য কেহ নন। ইনি রাজর্ষি নহুষ এবং তাঁকে আহারার্থে গ্রহণ করেছেন।

তখন যুধিষ্ঠির ঐ সর্পকে সম্বোধন করে তাঁর শক্তিশালী ভ্রাতাকে মুক্তি দিতে বলেন। তিনি তাঁর জন্য অন্য আহার ব্যবস্থা করবেন। সর্প বললেন, ঐ রাজপুত্র স্বয়ং তাঁর আহাররূপে আগত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করে বললেন যদি তিনি বাঁচতে চান তবে সে স্থান ত্যাগ করতে নতুবা পরবর্ত্তী দিন যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁর ভক্ষ্য বস্তু হবেন। সর্প ভীমকে ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন এবং আরও জিজ্ঞেস করেন ভীমের পরিবর্ত্তে কিরূপ আহার দিলে তিনি ভীমকে অব্যাহতি দেবেন।

তখন সর্প আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি কুরুদের পূর্বপুরুষ রাজা নহুষ। যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয় দমন ও পরাক্রমের দ্বারা তিনি ত্রৈলোক্যের নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর মধ্যে অহঙ্কার আসে। সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁর শিবিকা বহন করতেন। ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অবমাননার জন্যে অগস্ত্যমুনি তাঁকে শাপান্ত করার ফলে তাঁর এই বর্ত্তমান অবস্থা। অগস্ত্যের শাপানুসারে দিনের ষষ্ঠভাগে তিনি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ভীমকে তাঁর ভক্ষ্যবস্তু হিসেবে পেয়েছেন। অতএব তিনি ভীমকে ছাড়বেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির যদি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে ভীমকে পরে মুক্তি দিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির সর্পকে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করতে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বলেন যে ব্রাহ্মণের যা জ্ঞাতব্য বিষয় তা সর্প জানেন কিনা, তবে যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের জবাব দেবেন।

সর্প প্রশ্ন করলেন, ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যতত্ত্ব কি? অর্থাৎ জ্ঞাতব্য কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।

দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ (বন) ১৮০।২১

হে সর্পশ্রেষ্ঠ—সত্য, দান, ক্ষমা, সদ্‌স্বভাব, অনৃশংসতা, তপস্যা, ঘৃণা (দয়া) এ সব গুণসমূহ যার মধ্যে দেখা যায় সেই ব্রাহ্মণ।

বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।

যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্‌॥ (বন) ১৮০।২২

হে নগেন্দ্র, দুঃখ ও সুখরহিত পরব্রহ্ম—যাকে লাভ করলে শোক মোহ দূর হয়—তিনিই জ্ঞাতব্য।

উত্তরে সর্প বলেন, সত্য ও ব্রহ্ম দুইই চারবর্ণ লোকের কাছে আদরণীয়। শূদ্রের মধ্যেও ঐ সব গুণ দেখা যেতে পারে। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, যদি উক্ত গুণ শূদ্রের কাছে থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণের কাছে নেই, তবে শূদ্র জাতিতে শূদ্র হলেও সে গুণে শূদ্র নয়, আর ব্রাহ্মণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও গুণে ব্রাহ্মণ নয়, তাকে শূদ্র বলাই উচিত। তিনি আরও বলেন সুখ দুঃখ রহিত যে বস্তু আছে ইহাই পরব্রহ্ম।

তখন সর্প বলেন, গুণের প্রাধান্যের দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র নির্ণীত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত কেউ সে সব গুণযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে গুণে ব্রাহ্মণ নয়। যুধিষ্ঠির বলেন মনুষ্যের মধ্যে জাতির পরীক্ষা খুবই কঠিন।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সর্প ভীমকে মুক্তি দিলেন। তারপরও যুধিষ্ঠির ও সর্পের মধ্যে বহু আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্নোত্তর চলে এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঐরূপ বাক্যালাপের ফলে তিনি সর্প-যোনি হতে মুক্ত হয়ে দিব্যকান্তি লাভ করে স্বর্গলোকে গমন করেন।

রামায়ণেও রামের সংস্পর্শে এসে অনেক মহাপুরুষ শাপমুক্ত হয়ে তাঁদের পূর্বরূপ লাভ করেছিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন ত্যাগ করে কাম্যকবনে গমন করেন। কাম্যকবনে কৃষ্ণ, মুনিবর মার্কণ্ডেয় ও দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি সব সেখানে সমবেত হন। যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবতনয়দের অনুরোধে

মার্কণ্ডেয় মুনি নানা উপাখ্যানে পাণ্ডবদের কৃতার্থ ও তাঁদের আনন্দ বর্ধন করেন।

পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থান কালে বেদবিদ তপস্বী ও পুরাতন ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হলেন। জনৈক কথাকুশল ব্রাহ্মণও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরে হস্তিনাপুরে কৌরবদের নিকট উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করেন। ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে পাণ্ডবদের বিষয় জিজ্ঞেস করলে ব্রাহ্মণ বলেন, বাতাস ও রৌদ্রের আকর্ষণে পাণ্ডবরা কৃশাঙ্গ এবং তাঁরা দুঃখমুখে পতিত। বীরপতিগণ বর্তমান থাকতেও অনাথার ন্যায় দ্রৌপদী ক্লেশ ভোগ করছেন।

ব্রাহ্মণের মুখে পাণ্ডবদের দুঃখের বর্ণনা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বাহ্যতঃ পাণ্ডবদের জন্য খুবই শোক করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ভয় তাঁর মনকে পীড়া দিচ্ছিল যে পাণ্ডবরা তাঁদের এ দুঃখের প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ় হয়েছেন। যতই তাঁদের দুঃখ ভোগ বাড়ছে ততই তাঁদের, বিশেষতঃ ভীমার্জুনের প্রতিশোধ স্পৃহার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিশোধ নেবেও। নতুবা সশরীরে স্বর্গে গিয়ে অর্জুন ভিন্ন কোন ব্যক্তি মর্ত্যলোকে ফিরে আসে? ধনুর্ধারী সব্যসাচী অর্জুন, তাব ভযানক গাণ্ডীব ধনু, তদুপরি তার প্রাপ্ত সমস্ত দিব্যাস্ত্র—এ তিনের মিলিত বেগকে কে সহ্য করতে পারবে?

ধৃতরাষ্ট্রের এ সমস্ত নেপথ্য উক্তি শকুনি গোপনে শুনতে পেয়ে দুর্যোধন ও কর্ণের কাছে তা প্রকাশ করেন। শকুনি দুর্যোধনকে আরো বলেন, দ্বৈতবনে কোন সরোবরের কাছে পাণ্ডবরা বনবাসী ব্রাহ্মণদেব সঙ্গে অবস্থান করছেন। অতএব হে মহারাজ, রাজ-লক্ষ্মীতে সুশোভিত হয়ে, তথায় গমন করে, শ্রীহীন পাণ্ডবদের সন্তপ্ত কব। পাণ্ডবরা তোমাকে মহারাজ নহুষেব মত রাজৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত দেখুক। শত্রুর দুর্দশা দেখে, অর্জুনকে অজিন পরিহিত দেখে দ্রৌপদীকে দুঃখে প্রপীড়িতা ও ক্ষুণ্ণা দেখে তুমি কত না আনন্দ অনুভব করবে, কারণ—

ন পুত্রধনলাভেন ন রাজ্যেনাপি বিন্দতি।
প্রীতিং নৃপতিশার্দূল যামমিত্রাঘদর্শনাৎ॥ (বন) ২৩৭।১৯

—মানুষ, পুত্র, ধন এমনকি রাজ্য লাভেও তত আনন্দ অনুভব করে না, যেমন অনুভব করে শত্রুকে দুর্দ্দশাপন্ন দেখে।

একথা বলে শকুনি নীরব হলেন। শকুনির কথা শুনে দুর্যোধন খুবই আনন্দিত হলেন। কারণ ভীমার্জুনকে বনবাসক্লিষ্ট দেখলে, পাণ্ডবদের বল্কল ও মৃগচর্ম পরিহিত দেখলে তিনি যে আনন্দ পাবেন, সমস্ত পৃথিবী জয়েও তাঁর সে আনন্দ হবে না। দ্রৌপদীকে কাষায় বস্ত্র পরিহিতা দেখলে তার চেয়ে অধিক আনন্দের বস্তু তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। তবে কি করে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পাওয়া যেতে পারে এ সমস্যা তাঁদের চিন্তিত করলো। তখন কর্ণ বললেন কেন? মহারাজ, তোমার ঘোষগণ বনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের দেখতে যাবার ছলে দ্বৈতবনে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে।

তাঁরা আনন্দের সঙ্গে কর্ণের ঐ প্রস্তাব নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন। নানা ভাবে ও নানা যুক্তিতে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ও তাঁর সহচরদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করে পরিশেষে সম্মতি দিলেন।

বনে বল্কল পরিহিত পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন গো-নিরীক্ষণ ও মৃগয়াচ্ছলে সপরিবারে ও সবান্ধবে দ্বৈতবনে গেলেন। সেইখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে সপত্নীক কৌরবরা গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হলে দুর্যোধনের কয়েকজন সৈন্য ও অমাত্য পাণ্ডবদের কাছে এই সংবাদ নিয়ে আসে। এই খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনকে গন্ধর্বরাজকে পরাভূত করে কৌরবদের মুক্ত করে আনতে আদেশ দিলেন। ক্রুদ্ধ ভীম দুর্যোধনদের কুকর্মের কথা স্মরণ করে বলেন যে দুর্যোধন নিশ্চিত কোন কুমতলবে এখানে এসেছে। প্রবাদ আছে,

যারা কোন অপকার করতে অক্ষম, তাদের প্রতি যারা দ্বেষ করে, তাদের অন্যলোকে নিপাতিত করে। গন্ধর্বগণ সেই অতিমানুষের কাজ করেছেন।

যুধিষ্ঠির বলেন—

ন কালঃ পরুষস্যায়মিতি রাজাভ্যভষাত॥ (বন) ২৪২।২২

—শরণাগতকে কটুবাক্য বলবার সময় এটা নয়।

তিনি আরও বললেন—

যদা তু কশ্চিজ্‌জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ পোথয়তে কুলম্।

ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্॥ (বন) ২৪৩।৩

—যদি বাইরের কোন লোক বংশের জ্ঞাতিগণের উপর আক্রমণ করে, তবে সাধু পুরুষ বাহ্য পুরুষের ঐ আক্রমণকে কখনও সহ্য করে না।

পরৈঃ পরিভবে প্রাপ্তে বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম।

পরস্পরবিরোধে তু বয়ং পঞ্চ শতং তু তে॥ (বন) ২৪৩।৩

—অন্যের দ্বারা পরাভবের সময় আমরা একশ পাঁচ ভাই, আর আমাদের মধ্যে যখন বিরোধ হবে, তখন আমরা পাঁচ ভাই ওরা শত ভাই।

এ ক্ষেত্রে ভীম ও যুধিষ্ঠিরের দুই বিভিন্ন ছবি ফুটে উঠেছে। ভীমের আচরণ পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মত। যুধিষ্ঠির মহত্তর চরিত্রের।

যখন ভীম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে উপরোক্ত কথা হচ্ছিল, তখন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের বিলাপ শুনতে পেলেন। দুর্যোধন বিলাপ করতে করতে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে গন্ধর্ব তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে ও তাঁর ভ্রাতৃবধূদের হরণ করেছে।

ঐ সঙ্কটে যুধিষ্ঠির চরিত্রের আর একটি দিক পাঠকের সামনে কবি খুলে দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির বিস্মৃত হননি যে তাঁর ভ্রাতারা ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের দ্বারা নানা ভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত। তাঁরা

সবাই এজন্য ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ। ঐ সময়েও ভীম এক এক করে দুর্যোধনের সব দুষ্কৃতি যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির প্রধান সেনানায়কের ন্যায় তাঁর ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ সৈন্যকে উদ্বুদ্ধ করে গন্ধর্বের সঙ্গে রণে পাঠাতে সক্ষম হন।

যুধিষ্ঠিরানুগত ভীমার্জুন গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে দুর্যোধন প্রভৃতি ও পুরনারীদের উদ্ধার করেন। দুর্যোধন মুক্ত হলে যুধিষ্ঠির তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ—

মা স্ম তাত পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।

ন হি সাহসকর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত॥ (বন) ২৪৬।২২

—হে ভারত, পুনরায় এই রকম হঠকারিতা করবে না। হঠকারিগণ কখনও সুখী হয় না।

এখন ইচ্ছানুসারে গৃহে গমন কর। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে লজ্জিত ভাবে নগরের দিকে চলতে লাগলেন।

পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে বাস করছিলেন। কর্ণ দিগ্বিজয় করে দুর্যোধনের জন্যে অনেক ধন আহরণ ও অনেক রাজাকে বশীভূত করেন। কর্ণের ইচ্ছানুসারে দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ করবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু বেদসিদ্ধ দ্বিজগণ দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নন বলে তাঁকে বৈষ্ণবযজ্ঞের উপদেশ দেন। তদনুসারে মহাসমারোহে বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পন্ন হলো। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি মহানন্দে মিলিত হলে, কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি অর্জুনকে বধ করে ও অন্যান্য পাণ্ডবদের বধ করে দুর্যোধনের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা করবেন। দূতমুখে এ প্রতিজ্ঞার খবর যুধিষ্ঠিরের কানে পৌঁছে। এতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। চিন্তান্বিত হয়ে পাণ্ডবরা দ্বৈতবন ত্যাগ করে কাম্যকবনে প্রস্থান করেন। দ্বৈতবনের মৃগরাও যুধিষ্ঠিরকে স্বপ্নে তাদের এরূপ ইচ্ছা জানিয়েছিল।

বনে বনে পরিভ্রমন করে পাণ্ডবদের বনবাসের এগার বছর

অতিবাহিত হলো। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীর দুঃখ কষ্ট দেখে এবং নিজেই তাঁদের সে দুঃখের কারণ চিন্তা করে মনে মনে দুঃখ অনুভব করতে থাকেন। কৌরবদের দৌরাত্ম্য ও কর্ণের কর্কশ ভাষা যুধিষ্ঠিরের অন্তরে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হওয়ায়, তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করতে থাকেন। দ্রৌপদী ও ভ্রাতাগণ, বিশেষতঃ ভাই ভীম যুধিষ্ঠিরের অবস্থা ও মুখ দেখে সব দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করছিলেন। যখন পাণ্ডবরা এইভাবে দিন যাপন করছিলেন, তখন একদিন সেই স্থলে ব্যাসদেব পাণ্ডবদের দর্শন দিলেন। যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনার পর বনবাসের কৃচ্ছ্রতায় পৌত্রদের কৃশাঙ্গ দেখে যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে বলেন—

মনুষ্যলোকে তপস্যা ব্যতীত কেউ মহাসুখ লাভ করতে পাবে না। সুখ ও দুঃখ মানুষের কাছে পর্য্যায়ক্রমে আসে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জগতে কেউ পায় না। উত্তম জ্ঞানী পুরুষ নিজ জ্ঞানবলে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাকে জেনে সুখের উদয়ে আত্মহারা হন না, বা দুঃখের জন্য শোক করেন না।

তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ।
নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত ॥
সত্যমার্জবমক্রোধঃ সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥
অনসূয়াবিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
পাবনানি মহারাজ নরাণাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥ (বন) ২৫৯।১৬-১৮

—তপস্যা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তপস্যার দ্বারা সব কিছুই পাওয়া যায়। সত্য, সরলতা, ক্রোধশূণ্যতা, (দেবতা ও অতিথিকে দিয়ে অন্নাদি গ্রহণ করা—আর্যশাস্ত্রের মতে) দম, শম, অনুসূয়া, অহিংসা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই সমুদয় সদ্‌গুণ পুণ্যকর্মা মানুষকে পবিত্র করে।

ইহলোকের কর্মের ফলভোগ পরলোকে হয়। অতএব শরীরকে তপস্যা ও নিয়মে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। সত্যবাদী পুরুষ দীর্ঘ আয়ু, সুখ ও সরলতা লাভ করে। ক্রোধহীন, অপরের দোষ যে

দেখে না সে পরমানন্দ লাভ করে।

তখন যুধিষ্ঠির মহামুনিকে জিজ্ঞেস করেন—দান, ধর্ম, তপস্যা- এ তিনের মধ্যে কোনটি পরলোকে অধিক সুখ দেয় বা কোনটি অধিক দুষ্কর।

মুনি উত্তর দিলেন—

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে॥
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে।
প্রবিশন্তি নরা বীরাঃ সমুদ্রটবীং তথা॥ (বন) ২৫৯।২৮-২৯

—হে পুত্র, দান হতে দুষ্কর পৃথিবীতে অন্য কিছু নেই, কারণ অর্থে মানুষের মহতী তৃষ্ণা, এবং উহা লাভ করা কষ্টসাধ্য। প্রিয় প্রাণের মমতা ত্যাগ করে মানুষ ধনের জন্য সমুদ্রে বা অরণ্যে ছোটে।

সেজন্যে দুঃখে লভ্য জিনিষ ত্যাগ করা খুবই কঠিন। অতএব দান তপস্যা হতেও দুষ্কর। তখন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে দান সম্বন্ধে আরও অনেক সারগর্ভ কথা বলেন। পরিশেষে তিনি মুদ্গল ঋষির উদাহরণ দিয়ে বলেন যে বিশুদ্ধ মনে যদি সৎপাত্রে উপযুক্ত সময়ে অল্প কিছুও দান করা যায়, তা মৃত্যুর পর অনন্ত ফল দান করে। যুধিষ্ঠির তারপর মুনিবর হতে মুদ্গল ঋষি এক দ্রোণ ধান কেন কাকে এবং কোন বিধি অনুসারে দান করেছিলেন তা জানতে চাইলেন। মুনিবর যুধিষ্ঠিরের কাছে মুদ্গল আখ্যান বর্ণনা করে বলেন যে নিজে উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করে দিনে যা তাঁর প্রাপ্তি হতো তা দিয়ে তিনি অতিথি সেবা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতেন। এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সপরিবারে এক পক্ষ পরে একবার ভোজন করতেন। পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন অন্যকে শুদ্ধচিত্তে দান করা খুবই দুষ্কর কার্য্য। দুর্বাসামুনি মহাত্মা মুদ্গলকে পরীক্ষাচ্ছলে তাঁর কাছে অন্ন প্রার্থী হলেন। মহাত্মা মুদ্গল শুদ্ধান্তকরণে নির্মলভাবে ছয় ছয়বার অতিথি দুর্বাসার সৎকার

করবেন। দুর্বাসা খুসী হয়ে মুদ্‌গলকে বললেন তাঁর মত মাৎসর্যশূন্য দাতা জগতে নেই। তাঁর কাছে আরও অন্যান্য সদ্‌গুণ যথা ইন্দ্রিয় জয়, দম, শম, সত্য, স্বধর্ম প্রভৃতি সবই বিদ্যমান। অতএব তিনি সশরীরে স্বর্গে যাবেন। দুর্বাসা মুনি এই শুভেচ্ছা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ হতে বিমানে দেবদূত মুদ্‌গলকে স্বর্গে নিয়ে যেতে উপস্থিত হলেন।

যখন দেবদূত মুদ্‌গলকে বিমানে চড়তে অনুরোধ করলেন মুদ্‌গল দেবদূতকে জিজ্ঞেস করেন, স্বর্গবাসে কি কি গুণ, কি তপস্যা ও কিরূপ বিচার বুদ্ধি লাভ হয়? স্বর্গে সুখ কিরূপ, তার দোষই বা কি? মুদ্‌গল আরও বলেন, এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করবেন। মুদ্‌গল দেবদূতকে উপরোক্ত প্রশ্ন করলে দেবদূত বলেন,—

স্বর্গে এক সুবর্ণময় পর্বতরাজ আছে, নাম সুমেরু। সেখানে দেবতাগণের নন্দনকানন বিরাজ করছে। সেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, গ্লানি বা ভয় কিছুই নেই। অশুভ বস্তু সেখানে কিছু নেই, মনোহর গন্ধদ্রব্য, শ্রুতিমধুর সঙ্গীতে ঐস্থান পরিপূর্ণ, জরা, শোক বা বিলাপ নেই। সেখানে শরীর হতে ঘর্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয় না, সেখানে সুগন্ধি মাল্য কখনো মলিন হয় না। জরা, মৃত্যু, হর্ষ, প্রীতি সুখাদি বিকার সেখানে নেই। অতঃপর দেবদূত বললেন নানারূপ স্বর্গসুখ ও স্বর্গের গুণের কথা বললাম এখন দোষের কথা বলছি।

কৃত পুণ্যকর্মের ফল ভোগের জন্য মানুষ স্বর্গলাভ করে। স্বর্গে কোন রকম নতুন কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না। স্বর্গ সুখময়, মর্ত্যে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তা মূলধন করে স্বর্গসুখ লাভ করা হয়। কিন্তু স্বর্গ সুখভোগ অক্ষয় নয়, যখন সেই মূলধনের শেষ হয় তখন স্বর্গ হতে পতন ঘটে। এই পতন অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মহাভাগ্যবান ব্যক্তি সুখী হয়ে পুনঃ মর্তে জন্ম নেয়। কিন্তু স্বকর্তব্য সম্বন্ধে

সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না বলে অধমযোনিতে গমন করে।

দেবদূতের মুখে স্বর্গের দোষের কথা শুনে মুদ্গল স্বর্গলোকে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দেবদূতকে ফিরিয়ে দেন। তিনি শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে নিত্য ভগবদ্গত হয়ে অবস্থান করতে থাকেন ও তপস্যার বলে অনুত্তমা বুদ্ধি লাভ করেন।

উপাখ্যান শেষ করে বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে শোক করা উচিত নয়। তপস্যার দ্বারা তিনি পুনরায় রাজ্যলাভ করবেন।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্য্যায়েণোপসর্পন্তে নরং নেমিমরা ইব॥ (বন) ২৬১।৪৯

—চক্রের বক্রকাঠিগুলি যেমন চাকাপ্রান্তে পর্য্যায়ক্রমে আসে সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ মানুষের জীবনে আসে।

এই উপদেশ দিয়ে পরমজ্ঞানী বেদব্যাস তপস্যা করবার জন্যে নিজ আশ্রমে গমন করেন।

বনবাসকালীন পাণ্ডবদের বিনাশসাধন করবার জন্যে দুর্যোধন অন্য এক অভিসন্ধি করলেন। মুনি দুর্বাসাকে তুষ্ট করে তিনি মুনির কাছে এ বর প্রার্থনা করেন যে তিনি তাঁর দশহাজার শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজন শেষ হবার পরে একদিন যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করবেন। মুনি দুর্যোধনকে "তথাস্তু" বলে চলে গেলেন। সত্যি একদিন দুর্বাসা মুনি তাঁর দশ হাজার শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজন শেষে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য প্রার্থনা করেন। যুধিষ্ঠির যথারীতি মুনিকে আসন পাদ্য দিয়ে স্বাগত জানাবার পর তাঁকে শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আসতে অনুরোধ করেন। এদিকে দ্রৌপদী অসময়ে দুর্বাসার আগমনে বড়ই বিব্রত বোধ করে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন।

ভক্তবৎসল দেবকীনন্দন ভক্তের ডাকে হাজির হয়ে দ্রৌপদীর সঙ্কটমোচন করেন এবং সহদেবকে বললেন মুনিদের ভোজনের জন্য

আহ্বান কর। সহদেব মুনিদের ডাকতে গিয়ে তাঁদের কোথাও দেখতে পেলেন না। নিশীথবাতে এসে হয়ত তাঁরা পুনরায় তাঁদের ছলনা করবেন এ আশঙ্কা কবে পাণ্ডবরা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদেব এ অবস্থা জেনে কৃষ্ণ পুনরায় তাঁদের দর্শন দিয়ে বললেন, দুর্বাসা হতে তাঁদের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাণ্ডবরা নিশ্চিন্ত হলেন এবং কৃষ্ণ দ্বাবকাতে ফিরে গেলেন।

কাম্যকবনে অবস্থানকালে একদিন পঞ্চ ভ্রাতা মৃগযার জন্যে গমন করেন। পুবোহিত ধৌম্য ও তৃণবিন্দুর অনুমতি নিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্রমে একাকিনী বেখে গেলেন। এদিকে সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে দ্রৌপদীকে বল পূর্বক হরণ করেন। ধৌম্য জয়দ্রথকে এহেন পাপকর্ম করতে বারণ করেন। কিন্তু জয়দ্রথ কর্ণপাত না করে চল্‌তে থাকেন এবং পুরোহিত ধৌম্য তাঁদের অনুগমন করতে থাকেন। অতঃপর পাণ্ডবরা মৃগয়া হতে ফিবে দ্রৌপদীকে হরণের খবর পেয়ে জয়দ্রথের পশ্চাদধাবন করেন। দ্রৌপদীর ধাত্রী তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং দ্রৌপদী সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা করে নানা কুলক্ষণে কথা বলছিলো।

যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে ধাত্রীকে তার জিহ্বা সংযত করতে বলেন এবং দ্রৌপদী সম্বন্ধে কোনরূপ অপ্রিয কথা বলতে বারণ করেন। যে-ই দ্রৌপদীকে হরণ করুক না কেন, তাকে আজ নিজ প্রাণ হতে বঞ্চিত হতে হবে। পাণ্ডবরা অবলীলাক্রমে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেন এবং জযদ্রথকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত করবার পূর্বে ভীম জয়দ্রথকে ভালরূপে নিগৃহীত কবেন। যুধিষ্ঠিব জয়দ্রথের অবস্থা দেখে উচ্চহাস্যে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও'। তিনি জযদ্রথকে লক্ষ্য কবে বললেন, তোমাকে দাসত্ব হতে মুক্ত করে দিলাম।

জয়দ্রথকে মুক্তি দিয়ে যুধিষ্ঠিব বলেন ঃ—

অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ ক্বচিৎ।

স্ত্রীকামং বা ধিগস্তু ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহাযবান্ ॥
এবংবিধং হি কঃ কুর্য্যাৎ ত্বদন্যঃ পুরুষাধমঃ।
কর্ম ধর্মবিরুদ্ধং বৈ লোকদুষ্টং চ কর্ম তে ॥ (বন) ২৭২।২১-২২

—(জয়দ্রথ) দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে তুমি যাও, পুনরায় এইরূপ কার্য কখনও করবে না। তুমি স্ত্রীকামী, নীচ ও নীচসংসর্গকারী, তোমায় ধিক্। তোমার মত নীচ ছাড়া এরূপ কার্য্য আর কে করবে? তোমার কার্য্য যেমন ধর্ম বিরুদ্ধ তেমনি লোকনিন্দিত।

জয়দ্রথের প্রতি এই উদারতা প্রদর্শনের মধ্যেও যুধিষ্ঠিরের মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে। পাপিষ্ঠ জয়দ্রথকে বধ করে ভগ্নীর বৈধব্য তিনি ইচ্ছা করেননি। তাই জয়দ্রথ সেই যাত্রায় যুধিষ্ঠিরের দয়ায় প্রাণ নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

এইরকম ক্ষমার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। তিনি যেন ধৈর্য্যের ও ক্ষমার জাগ্রত প্রতিমূর্তি। তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি অতি বিরল।

জয়দ্রথকে পরাজিত করে ও দ্রৌপদীকে উদ্ধার করে পাণ্ডবগণ তাঁদের কুটীরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে মহর্ষিরাও উপস্থিত ছিলেন এবং পাণ্ডবদের পর পর সঙ্কটের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তথায় উপস্থিত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে উদ্দেশ্য করে যুধিষ্ঠির বললেন যে তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। যুধিষ্ঠিরের মনে এক সন্দেহ উদয় হয়েছে। সে সন্দেহ ভঞ্জনের প্রার্থনা করে মুনিকে বলেন, দ্রৌপদী অযোনিজা, যজ্ঞের বেদিমধ্য হতে উৎপন্না, দ্রুপদ কন্যা ও পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধর্মজ্ঞা, ধর্মচারিণী। তাঁদের এইরূপ পত্নীকে দুষ্টবুদ্ধি জয়দ্রথ কি করে স্পর্শ করতে সক্ষম হলো? এটা যেন শুদ্ধাচারী পুরুষের উপর চুরির বা মিথ্যার অপবাদ।

যুধিষ্ঠিরের মতে কাল ভগবান ও বিধি নির্দিষ্ট দৈবই প্রবল। তাঁর মন্দ ভাগ্যের মত অন্য কোন পুরুষের ভাগ্যের কথা মুনি কখনো শুনেছেন কিনা তিনি জানতে চাইলেন।

উত্তরে মুনিবর যুধিষ্ঠিরকে বাল্মিকী রচিত রামের সমস্ত জীবন-কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন। উপসংহারে তিনি বললেন, রামের কষ্টের তুলনায় যুধিষ্ঠিরের এ কষ্ট অণুমাত্র নয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে শোক করতে বারণ করেন। মুনির আশ্বাসে যুধিষ্ঠির বলেন, তিনি তাঁর জন্যে শোক করছেন না, তাঁর শোকের কারণ দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদী। তখন মুনি কুলস্ত্রীগণের ভাগ্যের কথা শোনবার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করেন এবং সাবিত্রী সত্যবানের উপখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করেন। উপাখ্যান শেষ করে মুনি যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে বলেন যে তাঁদের পত্নী সুশীলা ও কল্যাণী দ্রৌপদী সাবিত্রীর ন্যায় তাঁদের সকলকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। মুনির কথায় আশ্বস্ত হয়ে পাণ্ডবরা কাম্যকবনে বাস করতে থাকেন। এ সময়ে পাণ্ডবরা ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ ও কর্ণকে ইন্দ্রের অমোঘ শক্তি দানের কথাও শুনতে পেলেন।

কাম্যকবন থেকে পাণ্ডবরা পুনরায় দ্বৈতবনে ফিরে গেলেন। সেখানে বাসকালে জনৈক তপস্বী ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের সাহায্য প্রার্থনা করে জানালেন যে তাঁর অরণীর সহিত মন্থনদণ্ড কোন বৃক্ষে ঝোলানো ছিল। কোন মৃগের শৃঙ্গে আটকিয়ে গেলে সে মৃগ অতি দ্রুত অরণীর সহিত মন্থনদণ্ড নিয়ে আশ্রম থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তপস্বী যুধিষ্ঠিরকে মন্থনদণ্ড উদ্ধার করে দিতে অনুরোধ করেন, নতুবা তাঁর অগ্নিহোত্র লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাদের সঙ্গে ধনু নিয়ে মৃগের পশ্চাতে ছুটতে থাকেন। সেই মৃগের প্রতি পাণ্ডবরা নানা রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাকে বাণবিদ্ধ করা সম্ভব হলো না। চেষ্টা সত্ত্বেও সেই মৃগের কোন সন্ধানও আর পাওয়া গেল না। তাতে পাণ্ডবরা খুবই দুঃখিত হলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অনুভব করলেন।

এই সময়ে নকুল যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এরূপ ধর্ম-সংকটে কেন পড়লেন যদিও তাঁরা কোনদিন ধর্ম বিসর্জন দেননি বা আলস্যের দ্বারা কখনো অর্থলোপ ঘটাননি বা কোনদিন প্রার্থীকে বিমুখ করেননি।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন যে আপদ বিপদের সীমা নেই, না আছে কারণ বা না আছে নিমিত্ত। পুর্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফল, ধর্মই এ জন্মে দুঃখ ও সুখ রূপে ভাগ করে দেন।

ভীম বলেন এ ধর্ম সঙ্কটের কারণ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে এনেছিল তখন তাকে বধ না করা, অর্জুন বলেন, কর্ণ যখন দ্রৌপদীর প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করছিল তখন তাকে বধ না করা এবং সহদেব বলেন শকুনি যখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশায় পরাজিত করে তখন তাকে অব্যাহতি দেওয়া ধর্ম সংকটের কারণ।

যুধিষ্ঠির কোন উত্তর না দিয়ে নকুলকে নিকটে কোন জলাশয় বা জলাশয় সূচক কোন চিহ্ন পাওযা যায় কিনা দেখতে বললেন। নকুল অদূরে বৃক্ষ ও সারস পাখীর ডাক শুনে জলাশয়ের সম্ভাবনা জানালেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে তূণগুলি ভবে জল আনতে বলেন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশ শিরোধার্য্য করে নকুল জলাশয় হতে জল আনতে গেলেন। তিনি সম্মুখে জল দেখে জলপান করতে উদ্যত হলে অন্তরীক্ষ হতে এক বাণী তাঁকে জলপান করতে বারণ করেন। কারণ ঐ সরোবর পূর্ব হতে তাঁর অধিকারে। সেই বাণী নকুলকে বলেন, প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জলপান কর ও জল নিয়ে যাও।

নকুল ঐ নিষেধ অগ্রাহ্য করে সুশীতল জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হযে মাটিতে পড়ে গেলেন। ঐরূপ অশরীরি বাণীর নিষেধ অমান্য করে সহদেব, অর্জুন, ও ভীম জল পান করে অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

যুধিষ্ঠির কোন ভ্রাতাকে জল নিয়ে ফিরতে না দেখে অত্যন্ত

চিন্তিত হয়ে এবং ব্যথিত চিত্তে সেই জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। সরোবরের তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন তাঁর বীর পরাক্রমশালী ভ্রাতৃবৃন্দ জলাশয়ের তীরে স্থানভ্রষ্ট লোকপালদের মত পড়ে আছে। এ দৃশ্যে তিনি মর্মাহত হয়ে শোক ও বিলাপ করতে থাকেন। সবোবরে মৃতপ্রায় চার ভ্রাতাকে দেখে ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ—

এক আত্মা এই মোবা পঞ্চ সহোদর ॥
দুঃখেব উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে যে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল ॥
... ...
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে॥
... ...
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥ (বন)

ভ্রাতাদের মৃত্যুতে তিনি দেহত্যাগ করবার বাসনা করলেন। ভ্রাতাদের জন্য তাঁর এই শোক পবিত্র ও অকৃত্রিম।

রামের মধ্যেও বার বার ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। লঙ্কায় শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, তিনিও জীবন ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। দুই মহাকাব্যের নায়কের চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেমেব সুন্দর অভিব্যক্তি বার বার ফুটে উঠেছে।

তিনি কিছুই স্থিব করতে পারলেন না তাঁর এমন বীর ভ্রাতাদের এভাবে কে বশীভূত করেছে। তিনি দেখলেন কারো শরাসন ভগ্ন হয়নি, কারো শবীরে কোন ক্ষতের চিহ্ন নেই। কে তাদের পরাজিত করে ভূতলে নিপাতিত করেছে? এ ব্যাপার কোন গূঢ় রহস্যাবৃত। তিনি এর কারণ চিন্তা করতে থাকেন এবং জলপান করে স্থির হয়ে এর কারণ নির্ণয় করবেন স্থিব করলেন।

তিনি প্রথমে জল পরীক্ষা করলেন। ভ্রাতাদের সকলের মুখ

অবিকৃত ও প্রসন্ন দেখলেন। তখন তিনি স্থির করলেন যম ভিন্ন অন্য কারো সাধ্য নয় তাঁর ভ্রাতাদের বধ করা।

যুধিষ্ঠির জলপানের নিমিত্ত জলে নাবতেই যক্ষ বললেন, আমি বক। শৈবাল ও মৎস্যভোজী। (অহং বকঃ শৈবলমৎস্য ভক্ষো)। আমিই তোমার অনুজদেব বিনাশ কবেছি। তুমিও অনুরূপ মৃত্যুর বশীভূত হবে, যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও। এ সরোবর পূর্ব হতে আমার অধিকারে। কুন্তীনন্দন, আমার প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্বে দাও, পরে জলপান কর ও জল নিয়ে যাও।

উত্তরে যুধিষ্ঠির যক্ষের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। যুধিষ্ঠিব বলেন, 'তুমি' বক হতে পার না। যেহেতু কোন পক্ষীর পক্ষে পর্বতের ন্যায় তাঁর চার ভ্রাতাকে বধ করা সম্ভব নয়।

যক্ষ বললেন, তিনি যক্ষ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রশ্নেব উত্তর দিয়ে জলপান করতে ও জল নিতে বললেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, তিনি তাঁর বুদ্ধি অনুসারে যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং যক্ষকে প্রশ্ন করতে বলেন।

যক্ষ—কে সূর্যকে উদিত করে? কারা সূর্য্যের চারদিকে বিচরণ করে? কে তাঁকে অস্ত গমন করায়? কোথা ইনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির—ব্রহ্মাই সূর্য্যকে উদিত করান। দেবতাগণ তাঁর পাশে বিচরণ করেন। ধর্মই তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

য—শ্রোত্রিয় হয় কি ভাবে? কিসে মহৎ হওয়া যায়? কিসে দ্বিতীয়বান হয়? কিসে বুদ্ধিমান হওযা যায়?

যু—শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা মানুষ শ্রোত্রিয় হয়। তপস্যার দ্বারা মহত্ত্ব অর্জন করা যায়। ধৈর্য্যের দ্বাবা দ্বিতীয়বান হওযা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিকে সেবা করে মানুষ বুদ্ধিমান হয়।

য—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি? সৎপুরুষের ধর্মের মত ধর্ম কি? মনুষ্যভাবই বা কি? অসাধুভাব কি?

যু—স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের দেবত্ব। তপস্যাই তাঁর সৎপুরুষেব গুণ। মরণই তাঁর মনুষ্যভাব। পরনিন্দা তাঁর অসৎ পুরুষের কাজ।

য—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সৎ ব্যক্তির মত তাঁদের ধর্ম কি? ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মানুষের ভাব কি? তাঁদের অসৎ পুরুষোচিত লক্ষণ কি?

যু—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব ধনুর্বাণ। যজ্ঞই তাঁদের সৎপুরুষোচিত ধর্ম, ভয়ই তাঁদের মানুষোচিত ভাব, শরণাগতকে পরিত্যাগ করাই অসৎ পুরুষোচিত ভাব।

য—এমন লোক কে যে বুদ্ধিমান, লোকপূজিত, সর্বপ্রাণীর দ্বারা সম্মানিত, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের ভোগে রত, ও শ্বাস প্রশ্বাসও নিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়?

যু—যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপুরুষদের—এই পাঁচজনকে নির্বপণ (অর্থাৎ দান ও পিণ্ডদ্বারা পোষণ করে না) করে না, সে ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত।

য—পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ হতে উচ্চতর কি? বায়ুব চেয়ে শীঘ্রগামী কে? তৃণেব চেয়ে কোন বস্তু সংখ্যায় বহু?

যু—মাতা পৃথিবীর চেয়েও গুরুতর। পিতা আকাশ হতে উচ্চতর, মন বায়ু হতে শীঘ্রগামী। চিন্তা তৃণ হতে বহুতর।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ॥ (বন) ৩১৩।৬০

য—কে ঘুমালেও চোখ বুজে না? কোন বস্তু জন্মেও নড়ে চড়ে না? কাব হৃদয় নেই? কি বেগে বাড়তে থাকে?

যু—মাছ ঘুমালেও চোখ বুজে না। অণ্ড জন্মেও নড়ে না, পাথবের হৃদয নেই। নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

য—প্রবাসে মিত্র কে? গৃহে মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? মুমূর্ষুর মিত্র কে?

যু—প্রবাসে মানুষের মিত্র সঙ্গী, গৃহস্থের মিত্র ভার্য্যা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, মুমূর্ষুর মিত্র দান।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।

আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥ (বন) ৩১৩।৬৪

য—সকল প্রাণীর অতিথি কে? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি বস্তু? এই জগতের স্বরূপ কি?

যু—সকল প্রাণীর অতিথি অগ্নি। ধর্মই সনাতন ধর্ম। গরুর দুধই অমৃত। অবিনাশী বায়ুই সমস্ত জগতের স্বরূপ।

য—কে একা বিচরণ করে? জাত হয়ে কে পুনঃ জন্মায়? হিমের ঔষধ কি? মহাক্ষেত্র কি?

যু—সূর্য্য একা বিচরণ করে। চন্দ্রই পুনরায় জন্মে। হিমের ঔষধ অগ্নি। পৃথিবীই মহাক্ষেত্র।

য—কাকে বর্জন করে মানুষ প্রিয় হয়? কি বর্জন করলে শোক করে না? কাকে বর্জন করে অর্থশালী হয়? কাকে ত্যাগ করে সুখী হয়?

যু—মান ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয়। ক্রোধ পরিত্যাগ করলে মানুষ শোক করে না। কাম ত্যাগে মানুষ বিত্তবান হয়। লোভ ত্যাগ করে সুখী হয়।

য—কি প্রকার মানুষকে মৃত বলা হয়? কোন রাষ্ট্রকে মৃত বলে? কিরূপ শ্রাদ্ধকে মৃত বলে? কিরূপ যজ্ঞকে মৃত বলা হয়?

যু—দরিদ্রকে মৃত বলা হয়, অরাজক রাষ্ট্রকে মৃত রাষ্ট্র বলা হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধকে মৃত বলে, দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞকে মৃত বলে।

য—অক্ষয় নরক কে পায়? শীঘ্রই আমার এ প্রশ্নের জবাব দাও।

যু—যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে যে পরে 'নেই' বলে ফিরিয়ে দেয়, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরক ভোগ করে।

যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের প্রতি কপট আচরণ করে, সে অক্ষয় নরক ভোগ করে।

ধন থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ধন দান ও ভোগ করতে অনীহা প্রকাশ করে ও 'নেই' বলে প্রত্যাখ্যান করে সে অক্ষয় নরক ভোগ করে।

য—কে সুখী? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তা কি?

আমার এ চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর।

যুধিষ্ঠির বললেন—

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্তু দর্বীপরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥ (বন) ৩১৩।১১৫-১১৮

—যে ব্যক্তি অঋণী এবং প্রবাসী ও নয়, পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে নিজের গৃহে বসে শাকান্ন পাক করে খায়, সে-ই সুখী।

(কোন কোন বইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনের স্থানে দিনের অষ্টম ভাগে পাঠ ও আছে)। প্রতিদিন মানুষকে মৃত্যু মুখে পতিত হতে দেখেও, অবশিষ্ট লোক চিরকাল বেঁচে থাকবার আকাঙ্খা করে, এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে? শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা বা অবস্থান নেই, শ্রুতি সমূহ পরস্পর বিরোধী, এমন

একজন ঋষি বা বেদজ্ঞ নেই যাঁর মত অকাট্য বলে গ্রহণীয়। ধর্মের তত্ত্ব অতীব গূঢ়। অতএব মহাজন যে পথে গমন করেছেন উহাই পথ।

এই মহামোহময় সংসার কড়াইতে কাল মর্ত্ত্যের প্রাণীকে রান্না করছে, সূর্য্য তার অগ্নি, রাত্রি দিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার দর্বী বা হাতা, এটাই বার্ত্তা।

য—তুমি এ যাবৎ আমার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ। এখন তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী কে ?

যু— দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনী নরঃ॥ (বন)

৩১৩।১২০-১২১

—যে পুরুষের পুণ্য কাহিনী যদ্দিন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে ঘোষিত থাকে তদ্দিনই সেই পুরুষকে পুরুষ বলা যেতে পারে। যার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সব কিছু সমান, সে-ই শ্রেষ্ঠ ধনী।

যক্ষ তখন বললেন, হে রাজন, তুমি পুরুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর যে ব্যাখ্যা করেছ তাতে অতীব প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এ বর দিচ্ছি, তুমি ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজনকে চাইলে সে বেঁচে উঠবে।

যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন ভিক্ষা চাইলে ধর্ম ভীমার্জুনের অমিত পরাক্রমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের মনোযোগ আকৃষ্ট করে আপন ভ্রাতাদের অপেক্ষা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের প্রাণ ভিক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করলে যুধিষ্ঠির বলেন—

নকুল ও সহদেব মোর প্রাণধন॥
... ...
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দেবে॥

সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা ধর্ম্ম একেবারে যায়॥ (বন)

যুধিষ্ঠির আরও বললেন, ধর্ম নষ্ট হলে, নষ্ট ধর্ম ধার্মিককেও নষ্ট করে। অন্য পক্ষে ধর্ম যদি রক্ষিত হয়, তবে তা ধার্মিককেও রক্ষা করে। ধর্মনষ্ট হয়ে আমি বিনষ্ট হই, এটা আমার কাম্য নয়। আমি ধর্ম ত্যাগ করবো না। সকলে আমাকে ধার্মিক বলে জানে। অতএব আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। অতএব উভয়েই পুত্রবতী থাকুন। এ জন্য নকুলের প্রাণ চাই।

তখন যক্ষ বললেন, যখন তোমার কাছে দয়া ও সমতা শ্রেষ্ঠ, তখন তোমার সব ভাই-ই বেঁচে উঠুক।

বৈমাত্রেয় ভাইদের অভাবে তাদের মাতৃকুলে পিণ্ড দেবার কেউ থাকবে না। এতটা দূরদর্শিতা, এতটা উদারতা একমাত্র যুধিষ্ঠিরেই সম্ভব। এইভাবে প্রতি কাজে তিনি পুংখানুপুংখ রূপে ধর্মাধর্মের বিচার করে যেন প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতেন।

যক্ষের ইচ্ছানুসারে যুধিষ্ঠিরের চার ভ্রাতাই প্রাণ ফিরে পেলেন। তাঁরা যেন নিদ্রা হতে জাগলেন ও তাঁদের দেহে কোন বৈকল্য প্রকাশ পেল না।

তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন তিনি কখনো যক্ষ নন। তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে যক্ষ আত্ম পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি তাঁর পিতা ধর্মরাজ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দয়া ও সমতা দেখে পরম সন্তোষ লাভ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বর দিতে ইচ্ছা করলে যুধিষ্ঠির তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণিকাষ্ঠ ও মন্থনদণ্ডের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করেন।

যক্ষ বললেন যে মৃগরূপ ধরে তিনিই অরণি মন্থন কাষ্ঠটি হরণ করেছিলেন কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কাছে আনবার উদ্দেশ্যে। ধর্ম যথারীতি তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণি ও মন্থনদণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে

যুধিষ্ঠিরকে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলেন।

যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করে বলেন যে তাঁদের অজ্ঞাতবাস ত্রিলোকের কেহ যেন জানতে না পারে। ধর্ম বললেন 'তাই হোক'। তিনি আরও বলেন যে তাঁর প্রসাদেই পাণ্ডবরা ত্রয়োদশ বর্ষে বিরাটনগরে প্রচ্ছন্নভাবে অজ্ঞাতবাস করবেন। অজ্ঞাতবাস সময়ে তাঁরা মনে মনে যে যেরূপ ধরবেন বলে সঙ্কল্প করবেন, ইচ্ছা-মত তাঁরা সে সেইরূপ ধারণ করতে পারবেন।

ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে আরও একটি বর প্রার্থনা করতে বলেন। যুধিষ্ঠির চাইলেন যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে তিনি সর্বক্ষণ জয় করতে পারেন এবং দান তপস্যা ও সত্যে যেন তাঁর মতি সতত নিযুক্ত থাকে।

যক্ষ বললেন, তুমি ধর্ম স্বরূপই। তুমি স্বভাবতই এই সব গুণে মণ্ডিত। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এরপর ধর্ম যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল কামনা করে অন্তর্হিত হলেন।

পাণ্ডবদের বনবাসের বার বছর উত্তীর্ণ হতে চলেছে। অজ্ঞাত-বাসের কাল আরম্ভ হবার মুখে প্রচ্ছন্নভাবে থাকার গ্লানির কথা স্মরণ করে, তাঁদের এরূপ দুরাবস্থার কারণ পুনরায় যুধিষ্ঠিরের মনে উদয় হলো। তাতে তিনি খুবই শোকাচ্ছন্ন হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বললেন, তিনি (যুধিষ্ঠির) বিদ্বান, সংযতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁর মত ব্যক্তি শোকে মুহ্যমান হন না। অতঃপর পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট কিরূপ ভাবে দেবতাগণও শত্রুদমন করবার জন্য বহুবার প্রচ্ছন্নভাবে থেকে বহু কষ্ট ভোগ করেছেন তার বর্ণনা করেন। ঐরূপ কষ্ট ভোগ করবার পর তাঁরা আপন আপন কাজ-সম্পন্ন করেছেন। সেই সব উপাখ্যান ধৌম্য যুধিষ্ঠিবকে বলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে বলেন অন্যান্য পাণ্ডবরা তাঁর মুখ চেয়ে বিনাশকারী কোন কাজ করেন নি। যুধিষ্ঠির তাঁর

অনুজদের যে কাজে নিযুক্ত করবেন তা সুসম্পন্ন না করে তাঁরা নিবৃত্ত হবেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। শত্রুকে তাঁরা জয় করবেনই।

ভীমের কথা শেষ হলে পাণ্ডবদের অনুগামী ব্রাহ্মণগণ তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

তখন পঞ্চপাণ্ডব ধৌম্য ও দ্রৌপদীকে নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন। এবং পরের দিন থেকে কিভাবে অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করবেন তার গোপন মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হলেন।

বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হলে, যুধিষ্ঠির অর্জুনকে এমন একটি স্থানের উল্লেখ করতে বললেন যেখানে তাঁরা অজ্ঞাতবাসের বছরটি অন্যের অজ্ঞাতে বাস করতে পারেন।

অর্জুন বললেন কয়েকটি রমণীয় ও সুরক্ষিত রাষ্ট্রের নাম করবো, আপনি সেগুলির মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্র পছন্দ করে নিন। কুরুদেশের চারদিকে প্রচুর খাদ্য সমৃদ্ধ, রমণীয় বহু জনপদ আছে—পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এর মধ্যে আপনার পছন্দ মত দেশে আমরা বাস করবো।

যুধিষ্ঠির বললেন, ধর্ম যা বলেছেন, তা সত্য হবে, তার অন্যথা হবে না। তথাপি বাসের জন্য অবশ্যই আমাদের সুন্দর, মঙ্গলময় ও সুখকর দেশ উত্তমরূপে আলোচনা করে স্থির করতে হবে। মৎস্য-রাজ পরাক্রমশালী, ধার্মিক, দাতা, বৃদ্ধ, সর্বদা প্রিয় কাজ করে থাকেন ও পাণ্ডবদের অনুরক্ত। আমরা এই বছরটি বিরাটরাজার রাজধানীতে তাঁর কাজ নিয়ে সেইখানে অবস্থান করবো। মৎস্য দেশে উপস্থিত হয়ে তাঁর যে যে কর্মভার আমরা বহন করবো, তা তোমরা স্থির কর।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁর রাজ্যে কি কাজ করবেন?

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি অক্ষ ক্রীড়াভিজ্ঞ দ্যূতপ্রিয় 'কঙ্ক' নামক ব্রাহ্মণ হয়ে বিরাট রাজার সভাসদ্ হব। বিরাট রাজা এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনার্থে মনোরম গুটি চালাব। কেউ আমাকে চিন্‌তে পারবে না। তবে আমি ঐ রাজাকে বলবো যে আমি পূর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রাণাধিক সখা ছিলাম। তারপর তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কি রকম ছদ্মবেশে বিরাট রাজ্যে বাস করবেন ?

ভীম জানালেন, তিনি 'বল্লব' নামক পাকশালাধ্যক্ষরূপে বিরাট রাজার প্রাসাদে থাকবেন। অর্জুন জানালেন, তিনি নপুংসক বেশে 'বৃহন্নলা' নাম নিয়ে বিরাট রাজার পুরনারীদের নৃত্যগীত ও বিবিধ বাদ্য শিক্ষা দেবেন। নকুল জানালেন, তিনি 'গ্রান্থিক' নামে পরিচিত হয়ে বিরাট রাজার অশ্ব রক্ষক হবেন। তিনি অশ্বরক্ষণে দক্ষ এবং জ্ঞানসম্পন্ন। অশ্বশিক্ষণে ও অশ্ব চিকিৎসাতেও পটু। তিনি আরও বলেন যে, তিনি বিরাটরাজাকে বলবেন পাণ্ডবরা আমাকে অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন। সহদেব বললেন, তিনি 'তন্তিপাল' নামে খ্যাত হয়ে বিরাট রাজার গো-নিয়ন্ত্রণ, গো-দোহন ও গো-পরিসংখ্যানে দক্ষ গো-পরীক্ষক হবেন। তিনি আরও বলেন যে যুধিষ্ঠির পূর্বে তাঁকে সর্বদাই গো-রক্ষায় নিযুক্ত করতেন। সেইজন্য সে-বিষয়ে সমস্ত কৌশল তাঁর জানা আছে। দ্রৌপদী বলেন, তিনি কেশবিন্যাস সুদক্ষা 'সৈরন্ধ্রী' বলে আত্মপরিচয় দেবেন। আরও বলেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলেন।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বললেন,

> কল্যাণং ভাষসে কৃষ্ণে কুলে জাতাসি ভামিনি।
> ন পাপমভিজানাসি সাধ্বী সাধুব্রতে স্থিতা ॥
> যথা ন দুর্হৃদঃ পাপা ভবন্তি সুখিনঃ পুনঃ।
> কুর্য্যাস্তৎ ত্বং হি কল্যাণি লক্ষয়েয়ুর্ন তে তথা ॥

(বিরাট) ৩।২২-২৩

—হে কৃষ্ণে তুমি উত্তম কুলে জন্মেছ। সুতরাং কল্যাণজনক কথাই বলেছ। তুমি পতিব্রতা, তুমি উত্তম নিয়মে অবস্থান কর, তুমি পাপ জান না। হে কল্যাণি, পাপমতি শত্রুবর্গ যাতে পুনরায় সুখী না হয়, যাতে তারা তোমাকে লক্ষ্য করতে না পারে তুমি সেইরূপ ভাবে অবস্থান করবে অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করবে।

অতঃপর যুধিষ্ঠির বললেন, পুরোহিত ধৌম্য পাকশালাধ্যক্ষ ও পাচকগণের সঙ্গে দ্রুপদ রাজার গৃহে গিয়ে তাঁদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করতে থাকুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণকে শূন্যরথ নিয়ে সত্বর দ্বারকায় প্রস্থান করতে বললেন। রমণীদের ও দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ সকলকেই পাচক ও পাকশালাধ্যক্ষের সঙ্গে পাঞ্চাল-রাজ্যেই যেতে নির্দেশ দেন। এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন পাণ্ডবদের সন্ধান জানে না, পাণ্ডবরা সকলেই তাঁদের ত্যাগ করে দ্বৈতবন হতে প্রস্থান করেছেন—এ রকম প্রচার করতে থাকে।

ধৌম্য মুনি পাণ্ডবদের রাজকুলে বাস, রাজসমীপে ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেন। এই ভাবে এক বছর ছদ্ম বেশে অজ্ঞাত বাস শেষ করে নিজ রাজ্য লাভ করে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করার নির্দেশ দেন।

যুধিষ্ঠির বললেন আপনি আমাদের উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। আপনার কল্যাণ হোক। আমাদের মাতা কুন্তী দেবী এবং মহামতি বিদুর ব্যতীত এরূপ উপদেশ দেওয়ার লোক আর নেই। এখন এই দুঃখ উত্তীর্ণ হবার জন্যে অজ্ঞাতবাস যাপনের জন্যে এবং জয় লাভের জন্য যা কর্ত্তব্য তা করুন। ধৌম্যও যাত্রাকালীন কর্ত্তব্য সমূহ যথাবিধি সম্পাদন করলেন।

দুর্গম পথ অতিক্রম করে বিরাট নগরের পথে চলতে চলতে দ্রৌপদী পবিশ্রান্ত হযে পড়েন। যুধিষ্ঠিবের নির্দেশে অর্জুন দ্রৌপদীকে বহন কবে নগবেব নিকট গিয়ে নামলেন।

রাজধানীব পথে যুধিষ্ঠিব অর্জুনকে বললেন, অস্ত্রগুলি কোথায়

রেখে নগরে প্রবেশ করব? অস্ত্র নিয়ে আমরা নগরে প্রবেশ করলে, জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ দেখা যাবে। এই অস্ত্রগুলি জনসাধারণের পরিচিত। এই গাণ্ডীব নিয়ে যদি আমরা রাজধানীতে প্রবেশ করি, তবে সকলেই আমাদের চিনতে পারবে। আমাদের মধ্যে একজনকেও যদি কেউ চিনতে পাবে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ কবতে হবে—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

অর্জুন শ্মশানের সন্নিকটে দুষ্প্রবেশ্য ও দুবারোহ একটি বৃহৎ শমীবৃক্ষে অস্ত্রগুলি বেঁধে রেখে নগরে প্রবেশ কোরবার প্রস্তাব করেন।

যুধিষ্ঠিবের নির্দেশে নকুল সেই শমীবৃক্ষে চড়ে স্বয়ং ধনুগুলি বৃক্ষের মধ্যভাগে যে স্থানে সোজাসুজি বৃষ্টি পড়ে না দেখলেন, সেই স্থানে সেই অস্ত্রগুলি দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ় ভাবে বেঁধে রাখলেন। পাণ্ডবরা একটি মৃত ব্যক্তির দেহও সেই সঙ্গে বেঁধে দিলেন। যাতে লোকেরা পূতিগন্ধ পেযে তথায় শব বাঁধা আছে মনে করে বৃক্ষটিকে দূর হতে পরিহার করে। শবদেহটি বৃক্ষে বেঁধে তাঁরা গোপালক ও মেষপালকদের কাছে প্রচার করলেন যে ইনি তাঁদের মাতা। তাঁব বয়স হযেছিল ১৮০ বৎসর। এটাই তাঁদের কুলধর্ম এবং পূর্বপুরুষরাও এই বৃক্ষে এইরূপ করে গেছেন। এইভাবে তাঁরা নগরের সন্নিকটে আসলেন। যুধিষ্ঠিব তাঁদেব জয়, জযন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল—এই ভাবে গুপ্ত নামকরণ করলেন, এবং অজ্ঞাত বাস করবার জন্য বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

বিরাট নগবে প্রবেশ করতে করতে যুধিষ্ঠিব অনুজদের সঙ্গে দুর্গাব স্তব ও প্রার্থনা কবে বলেন, তুমি আমাদের পঙ্কমগ্না দুর্বলা গাভীর ন্যায পাপ হতে উদ্ধার কর। তোমার পূজা কবলে তুমি মনুষ্যের বন্ধন, অজ্ঞান, ধনহানি, পুত্রনাশ, ব্যাধি, মৃত্যু, ভয়—সমস্তই দূর করে থাক। আমি রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে তোমাব শরণাগত হযেছি এবং তোমার বন্দনা কবছি। আমাদের সত্য রক্ষা কর। আমার

রক্ষা কর্ত্রী হও—যুধিষ্ঠিরের এই স্তবে তুষ্ট হয়ে দুর্গা তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—

সংগ্রামে অবিলম্বেই তোমার জয় হবে। আমার আশীর্বাদে জয় লাভ করে কৌরব বাহিনী বধ করে রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করবে। ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনরায় পৃথিবী ভোগ করবে এবং প্রচুর আনন্দলাভ করবে। আমার প্রসাদে তোমার সুখ আরোগ্য অব্যাহত থাকবে। আমার প্রসাদে বিরাটনগরে তোমাদের কৌরবরা বা সেই নগর বাসীরা কেউ চিনতে পারবে না। এই আশীর্বাদ করে দুর্গাদেবী অন্তর্হিত হলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির পাশার গুটি, পাশার ফলক পাশার কাপড়ে বেঁধে বগলে চেপে রাজসভায় উপবিষ্ট বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হলেন।

> তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাণ্ডবং
> বিরাটরাডিন্দুমিবাভ্রসংবৃতম্।
> সমাগতং পূর্ণশশিপ্রভাননং
> মহানুভাবং নচিরেণ দৃষ্টবান্॥ (বিঃ) ৭।৪

—মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির উপস্থিত হলে চন্দ্রের ন্যায় প্রভামণ্ডিত তাঁর মুখমণ্ডল দেখে বিরাটরাজ অবিলম্বেই তাঁর মহাপ্রভাব উপলব্ধি করলেন।

বিরাটরাজা সভাস্থ মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ. বৈশ্য প্রভৃতি যারা তাঁর চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই রাজতুল্য ব্যক্তিটি কে? ইনি ব্রাহ্মণ নন, পৃথিবীপতি হবেন।

যুধিষ্ঠির বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, একজন সর্বস্বহৃত ব্রাহ্মণ জীবিকার্থী হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার নিকট আমি স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তির ন্যায় বাস করতে ইচ্ছা করি।

বিরাটরাজা প্রসন্নচিত্তে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে প্রশ্ন

করলেন, কোন রাজ্য হতে তিনি এসেছেন? তাঁর নাম, গোত্র এবং কোন্ শিল্প জানেন তা প্রকাশ ক'রতে বললেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—

বৈয়াঘ্রপদ্যঃ পুনরস্মি বিপ্রঃ।
অক্ষান্ প্রযোক্তুং কুশলোঽস্মি দেবিনাং
কঙ্কেতি নাম্নাস্মি বিরাট বিশ্রুতঃ ॥ (বিঃ) ৭।১২

—পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমার নাম কঙ্ক। আমি ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অক্ষ প্রয়োগে সুদক্ষ।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের গুপ্তবাস করবার জন্যে ছদ্ম নামধাম ও পরিচয় অপরিহার্য্য।

বিরাটরাজা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং আরও বললেন, আপনি রাজ্য লাভের যোগ্য। আপনি এই মৎস্যদেশ শাসন করুণ। আমি আপনার বশবর্ত্তী। দ্যূতক্রীড়ানিরত ধূর্ত্তগণ সর্বদা আমার প্রিয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, কোন হীনবর্ণ মানুষের সঙ্গে যেন বিবাদ করতে না হয়, এটা আমার প্রথম প্রার্থনা। পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে কোন ব্যক্তি যেন আমার ধন আপনার নিকট গচ্ছিত না রাখে—আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুণ।

বিরাটরাজা বললেন, যদি কেউ আপনার অপ্রিয় আচরণ করে, তাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপ্রিয়কারী ব্রাহ্মণ হলে তাকে রাজ্য হতে নির্বাসিত করব। নগরবাসীদের সম্বোধন করে তিনি বললেন—এই রাজ্যে কঙ্কের প্রভুত্ব আমারই মত। আপনি আমার এক রথে আরোহণ যোগ্য সখা হবেন। আপনার প্রভূত বস্ত্র ও প্রচুর অন্ন পানীয় থাকবে। আপনি সর্বদা অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে লক্ষ্য রাখবেন. আমি আপনার জন্য সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। জীবিকার অভাবে ক্লিষ্ট হয়ে যারা আপনাকে তাদের

প্রার্থনা আমার নিকট নিবেদন করবার অনুরোধ জানাবে, আপনি নির্ভয়ে তাদের কথা আমাকে জানাবেন। আমি সেইসব প্রার্থীদের দান করবো।

প্রথম সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিরাটরাজার বন্ধুত্ব হল। এবং বিরাটরাজার নিকট সম্মানিত হয়ে সুখে অজ্ঞাত বাস করতে লাগলেন।

অন্যান্য পাণ্ডব ও দ্রৌপদী যেরূপ পদের ইচ্ছা করে বিরাট রাজ্যে এসেছিলেন সেরূপ পদ তাঁরা পেলেন।

দ্রৌপদীকে দেখে বিরাটরাজার শ্যালক কীচক তাঁর প্রতি আসক্ত হন। দ্রৌপদীর নিকট প্রণয় প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হন ও দ্রৌপদী তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। ক্রুদ্ধ কীচক রাজসভায় সর্বসমক্ষে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেন। দ্রৌপদী বিচার প্রার্থিনী হয়ে করুণ-ভাবে সভাসদ্ সকলকে ধিক্কার দিলেন। এবং রূঢ় ভাষায় পতিদের ধিক্কার দিলেন। কিন্তু বিরাটরাজ শ্যালক কীচকের বিচার করতে কেউ সাহস করলেন না, যদিও সভাসদেরা দ্রৌপদীর স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

যুধিষ্ঠিরস্য কোপাৎ তু ললাটে স্বেদ আগমৎ। (বিঃ) ১৬৩৯

—ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের কপাল ঘর্মাক্ত হযে উঠল।

প্রচ্ছন্ন ভাষায় তিনি দ্রৌপদীকে বললেন ঃ—

মন্যে ন কালং ক্রোধস্য পশ্যন্তি পতয়স্তব।

তেন ত্বাং নাভিধাবন্তি গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ॥ (বিঃ) ১৬।৪২

—মনে হয়, তোমার পতিগণ ক্রোধের ইহা উপযুক্ত সময় বলে মনে করছেন না। সেইজন্য সেই সূর্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্বগণ তোমার নিকট দ্রুত উপস্থিত হচ্ছেন না।

ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠিব স্ত্রীব এই লাঞ্ছনার উপযুক্ত শাস্তি তখন দিতে না পারলেও ভবিষ্যতে দেবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুধিষ্ঠিবের এই প্রবোধবাক্য তাঁর অসীম আত্মসংযমের প্রমাণ। অন্যদিকে এইরূপ অন্যায় অনুচিত কর্মেব সমুচিত প্রতিবিধান করবার দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁর

আত্মমর্য্যাদার পরিচায়ক।

তিনি প্রচ্ছন্ন ভাষায় দ্রৌপদীকে আরও বললেন তিনশ ষাট দিনে বিভক্ত তাঁদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হতে আর একমাস মাত্র বাকী। এই সময়ে অসহিষ্ণু হতে দ্রৌপদীকে নিষেধ করলেন। মাস খানেকের মধ্যেই কীচক নিজপাপে ধ্বংস হবে, এর আয়ু শেষ হয়ে আসছে।

যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, প্রতিবিধানের উপযুক্ত কাল সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। সেই জন্যই তুমি নটির ন্যায় রোদন করছ এবং রাজসভায় ক্রীড়ারত মৎস্যদেশীয় ব্যক্তিদের বিঘ্ন উৎপাদন করছ। সৈরন্ধ্রী, তুমি যাও, গন্ধর্বরা তোমার প্রিয় কাজ করবেন, যে ব্যক্তি তোমার অপ্রিয় কাজ করছে, তাকে বিলুপ্ত করবেন, তোমার দুঃখ দূর করবেন।

দ্রৌপদী উত্তরে বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ধর্মচারিণী হয়ে আছি। আমার অপ্রিয়কারী ব্যক্তিরা তাঁদের সকলেরই বধার্হ।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালও উত্তীর্ণ হতে চলেছে। তাই দুর্যোধন দেশে দেশে পাণ্ডবদের অনুসন্ধানে দূত পাঠিয়েছেন। দূতরা পাণ্ডবদের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। কেবল মাত্র তারা বিরাটরাজার শ্যালক কীচকের অদৃশ্য গন্ধর্বদের হাতে নিহত হবার সংবাদ নিয়ে এলো। পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সহচরদের সঙ্গে দুর্যোধনের পরামর্শ সুরু হল। কর্ণ দুর্যোধনকে বলেন ছদ্মবেশী অনুসন্ধান-দক্ষ, কার্য্যপটু, গুপ্তচরকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হোক্। তারা পুনরায় ভালরূপে পাণ্ডবদের অনুসন্ধান করুক। দুঃশাসন বললেন হয়ত পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে, অথবা সমুদ্রের পরপারে চলে গেছে কিংবা হয়ত মহারণ্যে হিংস্র জন্তুরা তাদের গ্রাস করেছে।

দ্রোণ বললেন পাণ্ডবরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে পারে না। তারা

বীর কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। সর্ববিষয়ে ধৈর্য্যশীল এই পাণ্ডবরা বাসস্থান বিষয়ে চিন্তা করে। সেই বীররা দুর্জয়। তারা তপোবলে আবৃত, তাদের পাওয়া কঠিন। যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, গুণবান, সত্যপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ, শুচিতাসম্পন্ন এবং তেজোরাশিসম্পন্ন। সে দৃষ্টি দ্বারাও সকলকে বশীভূত বা মোহিত করতে পারে। সুতরাং বিশেষ ভাবে বুঝে কাজ কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যারা তাদের জানে এমন চর বা অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় অন্বেষণ কর।

ভীষ্ম বললেন, দ্রোণ যে বলেছেন পাণ্ডবরা সর্বলক্ষণ সম্পন্ন, উত্তম ব্রতপরায়ণ, সর্ববেদসমন্বিত, শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মানুবর্তী, সত্যব্রত পরায়ণ, পবিত্র-আচার সম্পন্ন, নিয়ত ক্ষাত্রধর্মে নিযুক্ত, সর্বদা কৃষ্ণের অনুগত, সজ্জনের ভার বহনকারী, সেই মহামান্য মহাবলশালী পাণ্ডবরা বিনষ্ট হতে পারে না। তারা সমযজ্ঞ, তারা প্রতিশ্রুতি পালন করছে। পাণ্ডবরা ধর্মবলে ও উত্তম বীর্য্যবলে সুরক্ষিত। দ্রোণের সঙ্গে আমি একমত।

তিনি আরও বলেন, যুধিষ্ঠির যে নগরে থাকবে, সেখানকার রাজাদের কোনরূপ অকল্যাণ হবে না। যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকবে সে দেশের লোক দানশীল, মিষ্টভাষী, বিনীত ও লজ্জাশীল হবে। সেখানকার লোক সর্বদা প্রিয়ভাষী, জিতেন্দ্রিয়, হৃষ্টপুষ্ট, শুচি ও দক্ষতাযুক্ত হবে। সেখানকার লোক স্বয়ং ধর্মানুবর্ত্তী হবে। পরকীয় গুণে দোষারোপকারী বা পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু কিংবা দাম্ভিক বা পরদ্বেষী হবে না। সেখানে বহু বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ হবে। সেখানে নিয়মিত বর্ষণ হবে, পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও আতঙ্কশূন্যা হবে। উত্তম ধান, সুস্বাদু ফল, মাল্য সুরভিত এবং শ্রুতিমধুর ভাষা, সুশীতল বায়ু ও অবাধিত দর্শন হবে, ভয় সেখানে প্রবেশ করবে না। যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবে, সে দেশে গরুর বাহুল্য থাকবে, গরু-হৃষ্ট পুষ্ট হবে,

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সুস্বাদু ও হিতকর হবে। সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ পানীয় থাকবে। সেখানকার শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ গুণযুক্ত ও নির্মল হবে। পাণ্ডবাধিষ্ঠিত দেশে এই ত্রয়োদশ বর্ষ সব দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) ও বৈশ্য নিজ নিজ ধর্মের সেবা করবে এবং ধর্মও নিজ গুণে প্রভাব সম্পন্ন হবে। লোক সন্তুষ্ট, প্রীতিমান, পবিত্র, বিষাদশূন্য, সর্বাবস্থাতেই দেবতা ও অতিথিসেবায় অনুরক্ত দানপ্রিয়, নিজধর্ম পরায়ণ হবে। যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবে, সেখানে লোকে অশুভবুদ্ধি পরিহার করে শুভাকাঙ্ক্ষী হবে, যজ্ঞপ্রিয় ও পরহিতব্রতী হবে। সেখানে লোকেরা মিথ্যা কথা বলবে না। তাদের স্বস্ত্যয়নাদি কল্যাণকার্য্য ও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। সকলে সদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থলাভ করতে চেষ্টা করবে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। সেখানে লোকে নিত্য যজ্ঞপরায়ণ ও পরের হিতসাধনে ব্রতী হবে। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, দান, শান্তি, ক্ষমা, শ্রী, কীর্ত্তি, লজ্জা, মহাতেজস্বিতা, দয়া ও সরলতা বিদ্যমান। দ্বিজাতিগণও সেই যুধিষ্ঠিরকে জানতে পারবে না। সাধারণ লোক কি আর যুধিষ্ঠিরকে চিনতে পারবে? বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির গুপ্তভাবে অজ্ঞাতবাস করছে। সে বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চিত। আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে এইভাবে চিন্তা করে যা করলে ভাল হবে মনে কর, সত্বর তার ব্যবস্থা কর।

যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের উপরোক্ত বক্তব্য যুধিষ্ঠিরেব চরিত্রগুণ ও শৌর্য্যের একটা পরিস্ফুট ছবি এঁকে দিচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধদের মুখে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে।

কৃপাচার্য্য ও দ্রোণ ও ভীষ্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে একমত হয়ে বললেন, সময় উপস্থিত হলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হবে। সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি—এই তিনেরই ব্যবস্থা কর, যাতে আমরা সময় উপস্থিত হলেই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

দুর্যোধন বললেন, আমার বিশ্বাস ভীমই দ্রৌপদীর গন্ধর্ব স্বামীরূপে কীচকের মত বীরকে বধ করেছে। পিতামহ ভীষ্মের কথিত যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের গুণাবলী একমাত্র মৎস্য রাষ্ট্রেই বিরাজ করছে বলে বহুবার শোনা গেছে। মনে হয় বিরাট নগরেই পাণ্ডবরা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। সুতরাং আমরা সেই দেশে যাত্রা করব। মৎস্যরাষ্ট্রকে আক্রমণ করব এবং গোধন হরণ করব।

ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্মা কীচক দ্বারা পূর্বে উৎপীড়িত হয়েছিলেন। কীচকের মৃত্যুতে তার প্রতিশোধ স্বরূপ বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করে তা ভোগ করার কল্পনায় দুর্যোধন ও কৌরবদের বিরাটরাজ্যে গমনে প্ররোচিত করেন। কৌরবরা সুশর্মার প্রস্তাবে মৎস্যদেশ আক্রমণ করেন।

বিরাটরাজা যখন রাজসভায় উপবিষ্ট, তখন একটি গোপ এসে তাঁকে জানালো ত্রিগর্ত্তের সৈন্যরা তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ও সবান্ধবে লাঞ্ছিত করে রাজার শত সহস্র গোধন হরণ করে নিচ্ছে।

বিরাট রাজা যখন গোধন উদ্ধারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রার জন্য রথগুলি প্রস্তুত করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির রাজাকে বললেন, কোন বিখ্যাত ঋষির নিকট হতে আমিও চারমার্গের (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের উপর প্রযোগযোগ্য) অস্ত্র শিক্ষা করেছি। আমিও গোধন উদ্ধারে যাব। বলবান বল্লবও বীর। গোরক্ষক ও অশ্বরক্ষককেও যুদ্ধে নিন। আমার মনে হয় এরাও গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে।

যুধিষ্ঠিরের কথায় বিরাট রাজার নির্দেশে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব গোধন রক্ষার্থে বিরাট রাজা ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। মৎস্যদেশ ও ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল।

যুধিষ্ঠির বিরাটরাজার চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই ব্যূহের আকৃতি শ্যেনের ন্যায়। যুধিষ্ঠির তার মুখ, নকুল ও সহদেব তুটিপক্ষ এবং ভীম হলেন তার পুচ্ছ।

যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করলেন। ভীম দুই সহস্র রথীকে বধ করলেন, নকুল তিনশত ও সহদেব চারশত রথীকে নিহত করলেন। বিরাট রাজাও প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। হঠাৎ সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে রাজা সুশর্মা বিরাট রাজাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়ে তাঁকে নিয়ে বেগে প্রস্থান করতে থাকেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বিরাটরাজাকে মুক্ত করতে আদেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন, আমরা সকলে এই রাজার রাজ্যে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তুদ্বারা সম্মানিত হয়ে সুখে বাস করছি। ভীম, তুমি আমাদের এই ঋণ পরিশোধ কর।

ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালনের জন্য গদার ন্যায় একটি বিশাল বৃক্ষের দিকে তাকাতে থাকলে, যুধিষ্ঠির তাঁকে সতর্ক করে বললেন, তুমি অতি সাহসের কাজ করো না। এই বৃক্ষ দিয়ে অতিমানবীয় কাজ করলে লোকে তোমাকে 'এই ভীম' বলে চিনে ফেলবে। তুমি অন্য কোন সাধারণ অস্ত্র নিয়ে রাজাকে তাড়াতাড়ি মুক্ত কর।

ঐরূপ অবস্থায় থেকেও উপকারী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার দুঃসাহসে যুধিষ্ঠির চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যুধিষ্ঠিরের দূরদর্শিতায় সেই যুদ্ধে ভীম আপন শৌর্য্য প্রকাশ করলেও তাঁর ছদ্মরূপ ধরা পড়েনি।

যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবকে ভীমের সাহায্যে পাঠালেন। নিজেও যুদ্ধ করে সহস্র সৈন্য বধ করেন। অবশেষে ভীমের হস্তে সুশর্মা নিগৃহীত হয় এবং বিরাটরাজা মুক্তি পেলেন। তাঁর হৃত সমস্ত গোধনও উদ্ধার হলো।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্মাকে মুক্তি দিলেন। দুর্জয়

শত্রুকে অকুণ্ঠিত ভাবে ক্ষমা করে মুক্তি দেওয়া যুধিষ্ঠির চরিত্রের এক মহৎ বৈশিষ্ট্য।

বিরাটরাজা জয় লাভ করে পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। যুধিষ্ঠিরকে বিশেষভাবে বিরাটরাজা সম্মান প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক হন এবং বলেন আপনাকে অভিষিক্ত করব। আপনিই আমাদের মৎস্যদেশের রাজা। আপনার জন্যই আজ রাজ্য ও সন্তান-সন্ততি দেখতে পাচ্ছি এবং নিগৃহীত ও পরাভূত হয়েও শত্রুর বশীভূত হইনি।

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে বললেন, আমার একমাত্র আনন্দ যে আপনি শত্রুহস্ত হতে মুক্ত হয়েছেন। আপনি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়ে এবং পরিবারবর্গ সঙ্গে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করবেন—ইহাতেই আমার অপরিসীম আনন্দ। আপনি দূতদের সত্বর নগরে প্রবেশ করে আপনার জয় ঘোষণা করতে আদেশ দিন। মৎস্যরাজাও যথাযথ আদেশ দিলেন।

বিরাটরাজা সেই গোধন উদ্ধারার্থে ত্রিগর্ত্তসেনার অভিমুখে প্রস্থান করলে ইত্যবসরে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি কৌরবরা উত্তর দিকে বিরাট রাজার গোধন হরণ করেন এবং গোপাধ্যক্ষ নানাপ্রকারে রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দান করে। রাজপুত্র উত্তর সারথির সন্ধান করতে থাকেন। দ্রৌপদী সারথির জন্য বৃহন্নলার নাম উল্লেখ করেন। বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তর যুদ্ধ যাত্রা করেন। উত্তর কৌরবদের সাগরের ন্যায় বিশাল সৈন্য-বাহিনী দেখে ভীত হয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং নানাভাবে বিলাপ করতে থাকেন। অর্জুন ভীত উত্তরকে আশ্বাস দান করেন ও তাঁকে রথে আরোহণ করালেন এবং সারথি করে শমী বৃক্ষের দিকে রথ চালালেন। বৃহন্নলা-বেশী বীর অর্জুনকে দ্রোণ চিনতে পেরে ভীষ্মের নিকট অর্জুনের অলৌকিক পরাক্রমের প্রশংসা করেন। অর্জুন একা সমস্ত কৌরব

বীরদের পরাভূত করে বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। কৌরবদল লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়ে স্বদেশে প্রস্থান করে।

বিরাটরাজা যখন জানতে পারলেন নপুংসক বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তর কৌরব সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, তখন তিনি আশঙ্কা করলেন উত্তর জীবিত নেই।

অত্যন্ত সন্তপ্ত সেই বিরাটরাজাকে যুধিষ্ঠির তখন সহাস্যে আশ্বস্ত করে বললেন, বৃহন্নলা যদি সারথি হয়ে থাকে, তাহলে আজ আপনার সেই গোধনগুলি শত্রুরা নিয়ে যেতে পারবে না। বৃহন্নলা সারথি থাকলে আপনার পুত্র সমরে সমস্ত কৌরব, রাজা, দেবতা, যক্ষ ও সিদ্ধদেরও জয় করতে সমর্থ হবে।

এমন সময় উত্তরের দূত এসে তাঁর বিজয়বার্ত্তা রাজাকে জানালো। মন্ত্রী রাজাকে গোধন উদ্ধার, কৌরবদের পরাজয় এবং উত্তরের প্রত্যাগমন সংবাদ দিলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, ভাগ্যবশতঃ গরুগুলি উদ্ধার করা হয়েছে ও কৌরবরা পরাজিত হয়েছে। আপনার পুত্র যে কৌরবদের জয় করেছে—এটা আমি আশ্চর্য্য মনে করি না। বৃহন্নলা যার সারথি, তার জয় সুনিশ্চিত।

বিরাটরাজা অমিত পরাক্রমশালী পুত্রের বিজয় সংবাদ শুনে আনন্দিত হয়ে দূতদের পারিতোষিক দিতে ও নগরী সজ্জিত করতে আদেশ দিলেন। উৎফুল্ল বিরাটরাজা বললেন, সৈরন্ধ্রি, পাশা নিয়ে এস, কঙ্ক, খেলা আরম্ভ হোক।

যুধিষ্ঠির বলেন, আনন্দিত ব্যক্তি ও ধূর্ত্ত ব্যক্তির সঙ্গে খেলতে নেই—এরূপ কথা আমাদের শোনা আছে। আপনি আজ আনন্দিত তাই আমি খেলতে ইচ্ছুক নই, অথচ আপনার প্রিয় কাজ করতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে খেলা হোক।

মৎস্যরাজা বললেন, আমার যে সব ধন আছে—তার কিছুই তুমি দ্যূতক্রীড়া না করেও রক্ষা করতে পারবে না।

কঙ্ক বললেন—বহু দোষ যুক্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার কি প্রয়োজন? দ্যূতক্রীড়ায় অনেক দোষ, সেই জন্য তা পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্রুতস্তে যদি বা দৃষ্টঃ পাণ্ডবেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
স রাষ্ট্রং সুমহৎ স্ফীতং ভ্রাতৃংশ্চত্রিদশোপমান্॥
রাজ্যং হারিতবান্ সর্বং তস্মাদ্ দ্যূতং ন রোচয়ে।

(বিঃ) ৬৮।৩৪-৩৫

—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা আপনি শুনেছেন হয়ত বা দেখেও থাকতে পারেন। তিনি তাঁর দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁর সুমহৎ ও সমৃদ্ধ রাজ্য এবং রাজকীয় সমস্ত বস্তুই হারিয়েছেন। সেইজন্য দ্যূতক্রীড়া রুচি সম্মত নয়।

এইভাবে যুধিষ্ঠির পাশা খেলার দোষ সম্বন্ধে বলেন, এর পরও যদি রাজা পাশা খেলতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি খেলবেন।

দ্যূত ক্রীড়ার সময় মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দেখ আমার পুত্র দুর্দ্ধর্ষ কৌরবদের পরাস্ত করেছে।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেন, বৃহন্নলা যার সারথি সে যুদ্ধে জয়লাভ করবে না কেন? এই কথা শুনে বিরাট রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, ওহে অধম ব্রাহ্মণ, তুমি আমার পুত্রের সঙ্গে একটা ক্লীবের প্রশংসা করছ, তোমার ভালমন্দ জ্ঞান নেই। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা কর। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলকে আমার পুত্র জয় করবে না কেন?

ব্রাহ্মণ, তুমি বন্ধু বলে তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করলাম, যদি বাঁচতে চাও, তবে এইরূপ কথা তুমি পুনরায় বলবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন, যেখানে দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথীরা রয়েছেন যেন দেবগণ পরিবৃত সাক্ষাৎ দেবরাজ, বৃহন্নলা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি সম্মিলিত সেই বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে?

বাহুবলে যার তুল্য কেউ হয়নি এবং হবেও না, যার যুদ্ধ দেখলে অতিশয় আনন্দ হয়, যে সম্মিলিত সুরাসুর সমন্বিত সমস্ত মানবকে

জয় করেছে। তেমন ব্যক্তির সহায়তায় আপনার পুত্র বিজয়ী হবে না কেন?

বিরাটরাজা বললেন, তোমাকে অনেকবার বারণ করেছি, তথাপি তুমি বাক্য সংযত করলে না। শাসনকর্তা না থাকলে কেউ ধর্মাচরণ করে না বলে ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে সকোপে 'নৈবং' বলে ভর্ৎসনা করে যুধিষ্ঠিরের মুখের উপর জোরে পাশার গুটি দ্বারা আঘাত করলেন। জোর আঘাতে নাসিকা হতে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল, তা মাটিতে পড়তে না পড়তেই যুধিষ্ঠির দুই হাতে ধরে ফেললেন।

অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্মের নন্দন।
দুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে রাজারে যোগায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে॥ (বিঃ)

যুধিষ্ঠির সম্মুখে অবস্থিত দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, দ্রৌপদী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র নিয়ে নাসিকার নাড়ী হতে যা ক্ষরিত হচ্ছিল সেই রক্তস্রোত ধরে নিলেন।

এমন সময় দ্বারপাল বিরাটরাজকে জানালেন বৃহন্নলার সঙ্গে পুত্র উত্তর দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। মৎস্যরাজ আনন্দিত হয়ে দ্বারপালকে সত্বর উভয়কে আনতে আদেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে দ্বারপালের কানের কাছে গিয়ে বললেন—

শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ॥ (বিঃ)

যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুৎপন্নমতি ও ক্ষমাশীলতা একটি গুরুতর অঘটন নিবারণ করেছিল।

বৃহন্নলার এরূপ এক প্রতিজ্ঞা আছে যে যুদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র কেউ তাঁর (যুধিষ্ঠিরের) অঙ্গ ক্ষত করলে বা রক্তপাত ঘটালে সে বৃহন্নলার বধ্য। বৃহন্নলা তাঁকে রক্তাক্ত দেখলে তা সহ্য করবে না। অমাত্য, সৈন্য ও বাহনসহ সে বিরাটরাজকে হত্যা করবে।

উত্তর পিতাকে প্রণাম করে ভূতলে উপবিষ্ট শোণিতাপ্লুত নিরপরাধ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলেন। সৈরন্ধ্রী তখন তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা কে এঁকে প্রহার করেছে? কে এমন পাপ কাজ করেছে?

বিরাট বললেন, এই ক্রূরটাকে আমি প্রহার করেছি। এ শুধু এইটুকু প্রহারের যোগ্য নয়, কারণ তোমার মত বীরের প্রশংসাকালে সে নপুংসকটার প্রশংসা করছিল।

উত্তর বললেন, আপনি উচিত কাজ করেননি, সত্বর এঁকে প্রসন্ন করুন, না হয় ব্রহ্মতেজ আপনাকে সমূলে ভস্মীভূত করবে।

পুত্রের কথা শুনে বিরাটরাজা

ক্ষময়ামাস কৌন্তেয়ং ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ (বিঃ) ৬৮।৬২

—ভস্মাচ্ছন্ন অনলের মত তেজস্বী যুধিষ্ঠির, ক্ষমা করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা, বহু পূর্বে আমি ক্ষমা করেছি। আমার কোন ক্রোধ নেই, যদি আমার এই রক্ত ভূতলে পতিত হতো, তাহলে রাজা রাজ্য সহ ধ্বংস হতেন—এতে সন্দেহ নেই। আমি নির্দোষ ব্যক্তিকে আঘাত করার জন্য আপনাকে দোষী করছি না। কারণ বলবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রায়ই এরূপ দারুণ কর্ম করবার সুযোগ আসে।

ক্ষমাধর্মই যুধিষ্ঠির চরিত্রের অন্যতম আদর্শ।

রক্তপাত বন্ধ হলে বৃহন্নলা প্রবেশ করলেন। বিরাটরাজা ও কঙ্ককে প্রণাম করলেন।

বিরাটরাজা অর্জুনের সামনে উত্তরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। তা শুনে উত্তর বললেন, তিনি গোধন উদ্ধার করেননি।

তিনি শত্রুদেরও পরাজিত করেননি। সে সমস্তই কোন এক দেবপুত্র করেছেন। তিনি ভয়ে পালিয়ে আসছিলেন, সেই দেবপুত্র তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং স্বয়ং রথোপরি অবস্থান করলেন। তিনি যুবক, তাঁর দেহ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। তিনি গোধনগুলি জয় করে দিয়েছেন এবং শত্রুদের পরাজিত করেছেন।

বিরাটরাজা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সেই দেবপুত্র? তিনি সেই দেবপুত্রকে দেখতে ইচ্ছা করেন। উত্তর বললেন, দেবপুত্র অন্তর্হিত হয়েছেন। তিনি আগামী কাল বা পরশু দেখা দেবেন।

পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করে সর্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে রাজাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলিতে উপবেশন করলেন। বিরাটরাজা তাঁদের ঐরূপভাবে উপবিষ্ট দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কঙ্ককে বললেন, তুমি সেই অক্ষক্রীড়াকারী, তোমাকে আমি সভাসদ্‌রূপে গ্রহণ করেছিলাম, এখন তুমি রাজাসনে উপবেশন করেছ কেন?

বিরাটের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ইন্দ্রের আসনার্দ্ধে বসবার যোগ্য, বেদনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, দান ও যজ্ঞপরায়ণ এবং কঠোর ধর্মনিষ্ঠ, ইনি মূর্ত্তিমান ধর্মস্বরূপ, সমস্ত বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জগতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।

... ...

এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
ন চৈবান্যঃ পুমান্ বেত্তি ন বেৎস্যতি কদাচন ॥ (বিঃ) ৭০।১১

—ইনি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ। ত্রিভুবনে কেউই এরূপ অভিজ্ঞ নয় এবং ভবিষ্যতেও কখনও হবেন না।

ইনি দূরদর্শী, মহাতেজস্বী, নাগরিকদের প্রিয় অতিরথ, যজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, সংযমী।

মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ (বিঃ) ৭০।১৪

—ইনি সর্বলোক বিখ্যাত মহর্ষিকল্প রাজর্ষি। ইনি বীর, ধীর, দক্ষ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়।

ধনে ও সঞ্চয়ে ইন্দ্র ও কুবেরের সমকক্ষ। ইনি কৌরব ও পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, উদীয়মান সূর্য্যের প্রভার ন্যায় তাঁর কীর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত। ইনি যখন কুরুদেশে বাস করতেন, তখন বলবান দশহাজার হস্তী তাঁর পশ্চাতে অনুগমন করতো। ঋষিগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতিগান করেন, সেইরূপ সুপরিস্কৃত মণিময় কুণ্ডলধারী আটশত বৈতালিক চারণগণের সঙ্গে তাঁর স্তুতি-গান করত। দেবতারা যেমন কুবেরের সেবা করেন, তেমন কৌরবগণ এবং সমস্ত রাজন্যবৃন্দ কিঙ্করের মত নিত্য তাঁর সেবা করতো। ইনি সমস্ত স্বাধীন রাজাকে বশীভূত করে তাঁদের করদানে বাধ্য করে-ছিলেন। শীঘ্রই তাঁর প্রভাবে শক্তিশালী দুর্যোধন, কর্ণ ও অনুচর বৃন্দের সঙ্গে সন্তপ্ত হবে। তাঁর গুণাবলী গণনার অতীত, এই যুধিষ্ঠির নিত্য ধর্মপরায়ণ এবং দয়ালু।

বিরাটরাজা বললেন, ইনি যদি রাজা যুধিষ্ঠির তবে তাঁর ভ্রাতা অর্জুন কোনটি, ভীমই বা কোনটি? নকুল, সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? পাণ্ডবরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হওয়ার পর তাঁদের সম্বন্ধে তো আর কিছুই জানা যায়নি।

উত্তরে অর্জুন ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর নানারূপ গুণের বর্ণনা করে প্রত্যেককে দেখিয়ে দিলেন। সর্বশেষে তিনি আত্ম পরিচয় দিলেন। অর্জুন যখন উপরোক্ত ভাবে পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় দিলেন, তখন উত্তর অর্জুনের পরাক্রমের বর্ণনা করেন। তিনিও এক এক করে পঞ্চপাণ্ডবের নানা মহিমা বিবৃত করেন। তিনি আরও বললেন, পাণ্ডবরা মহৎ, মান্য ও পূজ্য, এঁদের সময়োচিত পূজা করা হোক এটা তাঁর অভিপ্রায়।

বিরাটরাজা পাণ্ডবদের ভূয়সী প্রশংসা করে, যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ধনাগার

প্রভুত্ব ও রাজধানী সহ সমগ্র রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে দান করেন। তৎপর বিরাটরাজা অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কন্যা উত্তরার বিয়ের প্রস্তাব করেন। অর্জুন তাঁর পুত্র, কৃষ্ণের ভাগ্‌নে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ের প্রস্তাব করেন ও উত্তরাকে পুত্রবধূ করেন।

বিরাটরাজসভায় পাণ্ডবরা ও তাঁদের সমস্ত আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও মিত্রগণ মিলিত হলেন। নানা প্রকার আলাপ আলোচনার পর কৃষ্ণ তাঁদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন যে তাঁরা সকলেই জানেন যে শকুনি কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যহরণ করে-ছিলেন। পাণ্ডবরা বহু দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে পণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন এবং তাঁদের বনবাস ও অজ্ঞাত বাসের কাল শেষ হয়েছে। এখন যুধিষ্ঠিরের ও দুর্যোধনের পক্ষে যা হিতকর হবে সে উপায় অবলম্বন করুন। যুধিষ্ঠির ধর্ম বিরুদ্ধ উপায়ে দেবতার রাজ্য পেলেও তা গ্রহণ করবেন না। ধর্ম অনুসরণ করে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের রাজত্ব পেলে উহাও তিনি গ্রহণে ইচ্ছুক। যুধিষ্ঠির কৌরবদের জন্যে অসহ্য কষ্ট ভোগ করলেও এখনো তাঁদের হিত ইচ্ছা করেন। তিনি সমবেত সুহৃদদের উদ্দেশ্য করে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা সম্মিলিত ভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে এক বাক্যে তাঁদের কর্ত্তব্য স্থির করেন। যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এখনো পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে পাণ্ডবগণ তাঁদের সকলকে বিনাশ করবেন। কৃষ্ণ বলেন কোনরূপ সিদ্ধান্তের পূর্বে দুর্যোধনের মতামত জানা প্রয়োজন। সুতরাং কোন উচ্চকুল সম্ভূত ও উত্তম ব্যক্তিকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে কৌরবদের অভিপ্রায় কি তা জানবার চেষ্টা করুন।

ঐ সভায় বলরামও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণের ন্যায় দুর্যোধনের অভিপ্রায় জানবার জন্য দূত পাঠাবার প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে যুধিষ্ঠির তাঁর হৃত অর্দ্ধেক রাজ্য পেতে চান। এবং দুর্যোধন ও পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে

সুখে ও আনন্দে বাস করুন। তবে এমন একজন দূত পাঠানো প্রয়োজন যিনি কৌরবদের উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ না করে তাঁর কাজ করতে পারবেন। কারণ কৌরবেরা বলবান এবং পাণ্ডবগণের রাজ্য অধিকার করেছেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলা প্রিয় মনে করে তাতে আসক্ত হওয়াতে কৌরবগণ তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পটু নহেন। তাঁর সমস্ত সুহৃদগণের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি শকুনির সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলেন। শকুনি অত্যন্ত নিপুণ জেনেও, কর্ণ ও দুঃশাসনকে বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠির শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন এবং শকুনি তাঁকে জয় করেছিলেন। প্রতিপক্ষের অক্ষ চালনা তাঁর প্রতিকূল হতে থাকলে তখন যুধিষ্ঠির ক্রোধবশে ও হঠকারিতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। শকুনি জয় করে নেন, শকুনির কোন দোষ আছে বলে বলরাম স্বীকার করেন না।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার কপটতা অকপটতা উপরোক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করে বলরাম বলেন যে প্রেরিত দূত ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে সামনীতির কথা বলবে এবং এরূপ আচরণ করলেই দুর্যোধনকে স্বপক্ষে আনতে পারবে। সামনীতি অবলম্বন করে দুর্যোধনকে আমন্ত্রণ করা হোক।

বীব সাত্যকি কঠোর ভাষায় বলরামের প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের বাজ্যহরণকে ধর্মানুসাবে রাজ্য জয় বলে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন শত্রুগণের নিকট ভিক্ষা করা অধর্ম ও অপযশ। সকলে আলস্য ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিবের অর্দ্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দিন, তবে যুধিষ্ঠির তা গ্রহণ করুন অথবা কৌরবগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে চিব নিদ্রিত থাকবে।

রাজা দ্রুপদ বীর সাত্যকির মত সমর্থন করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে অবিলম্বে তাঁদের মিত্রদেব কাছে সংবাদ পাঠান দবকার যেন তাঁরা পাণ্ডবদেব জন্যে সৈন্য সংগ্রহেব উদ্যোগ করেন। এমন মিত্ররাজ কারা তিনি তাঁদের এক ফর্দ্দ দেন। এবং বলেন যে

দ্রুত তাঁদের কাছে দূত পাঠান হোক। কারণ যাঁর দূত আগে যাবে তাঁরা প্রথম আমন্ত্রণকারীকে সাহায্য করে থাকেন। অন্য দিকে তিনি তাঁর পুরোহিতকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন। তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাবার প্রস্তাব করেন।

কৃষ্ণ রাজা দ্রুপদের কথা সমর্থন করে বলেন যে দ্রুপদের নির্দিষ্ট পথে যুধিষ্ঠিরের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমনের পূর্বে দ্বিমুখী অভিযানের পরামর্শ দিলেন। এক দিকে শান্তির চেষ্টা, অন্য দিকে বন্ধু ও অনুগত নৃপতিদের যুদ্ধে সহায়তার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণের নির্দেশ মত দ্রুপদ রাজার পুরোহিতকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে দৌত্যকর্মে পাঠান হলো।

কৌরবরাও আপন শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁদের বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করেন।

দূত মুখে সব সংবাদ শুনে নকুল-সহদেবের মাতুল রাজা শল্য মহারথী পুত্রদের সঙ্গে বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবৃত হয়ে পাণ্ডবদের অভিমুখে যাত্রা করলেন। দুর্যোধন রাজা শল্যের আগমন বার্ত্তা পেয়ে পথিমধ্যে স্বয়ং তাঁকে আদর আপ্যায়ন দ্বারা তুষ্ট করেন। শল্য তাঁকে বর দিতে চাইলে দুর্যোধন বলেন, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার সমুদয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হোন। শল্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন বলে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থে গমন করলেন। তিনি পাণ্ডবদের সেবা গ্রহণ করে, যুধিষ্ঠিরকে নানা সঙ্কট মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন দেখে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি পথিমধ্যে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও সেবা গ্রহণ এবং তাঁকে বরদানের সমস্ত বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে জানালেন।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন আপনি দুর্যোধনকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তম কাজ করেছেন। আমিও কিন্তু আপনাকে দিয়ে একটি কাজ করাতে ইচ্ছা করি। তা যদি আপনার উপযোগী

কর্ম না হয়, তবুও আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ আপনাকে সে কাজ করতে হবে। আমি তা বলছি শুনুন।

ভবানিহ চ সারথ্যে বাসুদেবসমো যুধি ॥ (উদ্যোঃ) ৮।৪২

—এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি বাসুদেবের সমকক্ষ সারথি।

যখন কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, তখন আপনাকে নিশ্চয়ই কর্ণের সারথি রূপে বরণ করবে, এতে কোন সংশয় নেই।

তত্র পাল্যোঽর্জুনো রাজন্ যদি মৎপ্রিয়মিচ্ছসি।
তেজোবধশ্চ তে কার্য্যং সৌতেরস্মজ্জয়াবহঃ ॥
অকর্তব্যমপি হ্যেতৎ কর্তুমর্হসি মাতুল। (উদ্যোঃ) ৮।৪৪

—যদি আপনি আমার প্রিয় করতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই যুদ্ধে আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন। আপনি সেই সময় কর্ণের বিক্রম ভঙ্গ করবেন, তা হলেই সেই যুদ্ধে আমাদের জয় হবে। যদিও আপনার পক্ষে এ ধরণের কাজ করণীয় হবে না, তথাপি মাতুল, আমার জন্য আপনাকে তা করতে হবে।

শল্য যুধিষ্ঠিরেব নির্দেশ মত কাজ করতে সম্মত হলেন।

এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির শল্যরাজকে পঞ্চম বাহিনী (Fifth Columnist)এর কাজ করতে পরামর্শ দেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দূরদর্শিতা প্রকাশ পেলেও তিনি শল্যকে কপটতার আশ্রয় নিতে অনুরোধ করলেন। যুদ্ধেব পূর্বেই যুদ্ধে অন্যায় কৌশল অবলম্বনের প্রস্তাব নীতির দিক দিয়ে গর্হিত হলেও ক্ষাত্রধর্ম মতে দোষনীয় নয় বলেই ধার্মিক যুধিষ্ঠির এমন অন্যায় আব্দার করেছিলেন। প্রেমে ও রণে জয়লাভ করতে হলে কোন নীতিই গর্হিত নয়। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দিযে বিচার করে উপযুক্ত নীতি স্থিব করেন।

এখানে রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যথেষ্ট পার্থক্য। একমাত্র বালি বধ ব্যতীত, সমস্ত রামায়ণে রাম যুদ্ধ জয়ের জন্য কোন অন্যায় পথেব আশ্রয় নেননি।

রাজা শল্য যুধিষ্ঠিরকে নানা পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে বললেন

তুমি ভ্রাতৃবৃন্দ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাবনে বাস করে যে ক্লেশ সহ্য করেছো, তার জন্য তুমি অনুতাপ করো না। ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করে নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি তুমিও নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হবে। পাপাত্মা নহুষ যেমন অগস্ত্যের শাপগ্রস্ত হয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি দুরাত্মা শত্রু কর্ণও দুর্যোধনাদিও শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন।

ভবান্ কর্ণস্য সারথ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

তত্র তেজোবধঃ কার্য্যং কর্ণস্যার্জুনসংস্তবঃ॥ (উদ্যোঃ) ১৮।২৩

—(অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ যখন হবে সেই সময়) আপনি কর্ণের সারথি হবেন,এতে কোন সংশয় নেই। তখন আপনি অর্জুনের প্রশংসা কবতে করতে কর্ণের তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করে দেবেন।

যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের সহায়তার জন্য বিভিন্ন দেশের নৃপতিরা সসৈন্যে আপন আপন পছন্দ মত পক্ষে যোগদান করেন।

অন্যদিকে দ্রুপদ রাজার পুরোহিত কৌরবসভায় উপস্থিত হয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে পাণ্ডবদের অভিপ্রায় জানিয়ে বললেন, আপনারা নিজ ধর্ম ও পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের অর্দ্ধেক রাজ্য যা তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য, তা তাঁদের ফিরিয়ে দিন।

ভীষ্ম দ্রুপদ রাজার পুরোহিতের বাক্য সমর্থন করে অর্জুনের প্রশংসা করেন। তাঁর প্রতিবাদে কর্ণ আক্ষেপ করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে সমর্থন করে দূতরূপী পুরোহিতকে সম্মানিত করেন। পরে পরামর্শ করে সঞ্জয় মাধ্যমে অভিমত জানাবেন বলে বিদায় দেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলেন যে তিনি পাণ্ডবদের প্রভাব ও প্রতিভার কথা জানেন। কিন্তু তিনি অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম, নকুল ও সহদেবকেও তেমন ভয় করেন না, যেমন ভয় করেন ক্রোধোদ্দীপ্ত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধকে।

যথা রাজ্ঞ ক্রোধদীপ্তস্য সূত

মন্যোরহং ভীততরঃ সদৈব।

মহাতপা ব্রহ্মচর্য্যেণ যুক্তঃ
সঙ্কল্পোঽয়ং মানসস্তস্য সিদ্ধ্যেৎ ॥ (উদ্যোঃ) ২২।৩৫

—আমি সর্বদা তার ক্রোধকে ভয় করে বাস করছি; কারণ যুধিষ্ঠির মহাতপস্বী ও ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন। সে মনে যা সঙ্কল্প করবে তা অবশ্যিই সিদ্ধ হবে।

সেইজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের বিষয় চিন্তা করে, এবং সেই ক্রোধের কারণ থাকায় অত্যন্ত ভীত হয়ে সঞ্জয়কে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের শিবিরে যুধিষ্ঠিরকে তুষ্ট করার জন্য পাঠালেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার কামনা করেন একথা জানাতে বললেন। তিনি সঞ্জয়কে নৃপতিদের সামনে এমন কোন কথা বলতে বারণ করেন যা তাঁদের ক্রোধের উদ্রেক করবে এবং যুদ্ধের কারণ হবে।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কুশল সংবাদ জানলেন, যুধিষ্ঠিরও কৌরবপক্ষের সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন ও তিনি প্রত্যেক পাণ্ডবের বীরত্বের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন কৌরবরা কি এসব স্মরণ রাখে?

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন ধৃতরাষ্ট্র শান্তি কামনা করেন, এবং আমিও মনে করি পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের এই শান্তি সংবাদ বিবেচনা করবে এবং উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হবে।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে বিদুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে পাপাত্মা দুর্যোধনের অন্যায় কার্যে প্রশ্রয় দিয়ে অধর্ম করেছেন, যখন থেকে তিনি বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করছেন না, তখন থেকেই তাঁর বিপদ আরম্ভ হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র আমাদের বনবাসে পাঠিয়ে সমস্ত রাজ্যই হস্তগত করেছেন, এখনো নিষ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এ অবস্থায় শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? তিনি আরও বলেন ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যর্পণ করলেই শান্তি স্থাপিত হবে।

যুদ্ধের পরিণামের কথা উল্লেখ করে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে তাঁর মহৎ

গুণাবলীর বর্ণনা করে তাঁকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন, যুধিষ্ঠিরের মত মহাত্মা যুদ্ধ করে ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। যুধিষ্ঠির বলেন, যদি তিনি সামনীতি পরিত্যাগ করে নিন্দনীয় হন কিংবা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়ে ধর্মকে ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে চান, তবে কৃষ্ণ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করুণ। কারণ তিনি উভয় পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। কৃষ্ণ প্রত্যেক কাজের অন্তিম পরিণতি কি তা জানেন। আমি তাঁর আজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারি না।

কৃষ্ণ সঞ্জয়কে সমস্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ধর্মাত্মা পাণ্ডবরা শান্তি স্থাপনেও উদ্যোগী এবং যুদ্ধ করতেও সমর্থ, তুমি এই উভয় পক্ষের যথাযথ বিষয় বুঝে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তা বলবে।

সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তনের সময় যুধিষ্ঠির মুখ্য মুখ্য কৌরবদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য কুশল কামনা ও অভিবাদন জানান এবং সঞ্জয়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি দুর্যোধনকে একথা বার বার শোনাবে—

যস্তে শরীরে হৃদয়ং দুনোতি—
কামঃ কুরূনসপত্নোঽনুশিষ্যাম্।
ন বিদ্যতে যুক্তিরেতস্য কাচি—
ন্নৈবংবিধাঃ স্যাম যথা প্রিয়ং তে।
দদস্ব বা শক্রপুরীং মমৈব
যুধ্যস্ব বা ভারতমুখ্য বীর ॥ (উদ্যোঃ) ৩০।৪৮-৪৯

তোমার হৃদয়ে যদি এই অভিলাষ থাকে যে তুমি কৌরবদের রাজ্য শত্রুশূন্য করে রাজত্ব করবে, সে কেবল তোমার হৃদয়ে পীড়াই জন্মাচ্ছে। কারণ তা সফল হবার কোন যুক্তি নেই। আমরা এমন নই যে, তোমার এই প্রিয় কার্য সফল হবার সুযোগ দেব। ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ বীর দুর্যোধন, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী আমাকে প্রত্যর্পণ কর অথবা যুদ্ধ কর।

ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির বলে পাঠালেন যে যখন তাঁরা বালক ছিলেন, তখন আপনারই করুণায় তাঁদের রাজ্য প্রাপ্তি হয়েছিল। পূর্বে তাঁদের রাজপদে বসিয়ে এখন তাঁদের রাজ্য নষ্ট হতে দেখে উপেক্ষা করবেন না। ভীষ্মকে উদ্দেশ্য করে বলে পাঠালেন যে আপনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করে এমন কাজ করুন, যাতে আপনাব পৌত্রগণ সকলে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতির সম্পর্ক রেখে জীবনযাপন করতে পারে। তিনি পুনরায় দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে বললেন যে অতীতে তোমার দেওয়া অনেক লাঞ্ছনা আমরা সহ্য কবেছি, কিন্তু আজ আমাদের প্রাপ্য ভাগ অবশ্য নেবো। তুমি অন্যের ধনের প্রতি তোমার লোলুপ দৃষ্টি অপসারিত কর। আমরা শান্তি কামনা করি, তুমি আমাদের রাজ্যের একভাগ প্রত্যর্পণ কর।

ভ্রাতৃণাং দেহি পঞ্চানাং পঞ্চ গ্রামান্ সুযোধন।

শান্তির্নোঽস্তু মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞাতিভিঃ সহ সঞ্জয়॥ (উদ্যোঃ) ৩১।২০

—সুযোধন, আমাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচটি গ্রাম দাও। মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়, তা হইলেই আমাদের জ্ঞাতিদেব সঙ্গে শান্তি স্থাপন হতে পারে।

তিনি সঞ্জয়কে বলেছিলেন আমি শান্তি স্থাপনে সমর্থ এবং যুদ্ধ করতেও সমর্থ। ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে আমার উত্তম জ্ঞান আছে। সুতরাং আমি সময়ানুসারে কোমল হতে পারি আবার কঠোরও হতে পারি।

যুধিষ্ঠির যে নির্লোভ ও শান্তিকামী ছিলেন তাঁর পাঁচটি মাত্র গ্রাম প্রার্থনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। যদিও পাণ্ডববা অনায়াসে কৌরবদেব পরাজিত কবতে সমর্থ তবু শান্তি স্থাপনের জন্য নিজেদেব ন্যায্য প্রাপ্য ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেব পরামর্শ চাইলেন। তিনিও পাণ্ডবদেব প্রাপ্য বাজ্য তাদের ফেরৎ দিয়ে নিজ পুত্রদেব সঙ্গে সুখে বাস করতে পরামর্শ দেন।

সঞ্জয় ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের ও উপস্থিত সব মিত্র

রাজন্যবৃন্দকে কৃষ্ণের নিকট যাবার অনুরোধ করেন। তাঁকে কৌরব সভায় যাবার জন্যে অনুরোধ করবেন যাতে পাণ্ডবদের কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না হয়। সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির বলেন মিত্রদের সাহায্য করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। কৃষ্ণ ব্যতীত সে কাজ সম্পাদন করতে পারে এমন কাউকে তিনি দেখছেন না। পাণ্ডবেরা দুর্যোধনদের যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। কৃষ্ণই কেবল পাণ্ডবদের এ মহাভয় হতে রক্ষা করতে পারেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের যা ইচ্ছা তা সম্পূর্ণ করবেন বলে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন যে সঞ্জয় যা বলেছে তা তিনি শুনেছেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কথাই প্রতিধ্বনি করেছে। ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা পাণ্ডবদের কিছু না দিয়ে পাণ্ডবদের দিয়ে শান্তি স্থাপন করা। ধৃতরাষ্ট্রের মনে লোভ জন্মেছে তাই তাঁর এমন পাপমতি। ইহা হতে আর অধিক দুঃখ কি হতে পারে?

যে নিয়ম হয়েছিল তাহে হই পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার॥
নাহি দিলে ধর্মে বল কেমনে তরিবে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হলে কিবা ফল হবে॥
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্বকুল বিনাশ॥

— — —

অর্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন।

— — —

সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ॥ (উদ্যোঃ)

যুধিষ্ঠিরের উপরোক্ত প্রস্তাব থেকে আমরা জানতে পাই যেহেতু তিনি শান্তিকামী, তাই স্বজন বিরোধে তাঁর একান্ত অনীহা।

যদিও পাণ্ডবেরা সমগ্র রাজ্য তাঁদের বন্ধুদের সাহায্যে উদ্ধারে সক্ষম তবু কেবল মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে তাঁরা শান্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন সেইরূপ পাঁচটি গ্রামও দিতে স্বীকার করছেন না। পরের ধনে লোভ করলে বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়, বিচার বুদ্ধি লোপ পেলে লোকের লজ্জা ও নষ্ট হয়। তারপর যুধিষ্ঠিব ধনের উপকাবিতা কি তা বিশদরূপে বর্ণনা কবেন। ধনকে পরম ধর্ম বলে, ধনেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। ধনী লোকই জীবন ধারণ করে আর ধনহীন ব্যক্তি মৃতের মত। ধনহীনেব দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিব বলেন যে ধন সম্পত্তির নাশ মানুষের বড় বিপদ। তা মৃত্যুর চেযেও বড়, অতএব পাণ্ডবেরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারবেন না। এ কারণে যদি মৃত্যুও হয় তা তাঁরা শ্রেয় মনে করেন। তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন। প্রথমতঃ তাঁরা চেষ্টা করবেন সদ্‌ভাবে সন্ধি স্থাপন করে শান্ত ভাবে থেকে সমানভাবে রাজ ঐশ্বর্য উপভোগ করা; অন্যথা কৌরবগণকে বধ কবে সমগ্র রাজ্য তাঁদের অধিকারে আনা, যদিও এ পথ খুবই নির্দয় ও ক্রূব। তারপর যুদ্ধের অনিশ্চযতা সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে বলেন। যুদ্ধ তাঁব অভিপ্রেত নয়, তবে তাঁরা রাজ্য ত্যাগ করতেও চান না, সঙ্গে সঙ্গে আপন কুল বিনষ্ট ও করতে চান না। এ মহাসঙ্কটে, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাউকে অধিকতর সুহৃদ মনে করেন না। যুধিষ্ঠিরের আবেদন শুনে কৃষ্ণ উভয় পক্ষেব হিতেব জন্যে কৌবব সভায় যাবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন, এবং উভযপক্ষেব মধ্যে সন্ধি স্থাপনে তিনি যদি সক্ষম হন তবে উত্তম ফলদায়ক ও পুণ্য কাজ হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণ এই রকম অভিমত প্রকাশ করলে যুধিষ্ঠির বলেন যে তাঁর

ভয় হয় দুর্যোধন তাঁকে মান্য করবে না, এবং বহু রাজা সমবেত হয়েছে যাঁরা হয়ত তাঁর প্রতি অনুচিত আচরণ করবে। এমতাবস্থায় ধন, সুখ, দেবত্ব, এমন কি সমস্ত দেবগণের ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করতে পারবে না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে যুধিষ্ঠির যেন উদ্বিগ্ন না হোন। কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত নৃপতিবর্গ তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। উত্তরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কল্যাণ কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে কৃষ্ণ সুকার্যে কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন। যুধিষ্ঠির আরও বলেন যা সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর, কোমল হোক বা কঠোর হোক কৃষ্ণ যেন অবশ্যই বলেন।

যুধিষ্ঠিরের মধ্যে উপরোক্ত দ্বন্দ্ব দেখে কৃষ্ণ তাঁকে খুবই উৎসাহ দেন। কৃষ্ণ ক্ষাত্র ধর্ম সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে অবহিত করেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ অথবা তথায় প্রাণ দান ক্ষাত্র ধর্ম। দীনতা ক্ষত্রিয়ের অনুপযোগী। দুর্যোধনেবা সন্ধিতে রাজি হবে না—এ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। কারণ পাণ্ডবদের গহন বনে দুঃখে কাটাতে দেখেও তাদের কোন অনুশোচনা হয়নি। তিনি যুধিষ্ঠিবকে দুর্যোধনের প্রতি প্রেম দেখাতে বারণ কবেন, কারণ তারা সকলে বধের যোগ্য। দ্যূতক্রীডায় পরাজয়ের পর দুর্যোধনের নির্মম ব্যবহাবেব কথা তিনি যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তারপর কৃষ্ণ কৌরবসভায় দুর্যোধনের সব দোষ উদঘাটন কববেন বলে আশ্বাস দেন যাতে কেউ দুর্যোধনকে চিনতে ভুল না করেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে উপদেশ দেন।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অভিমত জানিযে তাঁদের অর্ধ রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে বলেন, অন্যথা তাঁরা যুদ্ধ করবেন তাও জানান। সকলেই দুর্যোধনকে নানা ভাবে বুঝাবাব চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্যোধন কোন প্রকারেই পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হলেন না। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণ

দুর্যোধনকে বুঝাবার চেষ্টা করেন, তাতেও দুর্যোধন সম্মত হলেন না, বরং তিনি বললেন—

ম্রিয়মাণে মহাবাহৌ ময়ি সম্প্রতি কেশব।
যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ (উদ্যোঃ) ১২৭।২৫

—হে কেশব এখন মহাবাহু যুধিষ্ঠির আমাকে জয় না করে পাণ্ডবরা ভূমির সে অংশ টুকুও পাবে না, যে টুকু একটি তীক্ষ্ণ সূচিকার অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ হয়।

সন্ধি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কৌরব সভায় কি বলেছেন তা বলতে অনুরোধ করেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেন যে তিনি দুর্যোধনকে যথার্থ লাভজনক ও মঙ্গলজনক কথা বলেছিলেন, কিন্তু দুষ্টমতি দুর্যোধন তা গ্রহণ করেন নি। তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করেন তাতে কুরু বৃদ্ধেরা কি বললেন, দ্রোণ কি বললেন, মাতা গান্ধারীই বা কি বললেন? বিদুর ও অন্যান্য রাজারা কি অভিমত প্রকাশ করলেন?

কৃষ্ণ তখন পাণ্ডবদের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি আরও বললেন যে তিনি দুর্যোধনকে বলেছেন—

সর্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চ গ্রামান্ বিসর্জয়।
অবশ্যং ভরণীয়া হি পিতুস্তে রাজসত্তম। (উদ্যোঃ) ১৫০।১৭

—সম্পূর্ণ রাজ্য তোমার হোক, পাঁচটি গ্রাম ত্যাগ কর। কারণ তাদের ভরণ পোষণ করা তোমার পিতার একান্ত কর্ত্তব্য।

আমি একথা বলা সত্ত্বেও দুরাত্মা দুর্যোধন রাজ্যের কোন ভাগই তোমাদের দিতে স্বীকৃত হলো না। কৌরবরা বিনা যুদ্ধে তোমাদের রাজ্য প্রদান করবে না। তাদের বিনাশের সমস্ত কারণ উপস্থিত হয়েছে এবং মৃত্যুকাল সমাগত হয়েছে। তিনি আরও জানালেন কৌরবপক্ষীয় নৃপতিরা নিজেদের বিনাশের জন্য কুরুক্ষেত্রের

অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। কৌরব সভায় যা কিছু হয়েছিল তার সমস্ত কিছুই আমি তোমাকে বললাম। সাম, দান ও ভেদ নীতি প্রয়োগে কোন সুফল হলো না বলে দণ্ডনীতি প্রয়োগের মত প্রকাশ করছি।

যুধিষ্ঠির উপস্থিত বীরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কৃষ্ণ যা বললেন, তার মর্ম তোমরা বুঝলে, এখন তোমরা নিজ সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য বিভাগ কর। এখানে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র হয়েছে, যারা আমাদের অবশ্যই বিজয় লাভ করাবে।

এই সাত অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে বিখ্যাত সাত সেনাপতির নাম আমি বলছি—দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীম।

কিন্তু প্রধান সেনাপতি কে হবে এ সম্বন্ধে ভ্রাতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা গেল। সহদেব বিরাটের নাম, নকুল, দ্রুপদ, অর্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ও ভীম শিখণ্ডীর নামোল্লেখ করায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিমত জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি বললেন—

এষ নো বিজয়ে মুলমেষ তাত বিপর্য্যয়ে।
অত্র প্রাণাশ্চ রাজ্যঞ্চ ভাবাভাবৌ সুখাসুখে॥
এষ ধাতা বিধাতা চ সিদ্ধিরত্র প্রতিষ্ঠিতা।
যমাহ কৃষ্ণো দাশার্হঃ সোঽস্তু নো বাহিনীপতিঃ॥ (উদ্যোঃ)
১৫১।৩৫-৩৬

—তাত, ইনিই আমাদের বিজয় অথবা পরাজয়ের মূল কারণ, আমাদের প্রাণ, রাজ্য, ভাব, অভাব, সুখ ও দুঃখ সবই এর উপর নির্ভর। ইনিই আমাদের সর্বময় কর্ত্তা ও উপদেষ্টা, আমাদের সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি ইঁহারই উপর ন্যস্ত, অতএব কৃষ্ণ যাঁর নাম প্রস্তাব করবেন, তিনি আমাদের বিশাল সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হবেন।

কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি হবার যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের প্রস্তাবে সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে 'সুসজ্জিত হও' 'সুসজ্জিত হও' বলে হর্ষ ধ্বনি করতে সুরু করেন। শঙ্খধ্বনি,

দুন্দুভি সমূহের ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সকলকে প্রতিধ্বনিত করে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যরা প্রবেশ করে শিবির স্থাপন করে।

দুর্যোধনও নিজ সৈন্যদের সুসজ্জিত হবার জন্য শিবির নির্ম্মাণ করবাব জন্য আদেশ দেন এবং সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, মন্দমতি দুর্যোধন কেন এই কথা বলল? এই অবস্থায় আমার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য? কি কাজ কবলে আমরা স্বধর্মচ্যুত হব না? দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার অভিমত কি তা আপনি অবগত আছেন। বিদুর ও ভীষ্ম যা বলেছেন, তাও আপনি শুনেছেন। জননী কুন্তী দেবীর অভিমতও আপনি শুনেছেন। সেই সব অভিমত জেনে আপনি স্বয়ং এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে নিঃসঙ্কোচে বলুন আমাদের এখন কি করণীয়?

কৃষ্ণ বিশদ ভাবে পরিবেশ পর্য্যালোচনা কবে বললেন আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের ও নৃপতিদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করতে হবে দেখে ক্ষোভের সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবতে করতে ভীম ও অর্জুনকে বললেন—যা হতে রক্ষা পাবার জন্যে আমি বনবাসের কষ্ট স্বীকার করেছি ও নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করেছি, সেই মহা অনর্থ আমরা বিশেষ চেষ্টা করেও নিবাবণ করতে পারলাম না।

কথং হ্যবধ্যৈঃ সংগ্রামঃ কার্য্যঃ সহ ভবিষ্যতি।
কথং হত্বা গুরূন্ বৃদ্ধান্ বিজয়ো নো ভবিষ্যতি॥

(উদ্যোঃ) ১৫৪।২২

—যাঁরা বধেরই যোগ্য নন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কিরূপ উচিত হবে? বৃদ্ধ গুরুজনকে বধ কবে আমাদের বিজয় লাভই বা কিভাবে

হবে ? শোক সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে অর্জুন বললেন জননী কুন্তী দেবী ও বিদুর যা বলেছেন, তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা উভয়ে কখনই অধর্মের কথা বলবেন না। এখন আমাদের যুদ্ধ হতে বিরত হওয়া সঙ্গত নয়। কৃষ্ণও অর্জুনকে সমর্থন করলেন।

কৌরবরা সৈন্য বিভাগ এবং পৃথক পৃথক অক্ষৌহিনী সমূহের সেনাপতিদের অভিষেক করেন। যুধিষ্ঠিরও নিজ সেনাপতিদের অভিষেক করেন। যদুবংশীয়দের সঙ্গে বলরাম আসলেন এবং পাণ্ডবদের থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তীর্থযাত্রা করলেন।

সংবাদ জানবার জন্যে দুর্যোধন উলূককে দূতরূপে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করেন। পাণ্ডবদের শিবিরে গিয়ে জনপূর্ণ সভায় উলূক দুর্যোধনের নির্দেশ মত পাণ্ডবদের উত্তেজিত করবার জন্য নানা ভাবে তাঁদের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। পাণ্ডবরাও দুর্যোধনের বার্ত্তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর উলূক মারফৎ পাঠালেন। পাণ্ডব যোদ্ধাদের সংবাদ নিয়ে উলূক প্রত্যাবর্ত্তন করলে উলূকের কথা শুনে যুদ্ধের জন্যে দুর্যোধন সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব সৈন্যরা গমন করেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ যোদ্ধা-দিগকে স্ব-স্বযোগ্য বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নিযুক্ত করেন।

যুধিষ্ঠির গুপ্তচর মারফৎ কৌরব সেনার সংবাদ পেয়ে গোপনে ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করে বলেন, গতরাত্রে দুর্যোধন বীরদের জিজ্ঞেস করেন তাঁরা কে কতদিনের মধ্যে পাণ্ডব সেনা সংহার করতে পারবেন ? ভীষ্ম এক মাসের মধ্যে, দ্রোণাচার্য্য এক মাসের মধ্যে, কৃপাচার্য্য দুই মাসের মধ্যে, অশ্বত্থামা দশ দিনের মধ্যে এবং কর্ণ পাঁচ দিনের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্যদের সংহার করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তিনি অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন তুমি কত সময়ের মধ্যে শত্রুদিগকে বিনাশ করতে পারবে ? অর্জুন জানালেন, কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি

চক্ষুর পলকের মধ্যেই সংহার করতে পারেন। ভগবান পশুপতি তাঁকে যে ভয়ঙ্কর মহাস্ত্র দিয়েছেন, তা তাঁর নিকট আছে। এই দিব্যাস্ত্র সম্বন্ধে কৌরব বীররা কেহই জানেন না। তিনি আরও বলেন তাঁদেব সহায়ক বীররা দিব্যাস্ত্র সমূহ অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ অভিলাষী। এঁরা সকলেই অপরাজিত বীর। শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, বিরাট ও দ্রুপদ—এঁরা সকলে যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের তুল্য। এইরূপে অর্জুন স্বপক্ষীয় সমস্ত বীরদের ক্ষমতার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আপনি নিজেও ত্রিলোককে বিনষ্ট করতে সমর্থ। আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই নষ্ট হবে। আপনার এই প্রভাব আমি জানি।

এই ভাবে উভয় পক্ষ রণ সাজে সজ্জিত হয়ে আপন আপন পরাক্রম ও অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো।